রেল-কলোনী

শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত

[চার টাকা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ— ১৩৫৫

মণ্ডল প্রেস
মুদ্রাকর—শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায়
৩ ডিক্সন লেন, কলিকাতা

পিতৃ-চরণে

রেল-কলোনীর চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

প্রুফ সংশোধনে সাহিত্যিক পিটার প্রমথ
ব্যানার্জ্জি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন
তাঁর কাছে আমি
চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীঅজয় দাশগুপ্ত

বিঃ দ্রঃ—

১৮৫ পৃষ্ঠায় দূরন্ত শীত পড়েছে পূর্ণিয়ায় ৩৬ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত

স্লেভ-কলোনী

গোধূলির শেষ,—সন্ধ্যার প্রথম মুহূর্ত। চারিদিকে নেমেছে রাত্রির কৃষ্ণছায়া, দৃষ্টি শক্তি স্বল্প পরিসরে আবদ্ধ। মহাশূন্যে কলরবে চলেছে বিহগকুল। উচ্চ বালুকা-বাঁধের উপর দিয়ে চলেছে অলোক রায়। তাকে যেতে হবে অনেক দূর, প্রায় মাইল তিনেক পথ। দেহ শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন, মন কিন্তু আনন্দের আমেজে চঞ্চল। ছুটী—ছুটী, অন্ততঃ—আগামী কালের প্রভাত পর্য্যন্ত সে স্বাধীন।

পথের মাঝে দেখা হল অনেকের সঙ্গে। রোগা লম্বা তেল চুকচুকে ছকু নাকি সুরে বলে—"আজ ভীষণ ফাঁকি দিয়েছি রে ভাই, দিন ভোর কেবল ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।" সত্যনারায়ণ ধমক দিয়ে ওঠে—"ফাঁকি বের হবে, যেদিন পড়বে বাঘের চোখে—।" ছকু তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে জবাব দেয়—"চাকরী করতে হলে চালাকী চাইরে ভাই।"

কিছু দূরে জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর মোটরের আলো জ্বলে উঠতেই ক্ষুদ্র দলটি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। "কি বিপদ রে ভাই, আবার বুঝি ল্যাঠা বাধে।" সত্যনারায়ণ মোটরের দিকে চেয়ে থাকে। "আর দেখতে হবে না, শালা ঘোষসাহেবরে ভাই, চল চল নিচের দিকে নেমে পড়ি।" পুরণ সিং পাঞ্জাবী ভাষায় একটা শব্দ প্রয়োগ করে, হেসে ওঠে—"দাড়িয়ে কেন চলে আয়।" আলোক নিঃশব্দে বাঁধ ধরে এগিয়ে যায়—অন্য সকলে পথের বিপরীত দিকের নিম্নভূমিতে নেমে পড়লো।

অলোকের সর্ব্বাঙ্গ এক ঝলকে আলোকিত করে মোটরখানা থেমে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে—হর্ন। গাড়ীর কাছ বরাবর যেতে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ ঘোষ জানালা থেকে মাথা বের করে বলেন—“রামলালের বাসায় গিয়ে তাকে বলবে যেন কাযের সব ঠিক থাকে. ড্রাইভার চলো।” গাড়ীটা সচল হয়ে ওঠে—সুবোধ ঘোষ পুনরায় বলেন—“ফেরার মুখেই বলে যেয়ো।” মোটরখানা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়, দূরে একটার পর একটা গাছ পালা পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠে, পরক্ষণে অন্ধকারে মিশে যায়।

মন তিক্ততায় ভরে ওঠে,—রামলালের বাসা, মেস্ থেকে অনেকখানি-দূর। মন বিষিয়ে উঠলেও উপায় নেই—দাসত্ব-জীবনে উপরিওয়ালার জুলুম সহ্য করতেই হয়। অলোক চীৎকার করে সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকে কিন্তু সাড়া আসে না, তারা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

ঠিকাদারের বাসার চারিদিকে কুলিদের ছাউনী। মজুরদের মধ্যে চলছে মাতলামি আর হল্লা। সমস্ত দিন প্রাণপাত পরিশ্রমের নগদ-নারায়ণ নিঃশেষে চলে গিয়েছে শৌণ্ডিকালয়ে। ক্ষুধাতুর শিশুর দল তারস্বরে ধরেছে ঐক্যতান—জঠর যে মানে না কোন শাসন। জন্মদাতার দল মাঝে মাঝে রুখে উঠছে—কেউ বা রোরুদ্যমানদের উপর প্রয়োগ করে চলেছে সম্বন্ধ বিগর্হিত বিশেষণ। কোথাও বা বেধেছে বিবাদ সর্দ্দারের সঙ্গে মজুরদের মজুরী নিয়ে। কয়েক স্থানে ইট সাজিয়ে রান্নাও চলছে।

অলোক থমকে দাড়ায়। গর্ত্তের ভেতর থেকে চাপা গলার শব্দ আসছে। একটু এগিয়ে যেতেই পায়ের শব্দে ফিরে চায়। কুলী ছাউনীর দিকে একজন ছুটে চলেছে। গ্যাসের আলো

পড়লো তার মুখে—বিলাসপুরী সেই মজুরানী—কাজের সময় যাকে উপলক্ষ্য করে মজুরের দল অবাধে চালিয়ে যায় নির্লজ্জ বেহায়াপনা।

ঠিকাদারের বাসায় বেশ জোর তর্ক বিতর্ক চলছে। রামলালের উত্তেজিত আওয়াজের সঙ্গে রমণী কণ্ঠের চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠিকাদার বলে "আরে পুনিয়া, দেখো কৌন আয়া।" রামলালপুত্র পুনিয়া সম্ভাষণ জানিয়ে বলে, "রাম রাম বাবজি।" ঠিকাদার বেরিয়ে আসে, -অলোক জানায় তার বক্তব্য।—রামলাল চোখমুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলে—"ওহিবাস্তে হাম এতনা সমঝাতা—বাকি জানকী সমঝতা নেহি।" অলোক বিস্মিত হয়,—কি ব্যাপার, জানকীই বা কে? ঠিকাদার তাকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করে ভিতরে চলে যায়। অলোক মোড়ার উপর বসে পড়ে। কাণে আসে রামলালের অদ্ভুত বাক্য বিন্যাস। পরপর পিতামাতা পিতামহ প্রপিতামহ তার উর্দ্ধতন বহু পুরুষের নামে অজস্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, অনর্গল বকে চলেছে রামলাল। প্রত্যেক কথার পর সমঝা শব্দটা সে প্রয়োগ করছে বেশ জোরের সঙ্গে। মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠে কে বলে ওঠে "জান দেগা তব্ ভি নেহি।"

রামলাল জোর করে টানতে টানতে নিয়ে আসে এক অবগুণ্ঠিতাকে। অলোক অবাক হয়ে উঠে দাড়ায়। রামলাল গর্জ্জন করে বলে "তেরা লিয়ে হামলোক জনমভোর মিট্টি উঠানে সখেগা নেহি, সমঝা?" ভিতর থেকে রমণী কণ্ঠের ঝঙ্কার ওঠে—"ডাহিন হ্যায়—ডাহিন।"

অকস্মাৎ ঠিকাদার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পদাঘাতে রমণী মাটিতে পড়ে যায়। অবগুণ্ঠন-অঙ্গবাস স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

অলোক যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল এই অভাবনীয় ঘটনাবর্ত্তের মাঝে। কেবল তার মনে হচ্ছিল—সুবোধ ঘোষ তাকে কোন্ কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে। অলোক চমকে ওঠে—যুবতী তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে—"আপ মেরা বাপ, মেরা ইজ্জৎকাবাস্তে জান লিজিয়ে বাবুজি জান লিজিয়ে।" অলোক চেয়ে দেখে—যুবতী অপূর্ব্ব রূপবতী। রামলাল বিকৃত কণ্ঠে বলে "জান লিজিয়ে—জান লিজিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর বুকের মাঝে হানে পদাঘাত। একটা অস্ফুট কাতরোক্তির পর যুবতী লুটিয়ে পড়ে। অলোকের প্রতিটি ধমনীর রক্তস্রোত যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে,—সবল বাহু দুটি বিদ্রোহী হয়ে,—অকস্মাৎ আক্রমণ করে ঠিকাদারকে। মুখে নাকে মাথায় আঘাত পেয়ে রামলাল হতভম্ব হয়ে যায়,—নাক মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

উত্তেজিত অলোকের আঘাতে ও কথায় রামলালের সুপ্ত মনুষ্যত্ব যেন ফিরে আসে। নেহাৎ গোবেচারার মত একে একে সব কথা সে বলে ফেলে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে সে তার পুরো সংসার নিয়ে মাটী কাটার কাজ করেছে। ঘোষ সাহেবের দয়ায় সে এখন ঠিকাদার। করুণার প্রতিদানের জন্যই সে এতখানি নীচে নেমেছে। অলোক বুঝিয়ে বলে যে মান মর্য্যাদার ভয়ে ঘোষ সাহেব কিছুই করতে পারবেনা, জানাজানি হলে চাকরী নিয়েও টানাটানি হতে পারে। রামলাল গিন্নি এতক্ষণ অন্তরালেই ছিল, সেও এসে অলোকের কথায় সায় দেয়—"বেটার বহুয়ার ইজ্জত ধরম বেকিয়ে রোজগার ঠিক নয়।"

অলোকের সঙ্গে আলো নিয়ে চললো পুনিয়া ও আর একটা মজুর।

রুগ্ন ক্ষয়গ্রস্থ পুনিয়ার সঙ্গে জানকী একেবারে বে-মানান। বয়েসে হয়তো দু'জনেই সমান। পথের মাঝে পুনিয়া অনেক কথা বলে। তাদের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন, প্রায় আট বৎসর হবে। গাওনা করে বউ এনেছে ছয় সাত মাহিনা আগে। বউকে তার খুব ভাল লাগে—তবে জানকী তাকে মাঝে মাঝে দুবলা বলে অপমানও করে। ঘোষ সাহেবের ব্যবহারে সে তাজ্জব বনে গিয়েছে। জানকীকে মাটী কাটার কাজে দেখে সে-ই বলেছিল বাপুজিকে—"জেনানী লোকের বে-আবরু ঠিক নয়" অথচ এখন হামেসা সে চায়—জানকী যাবে রাতমে তার কুঠিতে। তাজ্জব কি বাত্! অলোকের প্রশ্নে সে বলে জানকীকে সেখানে পাঠাবার ইচ্ছা তার কোন দিনই নেই—লেকিন তার মা-বাপের উপর এক্তিয়ার ভি নেই।

ক্রমে ক্রমে তারা এসে পড়ে পুণিয়া কোটের সন্নিকটে। দূর থেকে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় স্থানটাকে দেখাচ্ছে সুন্দর। পুনিয়া ও তার সঙ্গীকে বিদায় দিয়ে, অলোক এগিয়ে যায়। রেল কলোনী নিঃস্তব্ধ নিঃঝুম। ক্লাব ঘরে এখনও আলো জ্বলছে—হয়তো তাদের আড্ডা খুব জমাট বেঁধেছে।

মেস-বিহারীগণ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সন্তর্পণে অলোক স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করে। আলোকটী প্রজ্বলিত করে দেখে—রুটির থালাখানা আ-ঢাকা, দুটো বাটী উল্টানো। নিশ্চয় বেড়াল এসেছিল রাতও অনেক, ক্ষিধেও যেন নেই.—হাত মুখ ধুয়ে সে শুয়ে পড়লো।

২

মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে যেখানে ছিল বিস্তীর্ণ বালুকা-প্রান্তর, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে এক বিরাট উপনিবেশ। প্রায় আড়াই মাইল স্থান নিয়ে—কুঠীর, শিবির, আটচালা ও বাংলোয়—বাসা বেঁধেছে কয়েক সহস্র মানুষ। নব উপনিবেশের নাম হয়েছে পূর্নিয়া কোর্ট।

পূর্নিয়া কোর্ট যেন সর্ব্ব-জাতি-ধর্ম্ম-সমন্বিত এক আদর্শ উপনিবেশ—। এখানে আছে সমগ্র ভারতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও জাতির সমাবেশ। আছে—শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত আদিম-অকৃত্রিম বর্ব্বর। আছে—আলোক-প্রাপ্তা প্রগতি-পরায়ণা যুবতী, আছে,—আধো লাজলজ্জা সঙ্কোচে সঙ্কুচিতা কিশোরীরা, আর—সনাতনী রক্ষাকারিণী দিদিমা-ঠাকুমাদের দল।

এখানকার জীবনযাপন প্রণালীও বিভিন্ন প্রকারের। 'অফিসার'—অর্থাৎ অভিজাত গোলাম যারা, তারা ভোগ করে বিংশ শতাব্দীর অভিনবত্বের সব কিছু। সাধারণ অর্থে পাঁচশতের নিম্নে দাসখতে দস্তখৎকারী—তাদের সবই পুরাতন, সবই মামুলী।

কুলী মজুরের দল থাকে কলোনীর প্রান্ত সীমায়, সামান্ত ঘাস পাতার কুটীর কিংবা শতছিন্ন শিবিরের তলে। মজুর কুলীর দল শীত গ্রীষ্ম বর্ষার পরোয়া করেনা, তাই কর্ত্তৃপক্ষও এদের বেপরোয়া ভাবে রেখেই খালাশ। মানুষের অধিকার-বঞ্চিত যারা, তাদের বাসস্থানের জন্য মাথা ঘামিয়ে কি লাভ!

সত্যই অপূর্ব্ব এই উপনিবেশ!—স্থান ও সময় বিশেষে, এখানে রকম রকম দৃশ্য দেখা যায়। সকালে অভিজাত মহল্লা থেকে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার দল, স্বাস্থ্য-বায়ু সেবনে চলে যায় কৃত্যানন্দনগরের দিকে। কেরানী কোয়ার্টারে তখন চলে—চায়ের সঙ্গে পরম রসাল পরনিন্দা। মজুর মিস্ত্রি কুলী খালাসী আর ওভারসিয়ার সুপারভাইজারের দল তখন, কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে আরম্ভ করে কর্ম্মস্থানের দিকে।

দুপুরে—কোথাও চলে রেডিও তাস রসালাপ, কোথাও বসে মহিলা মজলিস। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-দগ্ধ-দুপুরে কেউ গায় "এমন মধুর বসন্ত নিশীথে, কেন এসেছিলে প্রেম ঢেলে দিতে"—ইত্যাদি। কুলীপাড়া তখন জনশূন্য।

বৈকালে—স্থান বিশেষে চলে 'টেনিস' 'ব্যাটমিণ্টন' রসিকতা হাস্য কৌতুক, আরও অনেক কিছু। কেরাণী ব্যারাকের চুল্লীর ধোঁয়া কলিয়ারীকেও হার মানায়। কুলী মজুরের দল তখন মহুয়ার মধুপানে উন্মত্ত বিহ্বল।

আছে সব।—নেই কেবল সমাজের শৃঙ্খলে সামাজিকতার বন্ধন, আন্তরিকতা আর সরলতা। তাই এখানকার অধিবাসীরা একটু অন্য ধরণের,—আচার ব্যবহার বেশভূষা সবই যেন স্বতন্ত্র।

এত আয়োজন, এমন সব আমদানীর কারণ,—পূর্নিয়া থেকে মূরলীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চান্ন মাইল ব্যাপি স্থানকে, রেল কোম্পানী তার লৌহবর্ত্ম প্রসারণে আনতে চায়, বিংশ শতাব্দীর আওতায়। এই অঞ্চলের ধান ও পাটের প্রচুরতার মাঝে লুকিয়ে আছে লুব্ধকের প্রচুর আশা,—আমদানী আর রপ্তানীতে। পূর্নিয়া কোর্ট, নির্ম্মিয়মান পূর্নিয়া-মূরলীগঞ্জ রেলপথের, প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র

শেষরাত্রি থেকে নেমেছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। বেলা প্রায় নয়টা, কিন্তু আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকা। অলোক বিছানায় শুয়ে ভাবছে — আজ অনেক বেলা পর্যান্ত সে শয্যায় আরাম উপভোগ করবে। মনে পড়লো গত রাত্রের ঘটনা - ঘোষ সাহেব নিশ্চয় তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেই ভাল হতো! নাঃ সে ঠিকই করেছে, কি করবে সে? চাকরীতে হাত দেবে— ? দিলেই হলো— ? সেও জঘন্যভাবে শাস্তি দিতে জানে। জানাজানি হলে তার বিপদই যে সবচেয়ে বেশী। বড় চাকরী যাদের, তাদেরই তো মান মর্য্যাদার ভয়।

দু'হাতে দুটি পেয়ালা নিয়ে গান ভাঁজতে ভাঁজতে প্রবেশ করলেন দ্বিজেন বাবু। অলোক শয্যাত্যাগ করে বলে—"এমন ভাদরে তুমি কোথা ?—তার মানে তোমারও তুমি আছে নাকি দ্বিজেন দা ?" দ্বিজেন বাবু ধমক দিয়ে উঠেন—"যাঃ দিলি তো সব ভেঙ্গে।"

কি ?

"কি আবার? ভাব,—যার নাম কাব্যভাব। দূর হোকগে, নে চা খা। —কি রে কাল খাসনি ?"

"না, অনেক রাত্রে এসে দেখি, শ্রীশ্রী বিড়ালানন্দ-জী সব সাবড়ে দিয়েছেন।"

"অত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি ?"

"ঠিকাদার রামলালের বাসায়—"

"কেন ?"

"সুবোধ ঘোষের একটা কাজ ছিল।"

দ্বিজেন বাবু ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে বলেন —"কাজটা বোধ হয় খুব গোপনীয়? তাই না?"

অলোক অবাক হয়ে যায়—"তুমি জান নাকি ?"

"আমি কেন আফিসের সবাই জানে।"

অলোক গত রাত্রীর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বলে "কেমন ঠিক করেছি তো ?"

"ঠিক আর কি, টাকার লোভে আর ভয়ে, একদিন দেখবি, রামলাল নিজেই তাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছে সুবোধ ঘোষের বাংলোয়।"

প্রাতঃ প্রণাম—প্রাতঃ প্রণাম" শশব্যস্তে দেবেন ফিটারের প্রবেশ।

"কি ব্যাপার এমন বাদলার মধ্যে ?"

"দাড়ান দাড়ান এই জোব্বাটাকে খুলি আগে, বাইরেই রাখি কি বলুন ?"

দেবেন ফিটার এক অদ্ভুত লোক। ফিটার হিসাবে তার জুড়ি পাওয়া ভার। অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের অসম্ভবকেও সে সম্ভব করে তোলে। ফিটার পদবী আর বাবু সম্বোধনের উপর সে হাড়ে চটা।—পোষাকে পরিচ্ছদেও সে মৌলিকতা রক্ষা করে চলে। হাফ প্যান্টের সঙ্গে চুড়ীদার পাঞ্জাবী, তার উপর ফিতে বাধা বেনিয়ান, পায়ে পট্টু আঁটা বুট, মাথায় এক বিশাল পাগড়ী।

"উঃ ছাতায় কি জল আটকায়, পগ্‌গ বেটাও ভিজে একেবারে কাঁথা সপ্‌ সপে—খুলেই ফেলি।"

"তারপর, কি ব্যাপার দেবেন বাবু ?"

দেবেন চেয়ারে বসে ছিল,—সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারখানা পিছনে ঠেলে দিয়ে দাড়িয়ে বলে—"এই সুরু করলে তো ? কতবার বলেছি ওসব ছাই ভস্ম বলবেন না,—বলবেন না। বলতে হয় বলুন—দেবা,

দেবামিস্ত্রি.– দেবেন বৈরাগী —তা নয় কেবল যখন তখন বাবু,— ফিটার. এসব কি ?"

"আচ্ছা আচ্ছা বসুন, কি ব্যাপার বলুন তো ?"

"ব্যাপার আর কি ছাই মাথা মুণ্ডু. কাল ক্লাবে ঠিক হোল, বিশ্বকর্ম্মা পূজোয় থিয়েটার ফিয়েটার হবে. তাই এই নোটিশ নিয়ে ছোটা-ছুটি আর কি।"

"তা' এমন সময় এই বৃষ্টির মধ্যে—"

"আরে মশাই বৃষ্টি বাদল বলে কি ঘরে বসে থাকব নাকি— বুঝলেন না, কাজের ঝামেলা চুকিয়ে না ফেলে কি সোয়াস্তি পাওয়া যায়। নিন্, বেশ ভাল করে সবাই মিলে সই টই করে দিন. আর দেখুন. তারিখ ঘণ্টা মিনিট সব লিখবেন।"

"এত সব লিখে কি দরকার ?"

"আছে আছে,—দরকার না হোক প্রয়োজন আছে।—সবাই বুঝবে যে দেবেন মিস্ত্রি কেবল মিস্ত্রিই নয়—সব কাজেই পাকা পোক্ত, বুঝলেন কিনা ?"

বিজ্ঞাপণ-পত্র ভদ্রলোক নিয়ে গেল অন্যান্যদের সই করাতে। দ্বিজেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"চা খাবেন ?"

"তা মন্দ হয়না, তবে শ্রেফ কড়া চা. চিনি দুধ কিচ্ছু না দিয়ে।"

"খান্ না একটু দুধ চিনি।"

করজোড়ে দেবেন ফিটার আপত্তি জানান—"না দাদা. যা এক বার ত্যাগ করেছি, এ জীবনে তা আর নয়।"

আচ্ছা "র" আনাচ্ছি।"

ঠাকুরকে চায়ের আদেশ দিয়ে ফিরে এসে, দ্বিজেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তারপর. মা কেমন আছেন ?"

মায়ের উদ্দেশ্যে যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে দেবেন বাবু বলেন—

"আপনাদের বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে মা জননী ইদানিং ভালই আছেন। হ্যা দেখুন, একটা কথা আছে।"

দ্বিজেন বাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে থাকেন। দেবেন ফিটার বেশ আস্তে আস্তে বলেন—"এবার একটা ছোট খাটো পার্ট দিতে হবে, মানে—ষ্টেজে একটু ঢুকলাম এই আর কি।" কথাটা বলেই দেবেন হেসে উঠে

"কেন ষ্টেজ ম্যানেজারী করবেন না বুঝি।"

'আহা তা কেন? ষ্টেজ তো আমার আছেই—তবে বুঝলেন কিনা দিনাজপুরে কেবল দড়ি টানাটানি করেই এলাম, তাই—এই আর কি—" দেবেন হেসে ফেলে।

"বেশতো, একটা ছোট খাটো পার্ট আপনার জন্যে—"

দেবেন বাধা দিয়ে বলে—"কিন্তু কথা না থাকে, অত লোকের মাথা দেখলে, মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল।"

অলোক ফিরে আসে। বিজ্ঞাপন পত্র খানি হাতে নিয়ে দেবেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায়—

"চা খাবেন না?"

"না আর দরকার নেই—" সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালা নিয়ে প্রবেশ করে উড়ে ঠাকুর।

ব্যস্ত ভাবে—চায়ের পেয়ালা নিয়ে দেবেন বলে ওঠে "এসেই যখন গেল তখন দু চুমুক্ খেয়েই ফেলি।"

বার বার ফুঁ দিয়ে, চা শেষ করে, মিলিটারী কায়দায় জুতার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে, দেবেন নিস্ক্রান্ত হল। অলোক হাসতে হাসতে বলে "আচ্ছা পাগল তো।"

"মোটেই পাগল নয়, সে বড় সরল। অত বড় মাতৃভক্ত এ যুগে দেখা যায় না। দেবেন বাবুর বাবা যখন মারা যান, তখন মা মাস সাতেকের অন্তঃসত্ত্বা। সেই ছেলেকে মানুষ করা যে কি কঠিন কাজ তা তিনিই জানেন। দেবেন মায়ের উপযুক্ত সন্তান। চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকে রোজগার করে মাকে খাওয়াচ্ছে।"

"শুনুন—শুনুন।" দ্বিজেন বাবু আর অলোক চেয়ে দেখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেবেন।

"কি হোল" ?

"আপনার সঙ্গে নয়, অলোক বাবুর সঙ্গে দরকার মানে—একটু গোপন কথা, দূর ছাই—এখান থেকেই বলে ফেলি—রাঙা দিদিমার বাসায় আপনার নেমন্তন্ন—গোঁসাই ঠাকুর বলে দিয়েছেন।"

অলোকের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে—।

"কাল থেকে তো বিশুদ্ধ দন্তরসের উপর চলেছে অথচ নেমন্তন্নের নামে মুখ ভার কেন ?

অলোক বলে – "এমন দিনে কি বাইরে যেতে ইচ্ছে করে ? মনে করেছিলাম তাড়াতাড়ি খেয়েই দেব লম্বা ঘুম, তা ভাগ্যে নেই। পরক্ষণে দ্বিজেন বাবুকে অলোক প্রশ্ন ক'রে,—"আজ আর যাবো না, কি বল ?"

তোর মর্জ্জি—আমি হলে তো এখুনি ছুটতাম, একে নেমন্তন্ন তার উপর আবার রাঙাদি'র। দ্বিজেন বাবু চায়ের পেয়ালা নিয়ে চলে গেলেন।

অলোক বসে বসে ভাবে—দ্বিজেন বাবুকে সব কথা খুলে বলবে নাকি ? কিন্তু, না, থাক। বাইরে প্রচার হয়ে পড়লে তাকেও অনেকে

ন্দেহ করবে। দেখাই যাক আজ কি ঘটে, তারপর ব্যবস্থা করা বে।

মনে পড়ে, কিছুদিন আগে মণিহারীতে সে নিয়ে গিয়েছিল পুণ্য লাভাতুরা রাঙাদি'কে গঙ্গা স্নান করাতে। মণিহারী ঘাটে সেই দ্ধগ্রাস গ্রহণের কথা, সে জীবনে ভুলবে না। অর্দ্ধগ্রাসই বটে! ঙাদি'কে সবাই জানে ধার্ম্মিকা সচ্চরিত্রা ভদ্রগৃহিনী—কিন্তু,— কিন্তু—সে নে তার নিগূঢ় পরিচয়।—ইচ্ছা করেই প্রথম ট্রেনটা নিশ্চয়ই রাঙাদি' ল করিয়েছিল,—নিশ্চয়ই। একটা কথা মনে হতেই অলোকের স্ত অন্তর শিউরে ওঠে—ছিঃ ছিঃ

না: সে যাবেনা, কিছুতেই—না। রাঙাদি'র লজ্জা না থাকতে রে কিন্তু সে তার সুনাম খোয়াতে রাজী নয়—

৩

দিন বর্ষণের পর সমস্ত দিন ধরে আকাশ পরিষ্কার। বৈকালে ডাঃ গুহ বিরাট নারীবাহিনী নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সাব্—ষ্টোরকিপারের লকা শোভনা, তু'একদিনের মধ্যে কলকাতায় চলে যাবে, তাই জকের এই অভিযান। মাফি সাহেবের ভগ্ন নীলকুঠী এ অঞ্চলের —একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

পূর্নিয়া কোর্ট থেকে নীল কুঠীর দূরত্ব অনেকখানি। পথ চলার প অভিযাত্রীদের উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হতে লাগলো। হেডক্লার্ক জাত সিংহের সিংহিণী বলে উঠলেন—"বাব্বা, এর নাম নাকি কাছে।?'

ষ্টেনোগ্রাফারের বোন লতিকা হেসে ফেলে—"সত্যি মাসীমা, তুমি বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছ!" হাঁপাতে হাঁপাতে সিংহিনী জবাব দেন—"তুমিও কম নও বাছা।"

ইস্ তা আর নয়—জানো আমি একটানা পরেশনাথ-পাহাড়ে উঠেছিলাম। "লতিকার ভাই রমু প্রতিবাদ জানায়"—না মাসীমা একটানা নয়, জানো মাঝপথে ওকি কাণ্ড বাধিয়েছিল—।"

লতিকা ক্রুদ্ধ নেত্রে চায়—"আঃ কি হচ্ছে রমু।" গীতা সাবিত্রী ইত্যাদি রমুকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করে পরেশনাথের ব্যাপার।

"জানো সেই পরেশনাথ পাহাড়ে না—অর্দ্ধেক উঠেই দিদি বসে পড়লো—কিচ্ছুতেই উঠবেনা।"

"তুই থাম বলছি রমু!" লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে ভাইকে শাসায়।

"হ্যাঁ থামবে না হাতী—!" এতগুলি শ্রোতাকে নিরাশ করতে রমু রাজী হতে পারে না।

চোখ মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে রমু বলে—"কি হয়েছিল জানো মানে—ওর খুব পেট কামড়াচ্ছিল। তাই নরেন'দা ওকে একটু দূরে"—

রমুর কথা শেষ হবার আগেই লতিকা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। সাবিত্রী চটে ওঠে—"একি! লতিকা, এতে রাগের কি আছে!"

লতিকা ভাইকে শাসায়—"চলনা ফিরে, তারপর ডেঁপোমী ভাঙছি। সব সময় কেবল অসভ্যপনা।"

রমুর কথায় অসভ্যপনা অথবা ডেঁপোমীর কিছু না থাকলেও পরেশনাথ পাহাড় নামটা পর্য্যন্ত লতিকার পক্ষে বেশ মারাত্মক।

নরেন লতিকার বড়দি'র দেবর। সিয়ারসোল কলিয়ারীতে বেড়াতে

গিয়ে বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতাও হয়ে ছিল দুজনের। কিন্তু অকস্মাৎ সব কিছুরই ছন্দঃপতন হয়ে যায়, মাত্র একখানা পত্রের ছিন্নাংশ থেকে। সেই থেকে লতিকা পরেশনাথ পাহাড়ের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না। আজ কথায় কথায় বলে ফেলেই সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। হয়তো রমুর ভাগ্যে আরো চড়চাপাড় ছিল কিন্তু সিংহ গৃহিনীর ধমকে—লতিকা নিজেকে সামলে নিল।

"আর পারি না বাপু! কি হবে ঐ ভুতুড়ে বাড়ী দেখে—তার চেয়ে বরং খানিক জিরিয়ে ফিরে যাই।" বেশীর ভাগ সায় দিলেও জন কয়েক প্রতিবাদ করলো—"তবে শুধু শুধু এতদূর আসা কেন?—নীলকুঠী দেখতেই তো আসা।"

শেষ পর্য্যন্ত দলটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল ফিরে চললো পূর্নিয়া কোর্টে,—কয়েক জনে বালীর উপর আসর জমালো, নীল কুঠীর দল ফিরলে এক সঙ্গেই সবাই ফিরে যাবে। অন্যান্যদের নিয়ে ডাঃ গুহ এগিয়ে চললেন।

দ্রুতপদ চালনায় ডাঃ গুহ অনেক খানি এগিয়ে গেছেন—শোভনা তাঁকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে। বাকী সকলে অনেক পিছনে, তাদের মধ্যে—বেশ হাস্য পরিহাস সুরু হয়েছে। বুলুকে উপলক্ষ্য করেই পরিহাস চলছে।

মাঝে মাঝে শ্যামলা তার পক্ষ না নিলে হয়তো সে কেঁদেই ফেলতো। বেচারীর মা বাপ কেউ নেই—কলকাতায় মামার বাড়ীতে মানুষ। কলকাতার বাইরে এই প্রথম এসেছে, কাজেই তার কাছে অনেক কিছুই নূতন বেশীর ভাগই অচেনা অজানা। পরিহাস অনেক সময় মারাত্মক হয়েও ওঠে। সাবিত্রী একদিন

ঘামাচির অব্যর্থ ওষুধ হিসাবে, বিছুটীর পাতা দিয়ে বেচারীর নাকালের একশেষ করেছিল।—আজ শ্বেত-শুভ্র কাশফুল দেখিয়ে, জ্যোৎস্না বলে' "দেখছো ফুল—এ দিয়ে পাউডারের পাফ্ হয়।"

"তাই নাকি?" শ্যামলী ভিন্ন সকলে হেসে ওঠে।--

শ্যামলী গম্ভীর মুখে বলে "কলকাতার বাইরে যে কখনও বের হয়নি, সে এ সব জানবে কি করে? আর জেনেই বা কি এমন দেশ উদ্ধার হবে শুনি?"

শক্তি, সৌন্দর্য্য, বিদ্যায়, শ্যামলীর জুড়ি সারা কলোনীতে কেউ নেই,—তাই তার কথার দাম আছে—সঙ্গিনীরাও তাকে সমীহ করে চলে।

সাবিত্রী হঠাৎ বলে ওঠে—"আমরা তো বেশ গল্পে মেতে উঠেছি—ও-দিকে যে ডাঃ গুহ আর শোভনাদি, অনেক দূরে চলে গেছেন।"--

অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে তারা চলতে সুরু করে।—

শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলোয় অসমতল বিস্তীর্ণ বালুকা-ক্ষেত্রকে দেখাচ্ছে সুন্দর, ঠিক যেন সমুদ্র সৈকত।

বিরাট নীল কুঠীর সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না ডাকে—"ডাক্তার বাবু—ও ডাক্তার বাবু।"—কেউ সাড়া দেয়না, কেবল প্রতিধ্বনি গমগম্ করে ওঠে—।

"চলে গেল নাকি?"

"হয়তো তাই, যা গল্পে মেতে উঠেছিলাম।"

"তা হলে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

শ্যামলী বলে—"তোরা এখানে বসে থাক, আমি একটু ঘুরে দেখি।"

"একলা যাবি কি করে—।"

"কেন বাঘ ভালুকে খেয়ে ফেলবে নাকি।"

বুলু তার সঙ্গে যেতে চায়। শ্যামলী বাধা দিয়ে বলে "বেশী দূর যাবো না, ঐ ওখানে একবার আলো জ্বলে উঠলো, বোধ হয় ওখানেই ওরা আছে।" শ্যামলী চলে গেল।

* * * * *

"বসে পড়লেন যে"—

শোভনা নিঃশব্দে বসে থাকে—।

ডাঃ গুহ পুনরায় প্রশ্ন করেন—"আবার আসবেন তো এখানে!"

"জানি না!"

কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক।

"এ'কি আপনি কাঁদছেন? ছিঃ এত ভয় করলে কি চলে? আমি তো কতবার বলেছি ভয় ভাবনার কিছু নেই।"

"তবু যদি কিছু"—শোভনা তার কথা শেষ করতে পারে না, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে মিলে যায় তার অব্যক্ত কাতরতার উচ্ছ্বাস।

"সত্যি যদি কিছু ঘটে, আমাকে জানিও, আমি সব স্বীকার করে নেবো।"

"কিন্তু মুখ দেখাবো কি করে?"

"আমার স্ত্রী হয়ে!"

"তখন মনে থাকবে তো?"—শোভনার একখানি হাত গ্রহণ করে ডাঃ গুহ বলেন "আমি কাপুরুষ নই শোভনা।"

শোভনা হাত টেনে নিয়ে উঠে দাড়ালো।

"যাক্ যা জানাবার ছিল সবই জানালাম। শেষ পর্য্যন্ত নিজের ব্যবস্থা মেয়েরা বেশ জানে।"

"তার মানে—?"

"জীবনের মায়া আমার আর নেই ডাক্তারবাবু।" ডাঃ গুহ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন—"তোমার বড়দা, আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—কিন্তু তোমাকে আগেও বলেছি আজও বলে রাখছি, আমাকে না জানিয়ে কখনও কিছু করোনা। বল আমার কথা রাখবে?"

"চলুন ফিরে যাই।"

"হ্যা, রাত হয়ে গেল"—ডাক্তারের স্বর বেশ গম্ভীর।

"রাগ করলেন?"—শোভনা ডাক্তারের হাত চেপে ধরে।

ডাক্তার হেসে ওঠে—"জানতাম এমন না করলে তুমি ধরা দেবেনা—আচ্ছা, তুমি তো সব কথা বললে, আমার কি কিছু বলবার নেই?"

"বলুন।"

"কাণে কাণে বলবো"—

"না থাক"—

"বেশ সেই ভালো।" শোভনার হাত ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার কয়েক পা এগিয়ে যান—।

"বলুন কি বলবেন।"

বাহু-বেষ্টনে-আবদ্ধ শোভনার মুখের দিকে চেয়ে ডাঃ গুহ বললেন—"আজ আমরা এখানে—কিন্তু কাল—কাল তুমি কত দূরে চলে গেছ।"

"ছাড়ুন—ছাড়ুন!" শোভনা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ডাক্তার নিমিষে শোভনাকে মুক্ত করে, সরে গিয়ে দাঁড়ালো—।

*   *   *   *   *   *

"ডাক্তার বাবু ও ডাক্তার বাবু—আর কত দেরী করবেন।" ডাক্তার বেশ সহজ কণ্ঠে বললেন—"তোমাদের খোঁজ করেই তো বেড়াচ্ছি কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ?"

পথের মাঝে শ্যামলী নিম্নস্বরে বলে—'শোভনাদি!'

"কি?"

"এই বুঝি তোমাদের কুঠী দেখা?"

"কেন—"

"আমাকে অত বোকা পাওনি বুঝলে?" শ্যামলী ফিক্ করে হেসে ফেলে।

শাসনের স্বরে ডাক্তার গুহ বলেন—"বাসায় গিয়ে গল্প করলেও চলবে শ্যামলী, একটু পা চালিয়ে চল।"

"এই তো ছুটেই চলেছি—। তা' বলে শোভনাদি'র মত অত তাড়াতাড়ি হাটতে পারি না। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, শোভনাদি' একটুও বসেন নি,—না?"

ডাক্তার গুহের কর্ণমূল যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—গাঢ় স্বরে বললেন—'না'।

৪

অলোক অবাক।

অফিস শুদ্ধ লোক হাসাহাসি টিকাটিপ্পনীর সঙ্গে বেশ জোর আলোচনা চালিয়েছে—ঘোষ ঘটিত ব্যাপার নিয়ে। অলোকের কাণে গেল অনেক কথা, কিন্তু কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করল না। অলোক ভাবে—হঠাৎ স্নুবোধ ঘোষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আবার অফিসের মাঝে নানা রকম গবেষণাও চলছে। নিশ্চয়ই তার উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে যাবে। সেদিন ঠিকাদারকে অতো কথা না বলাই ছিল ভালো। পরক্ষণে, সে দুর্ব্বলতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, মনকে দৃঢ়তর করে তোলে। যা হবার হোক, কিসের ভয় তার—সে তো কোন অন্যায় করেনি। জীবনের উপর দিয়ে তার অনেক রকম ঝড়-ঝাপ্‌টা প্রবাহিত হয়েছে—অনেক ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সামান্য একটা ব্যাপারে, এমন উতলা হওয়া তার সাজে না।

"কিহে, কি এত ভাবছো—?"

অলোক দেখে—দূরে দাড়িয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পে-ক্লার্ক, গোপাল বটব্যাল তার দিকে চেয়ে আছে।

"আজকাল রামলালের ওদিকে যাও নাকি?" অবান্তর প্রশ্নে অলোক একবার মাত্র চাইলো গোপালবাবুর দিকে।

গোপালবাবু উদর-প্রদেশে বার কয়েক আঘাত হেনে, তেল চট্‌চটে মলিন, সূত্র-গুচ্ছটিকে কর্ণদেশে জড়িয়ে পরপর সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে লাগলেন।

দরজার পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে, অলোক অনেকটা আশ্বস্ত

হোল। যাক্.—সুবোধ ঘোষ একলা নন। টেবিলে প্রসারিত নক্সা-খানার উপর ঘোষসাহেবের দৃষ্টি নিবদ্ধ—ভরাট মুখ বিরক্তিতে ভরা।

"মাত্র পনর দিনের মধ্যে আপনাকে কমপ্লিট্ করতেই হবে। আপনারা নেবেন কনট্রাক্ট, অথচ জবাবদিহি দেব আমরা।" সুবোধ ঘোষের বাজখাঁই আওয়াজ যেন অনেকটা নেমে গেছে।

"কি রকম বর্ষা নেমেছিল, সেটা ভাবুন 'স্যার'। উত্তর দিলেন ঠিকাদার শ্রীকিষেন সিং।

"সে কথা আমায় জানিয়ে তো কোন লাভ নেই"।

"আপনি নিজের চোখে সব দেখেছেন, দ্বিতীয়তঃ—সব নির্ভর করছে আপনার রিপোর্টের উপর। কাজেই আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য"।

"বেশ, কিন্তু পনর দিনের একদিনও বেশী নয়।"

নক্সাখানা গুটিয়ে নিয়ে—চেয়ার ত্যাগ ' করে শ্রীকিষেণ সিং বলে উঠলেন—

"পনর দিনও লাগবেনা, দশ দিনের মধ্যেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা দেখা যাবে তখন"—ঘোষ সাহেবের মুখে চোখে বিকৃত-হাস্যের সঙ্গে ফুটে ওঠে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য।

"মিঃ ঘোষ, আমি মিথ্যা বলি না,—আপনি নূতন, হয়তো জানেন না, কিন্তু আপনার উপরওয়ালারা—, আমাকে বেশ চেনেন। রাজা খেতাব, সরকার বাহাদুর মুখ দেখেই দেননি জানবেন। আপনার ঐ 'টমসন' কোম্পানীই নিয়েছিল শিলিগুড়ির 'ব্রিজওয়ার্ক', কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'ব্রিজটা' খাড়া করিয়েছি আমিই। এডওয়ার্ড সাহেব এখনও

আছেন—বিশ্বাস না হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন। আচ্ছা বাবু নমস্কার—।”

গম্ভীর মুখে শ্রীকিষণ সিং কক্ষ ত্যাগ করলেন।

শ্রীকিষণ সিংহের 'বাবু' শব্দটির প্রয়োগে ঠিকাদার মটরুমলজীর গুম্ফগুচ্ছটি যেন ঈষৎ নেচে উঠলো। মটরুমল দু-হাতে গোঁফে চাড়া দিয়ে দোলায়মান টানা পাখার দিকে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে রইলেন।

“চিফ্ অফিসের সুপারিশে যে কাজ ওঠে না, তার প্রমাণ আমি করিয়ে দেব।” পরক্ষণে ড্রয়ার থেকে আর একখানা নক্সা বের করে অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে—ঘোষ বললেন—

“এই টাইপের দশটা কোয়ার্টার—তিন মাসে 'ফিনিস' করা চাই”।

মটরুমলের চোখ দুটো নক্সার উপর থাকলেও বাঁ হাতখানা চলে গেছে ভাটিয়া কোটের পকেটের মধ্যে—

“হাঁ, তা জরুর করিয়ে দেবে—”।

কথার শেষে মটরুমল একখানা লম্বা ধরণের খাম রাখলেন টেবিলের উপর।

খামখানা এক নজরে দেখে নিয়ে, ঘোষ সাহেব ঘাড়ের ছাঁটাই চুলের উপর হাত বুলোতে বুলোতে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

অলোকের নমস্কারে ঘোষ সাহেব মাথাটা একবার দোলালেন মাত্র।

“তোমরা ক' জন আছ এখানে?”

অলোক সুবোধ ঘোষের প্রশ্ন বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে।

“পূর্ণিয়া টু কৃত্যানন্দনগর সেক্‌সনে তোমরা কত জন আছ, সেনগুপ্তের “আণ্ডারে”?

ক্ষণ কাল পরে অলোক বলে—

'আঠারো জন'।

"আঠারো জন! এই টুকু সেক্‌সনে?"

সুবোধ ঘোষ—এমন ভাবে চেয়ে রইলেন, যেন অলোকই একটা মস্ত রকম অন্যায় করে ফেলেছে—।

"একসঙ্গে এতগুলো থাকা মানে, শ্রেফ্ আড্ডা দেওয়া"—ঘোষ স্বীয় চিবুকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বার কয়েক মৃদু আঘাত হেনে, অকস্মাৎ বলে উঠলেন—

"তোমাকে শাশি থেকে ওদিকের কাজ দেখতে হবে। ওদিকে লোকের অভাব অথচ এখানে চলছে গুঁতোগুতি। যত তাড়াতাড়ি পারো সেখানে গিয়ে আমাকে রিপোর্ট দেবে। আচ্ছা যাও।—"

অলোকের বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। সে ভেবে ছিল সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে সুবোধ ঘোষ নিশ্চয়ই তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

স্থান পরিবর্ত্তনের কথায় যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ, দুই বিপরীতমুখী চিন্তা তাকে চেপে ধরলো।

বদলি হওয়ার সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি নূতন স্থান—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে থাকা। অন্যদিকে—এখানকার সহকর্ম্মীবন্ধুর দল, নূতন-স্থাপিত ক্লাব, আনন্দ-উৎসব—সমারোহ, সব কিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ড্রইং অফিসের সামনে বেশ ভীড় জমেছে। হেডক্লার্ক বিভূতি সিংহ, চড়া গলায় একটানা বকে চলেছেন।

"কি ব্যাপার দ্বিজেনদা।"

"রমাবাবুর কীর্ত্তি—আফিংএর ঝোঁকে সব ওলোট পালোট।

কলকাতার চিঠি সৈয়দপুরে, সৈয়দপুরের ডাক গেছে কাঁচড়াপাড়ায়। কলকাতা থেকে গুঁতো এসে হাজির"

হেডক্লার্ক ধমকে উঠলেন—"ভীড় কেন? ভালুক নাচ হ'চ্ছে বুঝি?"

বিভূতি সিংহের পিছনে একে একে সকলে চলে গেল।

"এখানে কিছু হবে না। বিভূতিবাবু কেমন কড়া মেজাজী জানেন তো? বড় সাহেবকে ধরুন, হয়তো কিছু হতে পারে।"

দ্বিজেনবাবুর কথায়, রমণীবাবু ম্লানমুখে একটুখানি বোকার হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

"বড় সাহেবকেই ধরি—কি বল ভায়া?"

অলোক জিজ্ঞাসা করে—"সব চিঠিগুলো ভুল করলেন কি করে?"

"কি জানি ভাই, এমন তো কখনও হয় না, হয়তো ভুল করে এক সঙ্গে দুটো বড়িই গিলেছি। আর একবার বড়বাবুর কাছে যাই কি বল?"

"দেখুন।"

রমণী বাবু বড়বাবুর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

"তোমাদের নাটক থেকে আমাকে বাদ দিও।"

"কেন?"

"ঘোষ সাহেবেরহুকুমে শাশিতে বদলি হচ্ছি"

"বদলি না নির্ব্বাসন? ঘোষের মুণ্ডু ঘুরে গেছে, ব্যাপারটা ভাট্রা, সিটি, খাজাঞ্চিতে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে যে।"

বারান্দায় রমণীবাবুকে দেখা গেল।

"শুধু শুধু কথা শুনতে রমণীবাবুর খুব ভাল লাগে—বললাম—

বড় সাহেবকে ধরতে, তা নয় কেবল বিভূতি সিংহের কাছে গিয়ে হাত জোড় করা। আমি যাই অলোক, তুই ভাবিস না, তোকে এখন কেউ সরাতে পারবে না।"

অলোক অগ্রসর হোল।

"ও ভায়া - অলোক ভায়া"

"কি হোল—বড় বাবু কি বললেন ?"

"কি আর বলবেন বল ? তিনি রিপোর্ট দিয়ে খালাস। চল এক সঙ্গে যাই "

বার্দ্ধক্যে অবনত অভাবী রমণীবাবুকে দেখলে আপনা থেকেই করুণার উদ্রেক হয়,—যদিও দারিদ্র্য, তাঁরই লালসা আর মূর্খামীর পরিণতি তৃতীয়পক্ষ গ্রহণ না করলে—আজ তিনি উপযুক্ত পুত্রের সংসারে স্বচ্ছন্দ-গতিতে, দিব্য আরামে—জীবনের স্বল্প অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারতেন।

বোম্বের খ্যাতনামা চিকিৎসক অনুপ মুখোপাধ্যায়—মাসে মাসে জন্মদাতাকে ত্রিশ টাকার মণিঅর্ডার পাঠিয়েই খালাস,—একটা চিঠিও লেখেনা।

বয়স যতই হোক, শরীর যতই নুয়ে পড়ুক বৎসরান্তে পোষ্য-বৃদ্ধির বিরাম নেই—।

সময় সময় বিদ্রূপ—ভৎসনায় রমণীবাবু বলেন—"আরে এতে কি মানুষের হাত আছে, সবই ভগবানের কারসাজী—বুঝলে ভায়া—। বুড়ো বয়সে সংসার পেতে কি ঝকমারিই না করেছি। উঃ যদি জানতাম -!

বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে—অকস্মাৎ রমণী বাবু বলে উঠলেন— "কিছু আছে না কি ভায়া ? চাকরী গেলেও পোড়া পেট তো

মানবে না, এক পাল এসে জড়ো হয়েছে আমার খোঁয়াড়ে—আপদ সব গেলে বাঁচি,—দাও মা ভায়া কয়েক আনা পয়সা—।"

অলোক ব্যাগ খুলে জিজ্ঞাসা করে - "কত দেব বলুন—।"

"ছ' আনা—আট আনা, যা হয় দাও"—।

অলোক একটি টাকা দিল।

"তাহলে বড় সাহেবকেই ধরি, আর তো উপায় দেখছি না" অলোক চুপ করে থাকে।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ রমণী বাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন ."

"কি হোল ?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে, রেখাঙ্কিত কপালের শিরা উপশিরা অতিরিক্ত কুঁচকে—হতাশ কণ্ঠে রমণীবাবু বলে উঠলেন—"কি আর হবে,—ভাবছি এক টাকায় তো কিছুই কুলোবে না—বস্তির গর্ভধারিণীর যে স্ফূর্তি ফুরিয়েছে—"। দাও ভায়া—আর একটা দাও— অফিস থেকে টাকাটা পেলেই দিয়ে দেব'খন"।

ঋণ পরিশোধ দিতে রমণীবাবু জানেন না, তবুও শোধ দেব কথাটুকু প্রত্যেকবার বলা চাই।

চৌরাস্তার মোড়ে এসে দু'জনে বিভিন্ন পথ ধরলো।

"অলোক"—।

অলোক দেখে গাছতলায় বসে আছেন নীলাম্বর পণ্ডিত ·

"থাক-থাক, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো বাবা।"

"সীতা ভাল আছে পণ্ডিত মশাই ?"

সীতা ! সীতা মা'কে তার ভাশুর নিয়ে গেছে বাবা -"

"কোথায় যাবেন এখন ?"

"কোথাও না।"

"আচ্ছা আমি যাই পণ্ডিত মশাই— ।"

"এসো বাবা"।

পথ চলতে চলতে অলোকের মনে ভেসে ওঠে কত কথা—। ছেলেবেলায় যখন সে প্রথম ভারত-ইতিহাস পড়ে, তখন থেকেই নীলাম্বর কাব্যতীর্থের উপর তার মনে শ্রদ্ধা জাগে। আশ্চর্য্য হয়ে কতবার সে পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে চেয়ে থাকতো। ইতিহাসের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল দেখে সে অবাক হয়ে যেতো। নিশ্চয়ই বরদা বাবু ভুল বলেছেন—বাঙালীদের মধ্যেও অনেক আর্য্য-বংশধর আছেন—প্রমাণ পণ্ডিত মশাই। না হলে এমন সামঞ্জস্য কেন? প্রত্যেকটি বর্ণনা যে মিলে যায়—। দীর্ঘ গৌরবর্ণ তনু, উন্নত নাশা, বিস্তৃত চক্ষু, কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ—, পণ্ডিতমশাই নিঃসন্দেহে আর্য্য।

মনে পড়ে কুনালকে —। পণ্ডিত মশাইয়ের পুত্র তার সহপাঠী, খেলার সাথী, রোগা ছিপ ছিপে কুনাল।

অলোক অবাক হয়ে যায় সেই কুনাল কলেজে প্রবেশ করে, কি করে হয়ে উঠলো—অমন দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী।

কুনাল চলে গেছে ফাঁসীর মঞ্চে, জীবনের জয়গান গেয়ে—। অলোক গৌরব অনুভব করে—বিপ্লবী কুনাল ছিল তার বন্ধু! একদিনকার ঘটনায় তার হাসি পায় -বঙ্কিম রায়—কুনাল সম্বন্ধে গালভরা মুখ রোচক কত মিথ্যা বলে গেল অথচ সে জানে বঙ্কিমের সমস্তই মিথ্যা, সব কিছু কল্পনার জালে বোনা—অসত্যের রঙে রাঙা।

কুনাল চলে গেছে—শাসন-শক্তির সীমার বাইরে তাই বিদেশী সরকারের পুঞ্জীভূত রোষ পতিত হয়েছে রাজদ্রোহীর পিতৃমস্তকে।

অদ্ভুত বিচার ! পণ্ডিত মশাইয়ের চাকরী নেই জমি জমা বাস্তুবাটী, সবই সরকারে বাজেয়াপ্ত।

সীতা ! কয়েক বৎসর পরে তাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি। এ যেন চার বৎসর আগেকার সীতা নয়,—এক খানি চলন শীল অগ্নিশিখা।

অলোকের সমস্ত অন্তর ব্যথায় ভরে যায়। বিধাতার উপর নিষ্ফল ক্রোধে—সে ফুলে ওঠে। হায় অভাগিণী বিধবা সীতা! পরক্ষণে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির পুলকে সে তন্ময় হয়ে উঠে। সীতা,—তার কথা রেখেছে—তার ভ্রাতৃত্বের দাবী—সে মেনে নিয়েছে নিশ্চয়ই। আপনা থেকেই অলোকের চোখ বন্ধ হয়ে যায়।—

"তুমি দেখো—তুমি দেখো সীতাকে"।

এলো মেলো কত কথা মনে পড়ে। প্রায় এক বৎসরকাল সে ছিল পণ্ডিত মশায়ের সংসারে—অথচ কোন দিন একটি সামান্য জিনিষ পর্য্যন্ত পণ্ডিত মশাই কিনতে দেননি।

অনুযোগ করলে ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়েছেন—"সামর্থ্য যে দিন থাকবে না অক্ষম অথর্ব্ব হয়ে যাবো যে দিন, সেদিন কুনালের কাজতো তোমরাই করবে বাবা।"

কত আত্মীয় অনাত্মীয় অলোককে প্রতারিত করে, ঋণের নামে তাকে ঠকিয়েছে—অথচ এখানে—সে তার সব কিছু দিতে পারলেই কৃতার্থ হয়ে যায় কিন্তু উপায় নেই—।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতে আঘাতে তার বিশ্বাস—স্নেহ মায়া ভক্তিও শ্রদ্ধার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে—। দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ—দূর থেকে চিরদিন সে মানুষ হিসাবে—শ্রদ্ধা নিবেদন করবে পণ্ডিত

মশাইকে—। মনে থাকবে,—তার দুনিয়ায় অন্ততঃ এমন একজন আছেন, যিনি সত্যিকার মানুষ—যিনি তার শুভাকাঙ্খী। এই টুকুই পরম লাভ—চরম সান্ত্বনা।

৫

"দিদি, দিদি ভাই।"

শ্যামলী বুলুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকে।

মূর্চ্ছার ঘোর তখনও সবটুকু কাটেনি,—কথা বলবার চেষ্টায় বুলুর ওষ্ঠদ্বয় একটুখানি কেবল কেঁপে উঠলো।

"দুধ টুকু খেয়ে নে ভাই,—"

উঠবার উপক্রম করতেই শ্যামলী বাধা দিয়ে বলে—"এখন উঠিস না হয়তো আবার ফিট হবে, আমি একটু একটু করে ঢেলে দিচ্ছি।"

দুগ্ধ পানে শরীরে অনেকটা শক্তি ফিরে আসে,—বুলু ধীরে ধীরে শ্যামলীর একখানা হাত টেনে নেয়।

"দীপু কেমন আছে?"

"এক ভাবেই চলছে—বরফ নামালেই সঙ্গে সঙ্গে চার পেরিয়ে জ্বর উঠছে।"

"ওসব না ভেবে নিজে একটু সামলে নে—"

"সেদিন বেড়াতে না গেলেই হোত"

"আহা! তোকে দেখলে জ্বর ভয় পেতো বুঝি? নে ওসব ভাবনা রেখে ঘুমোতো খানিকক্ষণ"।

বুলু মুদ্রিত চোখে; নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবে। কি অশুভক্ষণেই না তার জন্ম হয়েছে! মা বাবা কবে চলে গেছেন—তাঁদের কথা এতটুকুও

মনে পড়ে না। যেখানে যাই সেখানেই কেবল অশান্তি, ব্যাধি, মৃত্যু আর শোক। মামীমা নাম দিয়েছেন যমদূতী। সত্যিই তো সে যমদূতী —তা না হলে বড় মামা হঠাৎ মোটর চাপা পড়তেন না। মাসীমা ঠিকই বলেছেন—"চোখ তো নয় যেন ডাইনীর দৃষ্টি,—যেদিন পোড়ার-মুখী এলো, সেদিন থেকেই আমার সোনার বাছা বিছানা নিলো।" মাসীমা মিথ্যা বলেননি—সত্যিই তার দূষিত নিঃশ্বাসে শান্তি-সুখময় সংসার যেন দগ্ধ হয়ে যায়। প্রদীপ ভাল হয়ে উঠুক—আর কোন দিন সে তার দিকে চাইবে না। অবোঝ বোঝে না,—কেবল দিদি, বুলুদি' বলে অস্থির হয়।

না,—না—সে আর তার এই পোড়া ডাইনীর চোখ দুটো দিয়ে দীপুর দিকে চাইবে না—চাইবে না।

শ্যামলী সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—"মায়ের কথায় কাঁদিস না ভাই। জানিস তো সেই অসুখের পর থেকে মা'র মাথার দোষ হয়েছে।"

বুলু জবাব দেয় না—কেবল তার দু'চোখ দিয়ে নামতে থাকে—বিন্দু বিন্দু উষ্ণ অশ্রু—।

"বাবা আসছেন। চোখ মুছে ফেল"—

"কেমন আছিস মা"?

"এখন বেশ ভাল আছি মেসোমশাই"—

বসবার উপক্রম করতেই, অশ্বিনী বাবু বাধা দিয়ে বলেন—"ডাক্তার বলে গেছেন, অন্ততঃ পক্ষে আজকের রাতটুকুও যেন উঠতে না দেওয়া হয়। দেখি মা—হাতখানা।"

নাড়ী পরীক্ষার পর অশ্বিনী বাবু শ্যামলীকে বললেন—"যা তো মা, বেশ একটা বড় দেখে বেদানার রস করে আন তো"

বুলু প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—"এই একটু আগে দুধ খেয়েছি মেসোমশাই।"

"তা হোক্। কাল একবার সিভিল সার্জ্জেনকে আনতে হবে, এতদিনেও দুর্ব্বলতা যায় না কেন?"

দুর্ব্বলতা না যাওয়ার কোন দোষ নেই,—টাইফয়েড্ থেকে ওঠার পর, কলকাতায় ছোট মামা, বুলুর জন্য যত ফল, বলকারক খাদ্যই আনুন না কেন, তার এক কণাও জোটেনি বুলুর ভাগ্যে।

ছোট মামার বিয়ে হয়নি তাই সাংসারিক জ্ঞান এখনো ঠিকমত জন্মায়নি। অন্য মামারা ভাল-মন্দ কোন কথাও তো জিজ্ঞাসা করেন না কোন দিন। মেসোমশায়ের সঙ্গে বড় মামার অনেকটা মিল আছে। অফিস থেকে আসবার সময় প্রত্যেক দিন পকেটে করে খাবার এনে চুপে চুপে খাওয়াতেন তিনি। চোখ দুটো যেন ঝাপ্সা হয়ে উঠলো।

ছোট্ট বাংলোটি হয়ে উঠেছে কেমন ধারা বিশ্রী থম্ থমে। ঘর, বারান্দা, উঠানে, আলো জ্বলছে তবু যেন অন্ধকার।—বাইরে একটা কুকুর মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করে উঠছে।—নেপালী চাকর 'থাপা' কতবার কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে— তবু—তো নড়তে চায় না!

৬

বিরাট টিন্ সেডের মধ্যে চলছে 'ক্যারম' 'টেবিল-টেনিস'। গল্পবাজেরা গল্পে মত্ত, সবজান্তাদের গল্প চড়েছে সপ্তমে, হয়তো সমালোচনা, হাতা-হাতির কাছবরাবর প্রায় এসে গিয়েছে। বর্ত্তমানের এই 'মিলনী' ভবিষ্যতে দাঁড়াবে গুড্স অফিসে।

অন্যদিন এমন সময় নাটকের মহড়া চলে। আজ একটা সভা হবে, তাই অভিনেতারা নিঃঝুম। রাত্রী প্রায় ৯টা কিন্তু মূল সভাপতি, এবং সেই সঙ্গে অনেক মুরুব্বীরও দেখা নেই অথচ বিজ্ঞাপন-পত্রে সকলেই স্বাক্ষর দিয়েছে!

শেষ পর্য্যন্ত বিভূতি সিংহের সভাপতিত্বে, সভাপর্ব্ব শেষ হল। বিশ্বকর্ম্মা পূজায় অভিনয় অসম্ভব, মহালয়া থেকে তিন দিন চলবে আনন্দ-উৎসব। পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির খরচ যোগাবেন ঠিকাদার শ্রীকিষণ সিং ও মটরুমল—লাড্ডুমল তিরুমল ভ্রাতৃদ্বয় বহন করবেন ভোজ কার্য্যের ব্যয়।

সভার শেষে অনেকে আসন ত্যাগ করে উঠতে, বিভূতিবাবু বললেন —"আমোদ প্রমোদ সব কিছু কেবল আমরাই ভোগ করবো, অথচ আমাদের ছেলেমেয়েরা সে দিক দিয়ে থাকে বঞ্চিত। তাদেরও একটা কিছু করা চাই, কি বলুন?"—চিৎকার উঠলো—

—"স্পোর্টস স্পোর্টস, ছোটদের জন্য স্পোর্টসের ব্যবস্থা হোক—!"

"আঃ বড্ড গোল হচ্ছে,—"

বিভূতিবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। "ছোটদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমান দিলীপ বাবাজী কিছু বলতে চায়—"

আবার হট্টগোল সুরু হয়—"আমরা উদগ্রীব হয়ে রয়েছি,—

বলে ফেলুন দিলীপবাবু—বক্তব্যটুকু বলে ফেলুন, আমরা পরম আগ্রহে শ্রবণ করবো" ইত্যাদি—

বিভূতি সিংহ টেবিলের উপর বার কয়েক আঘাত হেনে দু'হাত তুলে চীৎকার বন্ধের অনুরোধ জানালেন।

উঠে দাড়ালো, বিভূতি সিংহের ভাগিনেয় শ্রীমান দিলীপ।

"এই সব মেয়েরা অর্থাৎ এই সমস্ত বোনেদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। এদের, আমোদ প্রমোদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য।"

"একবার নয় হাজারবার—হাজারবার"

বিভূতি সিং উঠে দাড়াতেই চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল।

দিলীপ গলা পরিষ্কার করে বলে চলে—"ভেবে দেখুন, আর কয়েক বৎসর পর এদের আপনারা দেবেন নির্ব্বাসন। নিজের বাড়ীতে যদি কুমারী অবস্থায়, অর্থাৎ আইবুড়ো বেলায়, যারা দুনিয়ার সাধ আহ্লাদ, আমোদ প্রমোদের আস্বাদন পেল না, তাদের ভাগ্যে, পরের বাড়ীতে কি জুটতে পারে? কিছুই না—শ্রেফ্ হাঁড়ি আর হেঁসেল, হেঁসেল আর হাঁড়ি। তাই আমি তাদের হয়ে বলতে চাই, এদের সম্বন্ধে একটা কিছু করুন—।"

দিলীপ বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবগৃহ করতালিতে কেঁপে উঠ্লো।

"শ্রীমান দিলীপ বাবাজীবনের বক্তব্যটা, আমার মনে হয়, একেবারে অন্যায় নয়—?"

বিভূতিবাবুর কথার জবাব দিল একজন, দূর থেকে নিজেকে অন্তরালে রেখে –

"অন্যায় বলে মনে করাটাই একটা মস্তবড় অন্যায়।"

কিছুক্ষণ ধ'রে চললো হট্টগোল—নানাজনে প্রস্তাব করে নানা রকমের, সেই সঙ্গে চলে যুক্তি তর্ক। সকলেই প্রস্তাবকারী কিন্তু কেউ কাউকে মানতে রাজী নয়, সকলেই বক্তা হয়ে উঠেছে, শ্রোতার একান্ত অভাব।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য, একটা ছোট নাটক এবং সেই সঙ্গে স্পোর্টসের ব্যবস্থাও হবে। ছোটদের পুস্তক নির্ব্বাচন, শিক্ষাদান, সমস্ত কিছুরই ভার পড়লো দিলীপের উপর,—এ সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। হরিঘোষ ষ্ট্রীটের সবুজ সঙ্ঘের সেই-ই ছিল উদ্যোক্তা, আর প্রতিষ্ঠাতা।

সভার শেষে জনান্তিকে কয়েকজনে হাসাহাসি করে। তাদের আলোচনার বিষয় বিভূতি সিংহের ভাগিনেয়, প্রিয়দর্শন দিলীপ—।

"কথা বলার ভঙ্গি দেখেছিস ?—একেবারে কেতাব দুরস্ত।"

অন্যজনে জবাব দেয়—

"থাকবে না কেন ? একে বড়বাবুর ভাগ্‌নে, তার উপর চেহারাখানা সুন্দর, বয়েসও অল্প, চোখে রীম্‌লেশ,—

"কিন্তু হঠাৎ এই অহেতুক ভগিনী-প্রীতি জেগে উঠলো কেন ?" সুধীর হঠাৎ একটা অদ্ভুত মন্তব্য করে বসলো। নিরাপদ প্রতিবাদ করে বলে—

"তোর যেমন শকুনের চোখ সবেতেই নোংরা পচা খুঁজিস।"

"আচ্ছা দেখে নিস্, ও আমার অনেক দেখা আছে। রেলকলোনীর অতিথি মামাবাবু, নতুনদা, দাদাবাবু, ইত্যাদির কীর্ত্তি লুকোনোর জিনিষ নয়রে"।

পথের মাঝে দিলীপ গীতাকে বলে—

"দেখলি তো, কেমন লেকচার দিলাম, যুক্তির বহরে সবাই থ হয়ে গেল, বাছাধনদের টুঁশব্দটি করতে দিলাম না।"

"তা সত্যি—কেউ তো আপত্তি তুললো না।"

আপত্তি ! আপত্তি করলে দেখতিস, লেকচারের বহরটা একবার।

'হুঁ' তবুও কোন 'বোম্বাষ্টিক' কথাই বলিনি। কৃষ্টি, মানবতা, প্রাণ-ধর্ম্ম, প্রগতি, এসব দিয়ে কথা বললে, দেখতিস লেকচার কাকে বলে,—এতো কেবল একতরফা। দেখ্ সবিতা, রাণু এদের আজই খবর দিয়ে যাবো কেমন ?"

"কি বই ধরবে ভাই দিলীপ দা ?"

দাড়া আগে ভেবে দেখি। তবে এমন বই বাছবো, যাতে ওদের তাক্ লাগিয়ে তবে ছাড়বো। ছুটো ড্যান্স দেব, একেবারে 'ওরিয়েণ্টাল' দেখ্ না কি কাণ্ডটাই না করি !"

"আমায় একটা নাচ শিখিয়ে দেবে তো ?"

গীতার পিঠের উপর হাত রেখে দিলীপ জবাব দেয়—

"আগে সোজা হয়ে চলতে শেখ, দাড়াতে শেখ,—কুঁজো হয়ে দাড়ালে নাচা যায় না।"

গীতার সমস্ত শরীর কেমন ধারা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে সে—বাপ-মা সখ করে ফ্রক্ বজায় রেখেছেন—খুকুমণি নামে আদর করেন কিন্তু তাই বলে কি সোজা হয়ে দাড়ানো যায়—? মনে মনে বলে "দিলীপদা যেন কি ? কিচ্ছু জানেনা, কিচ্ছু বোঝে না—।" দিলীপের হাতখানা পিঠ থেকে গীতা নামিয়ে দেয়।

"রাণুদি ও রাণুদি"—?

রাণু এসে দাড়ায়—, গীতা সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিলীপদা'র বাহাদুরী।

"সত্যি নাকি ?"

"বিশ্বাস না হয় দিলীপদা'কে জিজ্ঞাসা কর। দিলীপদা শোন শোন।"

দিলীপ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, রাণুর মুখের দিকে চেয়ে, দিলীপ সবিস্তারে বর্ণনা করে তার বাহাদুরী—তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়। রাণু মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও, বেশীরভাগ সময় সে চেয়ে থাকে দিলীপের মুখের পানে।—রাত্রীর অন্ধকারে সঙ্কোচ, জড়তা, লজ্জা, অনেকটা যেন কমে গিয়েছে—।

"একটা লবঙ্গ দাও তো এনে, চীৎকার করে গলাটা যেন খুস্ খুস্ করছে।"

রাণু এক ছুটে লবঙ্গ নিয়ে আসে।

"যাঃ পড়ে গেল"!

থতমত খেয়ে রাণু বলে—"আবার এনে দিচ্ছি।"

"থাকগে আর দরকার নেই"।

দিলীপ ও গীতা এগিয়ে যায়—রাণু দরজার সামনে দাড়িয়ে থাকে—।

"উঃ দিলীপদার হাতখানা কি গরম,—"পরক্ষণে সে হেসে ফেলে—

'লবঙ্গ নেওয়া না ছাই,—খপ্ করে হাত চেপে ধরে, কেউ কোন জিনিষ নেয় বুঝি? সব চালাকী! দিলীপদা ভেবেছে আমি ভারি বোকা। রাণু আপন মনে আবার হেসে ওঠে।

৮

"সমস্ত দিন ধরে কেবল খেটে মলাম, কেন খেয়ে এলে বল তো ?"

রাঙাদি'র কথায় অলোক চুপ করে থাকে।

"আচ্ছা যা পার একটু মুখে দাও।"

"খুব একটু আনবেন।"

রাঙাদি' চলে গেলেন। অলোক ভাবে কপালের তিলক আর নাকের রসকলি না থাকায়, রাঙাদি'র মুখের অদল একেবারে বদলে গিয়েছে। পরণের শাড়ীখানাও আট পৌরে নয়।

"যা, পার খাও।"

"এতো খাবো কি করে বলুন।"

রাঙাদি হেসে ওঠেন।

"বলছি তো যা পার খাও।"

"একখানা ডিসে, একটু করে সব তুলে দিন।—"

"বেশী বকিও না, যা পার খাও,"

"সবই যে নষ্ট হবে,"

"বলছি নষ্ট হবে না, এসো এসো—"

অলোকের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে রাঙাদি' আসনে বসিয়ে দিলেন।

অক্ষুধা ও অনিচ্ছা সত্বেও সব কিছুরই, কিছু কিছু গ্রহণ করতে হয়।

"নষ্ট হবার ভয়ে শরীর খারাপ করতে বলছি না, কেবল চেখে দেখ, কেমন হয়েছে, বুঝলে—"

জলের গ্লাস হাতে তুলে অলোক বলে—"ভরা পেটে স্বাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু সত্যি বলছি, সব খুব ভাল হয়েছে রাঙাদি' ।"

"থাক্ আর মিথ্যা বলতে হবে না। আমার রান্না তোমার পছন্দ হয় না।"

"কেন বলুন তো ?"

"কেন আবার। সেদিন অত করে ডেকে পাঠালাম, সমস্ত দিন উপোষ করে থাকলাম, বাবুর দেখা নেই।"

অলোক মনে মনে লজ্জিত হয়, নাঃ—সেদিন তার বলে পাঠানো উচিত ছিল।

'রাঙাদি থালা হাতে নিয়ে বলেন—"টেবিলের উপর পান আছে, আমি এসে মশারি ফেলে দিচ্ছি"—

সেই গঙ্গাস্নানের পর অলোক আজ প্রথম রাঙাদি'র সঙ্গে দেখা করলো। মেসে এসে যখন শুনলো, সারদাবাবু কলকাতা গিয়েছেন, তাকে এ কয়দিন থাকতে হবে সেখানে—তখন সে পড়েছিল এক ভীষণ ভাবনায়। যাক্ ভাবনার কিছু নেই, মনিহারীর ঘটনা, একটা দুর্ঘটনা মাত্র। অলোক আশ্বস্ত হয়।

মশারি খাটিয়ে অলোক সামনের বারান্দায় একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। কাল দুপুরে কলকাতা পৌঁছবেন, তারপর কাজ মিটুতে দু'দিন ফিরতে দু'দিন,—কম করে সাত দিন তাকে এখানে থাকতে হবে রাঙাদিকে পাহারা দিতে—। সারদা বাবুর উপর অলোক বিরক্ত হয়—তাকে না ডেকে, দু'জন নেপালী চৌকিদারকে রাখলেই তো হয়—

"বারান্দায় খুব ফুরফুরে বাতাস না ?"

"আপনার খাওয়া হয়ে গেল ?"

"হ্যাঁ গো,—"

"খুব তাড়াতাড়ি খান তো আপনি—।"

"তাড়াতাড়ি খাই—তবে আজ আর তো বেশী কিছু খাই নি। ক্ষিদেও ছিল না, কেবল তোমার পাতের— ।"

হঠাৎ রাঙাদি থেমে যান —। অলোক চেয়ার থেকে উঠে দাড়ায়—।

"খুব জোর বৃষ্টি আসছে ভিতরে আসুন।"

"মশারী খাটালে কেন,—"

"ময়লা চাদরটা বদলে দিতে হবে যে।" অলোক আপত্তি করে বলে—

"ময়লা নয় তো।"

"না হোক বুড়োর বিছানায় শুলে, বুড়ো হয়ে যাবে যে,—বাবা বুড়োর ঘামে কি কটু গন্ধ।"

পরিষ্কার ধপ্ধপে চাদর পেতে মশারী খাটিয়ে রাঙাদি বলেন—

"কেমন হোল ?"

"একেবারে রাজশয্যা—"

'আচ্ছা একটু দাড়াও—একটা জিনিষ নিয়ে আসি"—, অলোক শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বেশী কথা না বলাই ছিল ভালো। মনিহারীতে এই ভাবেই সে বিপদ ডেকে এনেছিল।

নাও—কাপড়খানা বদলে ফেল, ততক্ষণে বিছানায় এটা ছিটিয়ে দিই— ।"

অলোক বিনা প্রতিবাদে ধোয়ানো ধুতিখানা নিয়ে বারান্দায় চলে গেল, যদিও মেস থেকে আসবার সময় সে কাচানো ধুতি পরেই এসেছিল।

"গন্ধ পাচ্ছ ?"

"হুঁ"

"হুঁ" কি—? খুব ভাল এসেন্স প্যারিসের তৈরী—দেখনা !"

অলোক ছোট সুদৃশ্য শিশিটা আলোতে তুলে ধরে।

"নাও শুয়ে পড়। আলোটা জ্বালা থাকবে তো ?"

"হ্যাঁ, একটু কমিয়ে দিচ্ছি।"

"ঐ পাশে জলচৌকির উপর কুঁজো গেলাস আছে—বুঝলে,?"

রাঙাদি পাশের ঘরে চলে গেলে, অলোক মনে করে ভিতর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া ভাল! নাঃ শেষে হয় তো এ থেকেই বিপদের সূত্রপাত হবে। বিছানায় শুয়ে—অলোক স্থির করে এবার থেকে সে গোঁফ কামাবে না,—হ্যাঁ ঠিক হবে। বড় গোঁফের সাহায্যে সে বড় হয়ে উঠবে—আর এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হবে না। বিমল, সুধা,—হয়তো তার চেয়ে কিছু বড়—কিন্তু তাদের কেউ এত বিশ্বাস করে না কেন ?

অন্য কোথাও বদলি হলে সে বেঁচে যায়—প্রত্যেকের বাসায় তার অবাধ গতি—এত মেলা মেশা, তার ভাল লাগে না।

অনেকের মুখে সে নানা রকমের গল্প শুনেছে—তার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে—না—না—এ সব ভাল নয়—কি থেকে কি ঘটে যাবে—কে জানে—!

হঠাৎ অলোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল।—স্বপ্ন দেখছিল নাকি সে—! গালের উপর কি যেন লেগে আছে—. অলোক উঠে বসলো আলোটা নিভে গেছে, না কেউ নিভিয়ে দিয়েছে! পায়ের দিকে ওটা কি ?

"ভয় পেয়েছ বুঝি ?"

"কে রাঙাদি' ?"

"না ক্ষণা, ক্ষণপ্রভা বুঝলে—"

অলোক বিছানা থেকে বেরিয়ে গেল —।

"কি হল ?"

অলোক কথা কয়না, রাঙাদি' কিছুক্ষণ পর আলোটা জ্বেলে বললেন, "নাও শুয়ে পড় ।"

অলোক ওঠে না চুপ করে চেয়ারে বসে থাকে

"চল ।"

"না ।"

রাঙাদি' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, পুনরায় বলেন—"সমস্ত রাত চেয়ারে বসে থাকবে ?"

অলোক নিরুত্তর ।

"তবে আমিও জাগবো তোমার সঙ্গে—"

অলোক বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে—"আপনি ও-ঘরে যান ।"

"কেন, আমি বাঘ, না ভালুক ?"

অলোক চেয়ার থেকে উঠে দাড়াতে, রাঙাদি' তার হাত চেপে ধরে—

"এই রাত্রির মধ্যে কোথায় যাবে— ?"

অলোক হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—"মেসে—"

"মেসে – ? না যেতে পাবে না ।"

রাঙাদি' দরজায় পিঠ দিয়ে দাড়ালো ।

"দুর্নামের ভয় তোমার না থাক্, আমার আছে ।"

অলোক রাঙাদি'র দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ।

"কিছু বোঝনা যেন, হঠাৎ এত রাত্রে চলে গেলে, মেসে যখন জিজ্ঞেস করবে, তখন ?"

অলোক চেয়ারে বসে পড়ে।—

"নাও চল—শোবে চল—আমি সত্যি আর জ্বালাব না।"

অলোক উঠতে চায় না—টেবিলের উপর মাথা রেখে বসে থাকে

হঠাৎ রাঙাদি' চেয়ারের পাশে দাড়িয়ে দু'হাতে তার মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। অলোক জোর করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায়, তার হাতখানা লেগে গেল রাঙাদি'র গালে। অলোক অপ্রতিভভাবে বলে উঠলো—"ছেড়ে দিন"—

আঘাত বেশ জোরেই লেগেছে অলোকের হাতের কন্‌কনে ভাব তখনও মিলায়নি।—রাঙাদি' বললেন—"না কিছুতেই ছাড়বো না, যত খুসি তুমি মার, আমায় একেবারে মেরে ফেল।"

শেষের দিকে রাঙাদি'র কথাগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। অলোক মনে করে আঘাতটা খুব বেশী রকম লেগেছে—।

দমকা বাতাসে জানালা খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা বাতাসে মেতে উঠলো—।

"ছাড়ুন, আলোটা নিভে যাবে—যে—"

"যাক।"

অলোক নিরুপায় হয়ে চুপ্ করে থাকে—।

"ওঠো—বিছানায় চল—"

"আপনি আগে শুতে যান"

"তুমি শোও পরে যাবো—"

অলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালো—।

"শোন?"

বলুন

"এ-দিকে চাও"

"না"

"কেন"

অলোক চুপ করে মুখ ফিরিয়ে থাকে। রাঙাদি'র অঙ্গে একমাত্র সায়া ভিন্ন অন্য সব কিছু স্থানচ্যুত হয়েছে - এলায়িত কেশ বাতাসের স্পর্শে, থেমে থেমে নেচে উঠছে।

"কই শুললেনা"

"আপনি যান"

"যাচ্ছি যাচ্ছি"

রাঙাদি' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"দাড়াও বিছানাটা ঠিক করে দিই —"

"নাও শুয়ে পড়, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, সত্যিই আর জ্বালাব না।"

অলোক শোয় না চুপ করে বিছানায় বসে থাকে।

রাঙাদি' উচ্ছ্বাসিত হাসির সঙ্গে বলে ওঠেন—"খোকার ভূতের ভয় নেই তো?"

অলোক নীরব—হঠাৎ রাঙাদি' এক প্রকার জোর করে, অলোককে শুইয়ে দিয়ে, গালের উপর নিজের গালখানা ঘষে বলে উঠলেন - 'উঃ কি নরম—একেবারে ছেলেমানুষ, দেখি দেখি মুখখানা—"

অলোক সাবধান হবার আগেই, রাঙাদি'র ঠোঁট অলোকের ঠোঁটের সঙ্গে মিশে গেল—।

মুহূর্তের পর রাঙাদি' হেসে উঠলেন—

"মাগো—মুখে কি দুধের গন্ধ,—ঘুমোও খোকা ঘুমোও—।"

মধ্যেকার দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

অনেক বেলায় রাঙাদি'র ডাকে অলোকের ঘুম ভাঙ্গলো—।

"ছুটি বলে সমস্ত দিন ঘুমোবে নাকি,—বেলা যে আটটা বাজে—"

অলোক বিস্মিত হয়ে যায়—রাঙাদি' যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—কাল রাত্রে সে কি স্বপ্ন দেখেছে—!

"নাও চোখে মুখে জল দাও—বেলা করে উঠলে সহজে ঘুম ছাড়তে চায় না, মুখ ধোও চা আনাচ্ছি" -

টিপয়ের উপর চা, জলখাবার রেখে—রাঙাদি' বলেন—"মেসে বলে পাঠিয়েছি—এ ক'দিন তুমি এখানে খাবে।"

আঁচল থেকে একখানা দশটাকার নোট খুলতে খুলতে রাঙাদি' বললেন—"তোমার তো সাইকেল আছে, একবার বাজারে গিয়ে কিছু ভাল মাছ আর আনাজ,—হ্যাঁ আর দেখ, রেশমি স্থতোর একটা কাটিম এনো তো দাদা—মালাটা ছিঁড়ে গেছে, বুড়োকে বলে বলে হদ্দ হলাম।"

সদ্য-স্নাতা গরদ পরিহিতা রাঙাদি'র দিকে অলোক চেয়ে থাকে।

৮

ঠং-খন্ খন্ খন্। পাঞ্জাবী মজুরেরা রেল বহন করছে। এ কাজে তাদের জুড়ি পাওয়া ভার। অন্য প্রদেশের দশ জনে যাতে হিমসিম খায়, ওরা তা' অনায়াসে করে চার জনে। সব চেয়ে বড় গুণ, কাযের বেলায় এরা ফাঁকি দেয় না—উৎকট স্থরে ও স্বরে, উদ্ভট ছড়া আওড়ে-কাজ করে যায়। মজুরীও অন্য মজুরদের বহু গুণ বেশী পায়।

পূর্ণিয়া জংশন থেকে কৃত্যানন্দপুর পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই প্রস্তুত, তাই রেলপথ সুরু হয়েছে। রেল বহনকারী খোলাগাড়ী আছে সামনের দিকে, তারপর শাল সেগুণের মোটা মোটা তক্তার 'ট্রাক্'—যন্ত্রপাতির ওয়াগন—ডাক্তার খানা, জলের গাড়ী, 'গার্ডভ্যান,' সবশেষে 'এঞ্জিন। রেল পাতার সময় 'গার্ডকে' থাকতে হয় একেবারে সামনের মাথায়—অর্থাৎ যেখানে নূতন 'রেল' স্লিপারের সঙ্গে আঁটা হচ্ছে সেখানে। গার্ডের পতাকা নির্দ্দেশে ড্রাইভার ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় ওয়ার্কিং ট্রেনখানাকে।

সমস্ত স্থানটা কথাবার্ত্তা, হাঁক ডাক, রেল ফেলা—নাট বল্টু আঁটার শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে—পি, ডাবল্যিউ, আই, বেরী, গোল মুখে মোটা লম্বা চুরুট গুঁজে ছড়ি হাতে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বুলডগের মত থ্যাবড়া মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে অকথ্য গালাগালি-মিশ্রিত, য়্যাংলো-বেঙ্গলী—হিন্দি। শান্ত ভদ্রভাবে একাজ চালানো মুস্কিল—মজুর মিস্ত্রীর দল সৌজন্যের ধার ধারে না।

বেরি পাকা লোক—আব্দুলপুর-নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-রুহিয়ার কাজ খতম করে এসেছে, পূর্ণিয়া-মুরলীগঞ্জে, হয় তো এখানকার কাজ শেষ করে চলে যাবে—কালুখালি-ভাটিয়াপাড়ায়।

বিকট বংশীধ্বনির পর—ধীরে ধীরে গাড়ীখানা একটু এগিয়ে গেল। কাজ বেশ দ্রুত গতিতেই চলেছে—সৌরা নদীর সেতু পর্য্যন্ত রেল বিছাতে, মাত্র দুটি দিন লেগেছে। রেলওয়ে ব্রীজের পাশেই জেলাবোর্ডের পুরাতন সেতু—সেখানে জমেছে স্নানার্থীর ভীড়। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, কৌতুহল-নেত্রে দেখছে, রেল কর্ম্মচারীদের অদ্ভুত কাজ।

'ইয়াসিন্' ড্রাইভার বার কয়েক হুইসেল দিয়ে ইঞ্জিনের ষ্টিম খানিকটা ছেড়ে দিল। বাষ্প নিষ্কাসনের সঙ্গে বিকট আওয়াজে, বহু অবগুণ্ঠিতা গুণ্ঠন মুক্ত করে, সে'দিকে চাইল। ইয়াসিন বলে ওঠে—

"ইঃ এক ডরজন পিয়ারী লাইলী মাইরী"—।

ফায়ারম্যান ইঞ্জিনের হাতল ধরে ঝুলে পড়ে চিৎকার করে—

"রেতে এসোগো বন্ধু, বিস্তারা বিছিয়ে রাখবো"

সচকিতে মহিলার দল বস্ত্র-আবরণ টেনে দিয়ে—বিপরীত মুখে পথ ধরে। ইয়াসিন থাপ্পড় কষিয়ে দেয়, ফায়ার ম্যানকে—

"দূর শালা বে-আক্কিল, সব ভেগিয়ে দিলি কেনে?"

ফায়ারম্যান গান ধরে

"ও হামারা জানকা উপর জান"।

রমণীদের পদ চালনা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়—।

ফায়ারম্যান জিজ্ঞাসা করে- "আজ খানাপিনার ছুটি হবে কখন চাচা?"

ইয়াসিন জবাব দেয়—

"হারামী বেরি তিন দল কুলি লিয়ে কাজ চেলিয়েছে। আজ আর ফুরসুৎ মিলবে না রে।"

"তাই নাকি?"

"তুই শালা বেকুফ জানবার আছিস, অতক্ষণ কায চালাতে কোন শালা পারে রে,—দে— দে শালা হুইসিল মার—"

স্যাওরা নদীর সেতু পেরিয়ে গেল এঞ্জিনখানা।

একটা বড় আমগাছ-তলায় টেবিল পেতে, 'বেরি' বসেছে লাঞ্চের জন্য, দূরে দাড়িয়ে আছে টাইম কিপার পার্ব্বতী। বেরির হুকুম—

কাজের সময় টাইম কিপারের কাছে থাকা চাই। পার্ব্বতীর অবস্থা চেন বাঁধা কুকুরের মত।

ওয়ার্ক-মিস্ত্রি দুর্গাদত্ত সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়ে একটা টান মেরেছে, পিছন থেকে সুবোধ ঘোষ ডাকলেন --

"দত্ত—।"

দুর্গাদত্ত হাতের মুঠোয় সিগারেট চেপে নিচু মুখে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে গেল। ঘোষের কতকগুলি অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিয়ে দুর্গা হাতে ফুঁ দিতে দিতে গাল দেয়—। বলে—"ফোস্কা না হলে বাঁচি, ব্যাটা যেমন দেখতে—বুদ্ধিও সেই রকম—কিম্ভুত কিমাকার—!"

দুর্গা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এ'দিকেই আসছেন ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত আর এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার নেপিয়ার।

নেপিয়ার একখানা কাগজে কি সব এঁকে দেখালেন।

নেপিয়ার চলে যেতেই সুবোধ ঘোষ ধরলেন সেনগুপ্তকে।—

কাগজখানা পরীক্ষা করে সুবোধ ঘোষ বল্লেন—"তার চেয়ে—"নর্থ ফেসিং' ভাল হোত।"

সেনগুপ্ত মনে মনে হাসে, সে পাকা লোক, ব্রিজ বিল্ডিং গড়ে তুলতে বড় ওস্তাদ! নেপিয়ারের প্ল্যানখানা নির্ভুল কিন্তু ঘোষের সবেতেই দালালী দেখানো স্বভাব।

"হ্যাঁ, তা'হলে ভালই হয়,—কিন্তু বড় সাহেব—"

ঘোষ বাধা দিয়ে বলে—

"না, না, ওর প্ল্যানেই হোক্।"

দূরে একটা গোলমাল উঠলো,—কি ব্যাপার!

ঘোষ, সেনগুপ্ত, সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

দু'টো ষ্ট্রেচারে দু'জন কুলিকে নিয়ে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে কম্পাউণ্ডার চারুদত্ত—ড্রেসার রমেন্দ্র নন্দন। কম্পাউণ্ডার বলে—"রেল পড়ে দুটো পাঞ্জাবী জখম হয়েছে স্যার"।—সঙ্গে সঙ্গে রমেন হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—রক্তগঙ্গা স্যার—রক্তগঙ্গা, একেবারে চিড়ে চেপ্টা।"

আহত মজুর আর্তনাদ করে ওঠে—

"জান গিয়া, মেরা জান গিয়া।" ঘোষ আচ্ছাদন একটু তুলেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন—। ষ্ট্রেচার ভিজে উঠেছে রক্তে—। রুমালে মুখ মুছতে "মুছতে সুবোধ ঘোষ বলেন—'এখানে জল পাওয়া যাবে সেনগুপ্ত?"

স্বরে কেমন একটা ব্যাকুলতা। সেনগুপ্ত ছোটে জলের খোঁজে।

ঘোষের কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।

"উঃ কত দেরী করছে সেনগুপ্ত।"

কুলিদের একটা লোটায় জল নিয়ে ছুটে আসে সেনগুপ্ত।

মাথা ধুয়ে খানিকটা পান করে, অনেকটা সুস্থ বোধ করেন সুবোধ ঘোষ।

"তুমি দেখনি বোধ হয়?"

সেনগুপ্ত মাথা দোল্যালো—

"না দেখে ভালই করেছ, দেখলে আর দাড়াতে হোত না, আমিই কেমন ধারা হয়ে গিয়েছিলাম।"

সেনগুপ্তও দেখেছে, তবু এই মিথ্যাভাষণ—উপরিওয়ালার চেয়ে দৃঢ়চেতা প্রতিপন্ন হওয়াও অন্যায়। সুবোধ ঘোষ চলে গেলেন।

"কি রকম কাজ চলছে দেখছেন তো?"

বেরি না হয়ে, অন্য কেউ থাকলে দেখতেন, এ কাজ উঠতো কম করেও তিন দিনে।

"কৃত্যানন্দপুর বোধ হয় দশ দিনে 'রিচ' করবে ?"

"তা' যেতে পারে—তবে মধ্যের ব্রিজটা এখনো 'ইন্‌কমপ্লিট্' ।"

"হাঁ, ওটা একটা মস্ত বাধা ।"

বিরাট ভুঁড়ির উপরকার গ্যালিসে একখানা বেত গুঁজে, হেলে দুলে বেরি এগিয়ে আসছে,—হরবল্লভলাল এগিয়ে যায় ।

বেরির অনুপস্থিতির সুযোগে সবাই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল—এখন আবার সুরু হোল—হাঁক্ ডাক্ হট্টগোল—।

৯

"—আমি শিল্পী। আমার মায়াদণ্ড-স্পর্শে—আমি পারি ঊষর মরুর বুকে ফুটিয়ে তুলতে, ছোট্ট একটুখানি ছায়াচ্ছন্ন মরুদ্যান। স্নেহ, প্রীতি, শান্তির আবেষ্টনে, আমি পারি নিমেষে নামাতে রুদ্র রোষ-ক্ষুব্ধ-বৈশাখের তাণ্ডব-নর্ত্তন। ধ্বংস, সৃষ্টি,—আমার কল্পনা, আমার বিলাস, আমার খুসি, আমার খেয়াল—। আমি শিল্পী, আমি স্রষ্টা—।"

অপূর্ব্ব চৌধুরী—তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে—'কালের সঙ্কেত' নামীয় পাণ্ডুলিপির পাতায়।

"না—না—এ হতে পারে না, এ অসম্ভব"। সমস্ত পাতাখানা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে রক্তরাঙা রেখায়, রেখায়।

অপূর্ব্ব আপন মনে বলে—"শিল্পী—তুমি অক্ষম তুমি দুর্ব্বল। প্রাচীন দুনিয়ার মামুলী ধারা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা তোমার এতটুকুও নেই।"

অপূর্ব্ব হেসে ওঠে—।

"মাটীর বুকে থেকে সব সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু পারিনা কেবল হারাণোকে ফিরিয়ে আনতে, আর পারিনা স্মৃতিকে মুছে ফেলতে—।"

পরক্ষণে বেদনাতুর কণ্ঠে—অপূর্ব্ব জিজ্ঞেস করে—

"আচ্ছা, যারা যায় তারা স্মৃতিকে রেখে যায় কেন?"

নিঃশব্দে কয়েক মিনিট কেটে গেল—।

"নাঃ আজ আর হবে না"

টেবিলে ফ্রেমে আঁটা ছোট্ট ফটোখানিকে অপূর্ব্ব হাতে তুলে নেয়—

"রচনা স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল 'কল্পনা'। তুমি যদি ঠিক এমনি সময়ে সামনে এসে দাড়াতে—তবে হয়তো কল্পনার সূত্র এমন ভাবে ছিন্ন হতো না 'কল্পনা'। আজ তুমি নির্ব্বাক—রচনাও স্তব্ধ, আমি কি করবো বল?"

সিগারেটে কয়েকটি টান দিয়ে—ছোট্ট বোতলটি আলোয় ধরে হো, হো, করে হেসে উঠলো অপূর্ব্ব—

"এদিকে তুমি নিঃস্ব ফতুর,—ওদিকে কল্পনার অসহযোগ—চমৎকার যোগাযোগ তো?"

অপূর্ব্ব উঠে দাড়ালো.—দেওয়াল ঘড়িতে ঠং করে একটা শব্দ হোল। একটা বেজে গেল—।

টেবিলের উপর দু' হাত রেখে—ফটোর দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব বলে—

"হাসছ যে—? কেবল তোমার হাসি,—কিন্তু আমি হাসতে পারিনা কল্পনা। জানো চার বৎসর হাসিনি। মনে করছ মিথ্যা বলছি, কিন্তু তুমি তো জানো, মিথ্যা আমি বলি না কোন দিন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সময় সময় হাসি, কিন্তু সেতো হাসি নয়, সে যে

কান্নার রূপান্তর কল্পনা। হাসিতে প্রাণ থাকে, হাসি মানুষকে প্রাণময় করে তোলে—সেই হাসি আমার, তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছ।"

—"তবুও হাসছ!— ওঃ তোমার কথা ভুলে গেছি তাই?"

অপূর্ব্ব আবার হেসে ওঠে।

"আচ্ছা, যাচ্ছি, যাচ্ছি, কিন্তু সময়ে খাওয়া শোওয়া, আমার কোনদিনই ছিল না—আজো নেই।"

অতি ধীর পদক্ষেপে অপূর্ব্ব প্রবেশ করলো পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে, বস্ত্রাঞ্চলে নিদ্রিতা এক নারী। সম্মুখে তার আসন পাতা চারিদিকে সাজানো থালা বাটী গ্লাস।

অপূর্ব্ব নিদ্রিতার প্রতি চেয়ে থাকে—

সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ, কিন্তু কত তফাৎ। সে ছিল কল্পনা, আর এ মানসী।

"মানু!"

অপ্রতিভ মানসী বলে—"অনেকক্ষণ ধরে ডাকছ বুঝি?"

"না তো।"

"তবে—?"

"তবে কি?"

মানসী অবাক হয়ে থাকে,—বলে—"রাগ করনি তো?"—

"রাগ? কেন বলতো?"—অপূর্ব্ব—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

"হঠাৎ কখন যে ঘুমিয়ে গেছি একটুও হুঁস নেই।"

মানসীর স্বরে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

"ঘুমিয়ে পড়লে কারুরই হুঁস থাকে না মানু।"

মানসী বলে—"খাবে তো ?"

"দাও"

অপুর্ব্ব খেতে খেতে হঠাৎ বলে—"আচ্ছা মান্নু, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে—?"

"বল।"

"রোজ তুমি খাও ?"

"হ্যাঁ—"

"সত্যি বলছ ?"

মানসী চুপ করে থাকে—।

"ছিঃ, এ তোমার অন্যায়। তুমি তো জানো, আমার কিছু মনে থাকেনা, মাতালের উপর কি অভিমান সাজে—!"

"তুমি মাতাল ?"

"আশ্চর্য্য হচ্ছ, রোজ একটি বোতল না হলে যার চলে না, সে নিঃসন্দেহে মাতাল নয়'তো কি ?"

মানসী এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে প্রতিবাদের সুরে বলে—

"কক্‌খনও নয়, তুমি মদ খাও কিন্তু তা নও'। মাতাল শব্দ দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করতেও যেন তার বাধে—।

অপূর্ব্ব মানসীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে—

"তোমার আবিষ্কারটিতো বেশ অদ্ভুত! মদে চুর হই অথচ মাতাল নই! এত রাত্রে খেতে বসার সঙ্গেও নিশ্চয় কোন অভিনবত্বের যোগ আছে—কি বল ?"

"কথা থাক এখন খাও।"

খাচ্ছি, কিন্তু কতকগুলো কথা আমার জানবার ইচ্ছা হয়।

"বল।"

"বহরমপুরের প্রফেসারী ছাড়লাম কেন জানো?"

"জানি—"

"কেন"

"সেখানকার ভদ্রলোকেরা, তোমার উপর অবিচার করেছেন।"

"অবিচার!"

"হ্যাঁ, তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা ভদ্রতা নয়।" কলেজের বাইরে তুমি কি কর না কর—"

অপূর্ব্ব বাধা দেয়—"বাঃ তাঁদের বংশধরদের সাবধান করবেন না তা' বলে?"

"সাবধান করার কোন প্রশ্নই আসে না।"

"কেন?"

ছাত্রেরা তোমায় ভালবাসতো, ভক্তি করতো, তোমার মদের জন্যে নয় নিশ্চয়ই?"

"তা অবশ্য নয়—।"

"তাই আমার মতে, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ যা করেছেন, সবই অবিচার। মানুষ, মানুষের বাইরে থেকে যা দেখে,—সব জানি বলে, যা বিচার করে, প্রায়ই দেখা যায়, তার সবটুকুই মিথ্যা।"

কথাটা বলে ফেলেই—মানসী সঙ্কুচিতা হয়ে ওঠে—।

অপূর্ব্ব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—

"মানুষের সম্বন্ধে কি বলছিলে বলতো?"

মৃদু হাস্যে মানসী জবাব দেয়—

"তোমারই বইয়ের ভাষা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অপূর্ব্ব বলে—

"তুমি আবার কলেজে ভর্ত্তি হও মানসী।"

"না।"

অপূর্ব্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে আহার শেষ করে উঠে গেল।...

* * *

"নিচে কেন?"

"ঠাণ্ডায় শুতে বেশ লাগে যে—"

"তা হোক্, এখানে এসো।"

না, বেশ আছি—।"

"খুব ঘুম এসেছে বুঝি?"

"কেন?"

"এমনি—একটু গল্প করতে ইচ্ছে করছে।" মানসী, শয্যার এক পার্শ্বে ক্ষীণ দেহটী যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করে, শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলো,—মানসী বলে—"কি বলবে বল?"

অপূর্ব্ব চমকে ওঠে—"না থাক্ বড্ড ঘুম আসছে।"

অপূর্ব্বর মনে পড়ে অনেক কথা—। কত বিনিদ্র রজনী তারা গল্প করে কাটিয়েছে,—কত উৎসাহ ছিল তার গল্প করার মাঝে, 'কল্পনার' সঙ্গে সমস্ত কল্পনা মুছে গেছে! মুদিত-নেত্রে অপূর্ব্ব নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার মীমাংসায় মেতে ওঠে—।

অবিচার, অত্যন্ত অবিচার করছে সে—মানসীর ত্যাগ শ্রদ্ধার প্রতিদানে—। না অসম্ভব—অসম্ভব, মানসী,—শুধুই মানসী—!

অপূর্ব্ব উঠে ব'সে খুব আস্তে ডাকে—

"মানু,"

কোন সাড়া আসে না—। অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে অপর কক্ষে চলে যায়।

"মানসীকে আমার হাতে দিয়ে, তুমি ভুল করেছ কল্পনা। সত্যি, আমার দুঃখ হয়, তবু কি করবো বল—আমি সৃষ্টি করতে পারি নূতন চরিত্র কিন্তু নিজের মনকে ভেঙ্গে, নূতন করে গড়্‌তে পারি না যে।"

অপূর্ব্ব সেতার বাজিয়ে গাইতে আরম্ভ করলে অতি ধীর কণ্ঠে, যেন সে কাণে কাণে কাউকে গান শোনাচ্ছে—

"জাগো দুর্গম-যাত্রী
দুঃখের অভিসারে
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেম মন্দির দ্বারে।"

মানসী তন্ময় হয়ে গান শোনে—তার মনে হয়, শুধু একটি রাত্রি নয় হয়তো অনন্ত রাত্রি তাকে এ ভাবে কাটাতে হবে। হোক্ ক্ষতি নেই—আক্ষেপ নেই—অভিযোগ নেই। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর শয্যাপার্শ্বে সে কথা দিয়েছে, তার মর্য্যাদা সে রাখবে। হয়তো দীর্ঘ নৈরাশ্যের ইতিহাস ভিন্ন তার জীবনে অন্য কিছু নেই—তা হোক্ তবু সে কর্ত্তব্য করে যাবে সারা জন্ম ভোর কর্ত্তব্যই হবে তার তপস্যা, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা।

রেল কলোনীতে নূতন বাসা বেঁধেছে—অপূর্ব্ব আর মানসী। ছোট্ট কোয়ার্টারটীর মার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতায়, অনেকের মনে জাগে অসূয়া, অনেকে অন্তরালে অহেতুক শ্লেষে রসনাকে কলুষিত করে ফেলে—"খাসা

আছে এরা—এক সঙ্গে বাজারে যাওয়া,—বেড়াতে যাওয়া, খাওয়া—
—খাসা চকা আর চকি? আর আমাদের! দশ মাস যেতে না যেতে· ·

সত্যই অপূর্ব্ব এই সংসার—বিচিত্র এই অপূর্ব্ব আর মানসী।

১০

দ্বি-প্রহর।

চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালুকা প্রান্তর।—প্রতিটি নিঃশ্বাসে জাগে উষ্ণতার অনুভূতি।

একটা বাবলা গাছের তলায় অলোক বসে আছে। দূরে একটা ঘুঘু ডেকে উঠলো—ঘুঘ্-ঘু-ঘুউ।

অলোকের এই ডাকটা খুব ভাল লাগে। মনে পড়ে কতদিনের হারাণো স্মৃতি!—তাদের অতবড় সংসার, কত সব লোকজন, শিশু যুবক বালকবালিকা—কোথায় সব ছড়িয়ে গেল। আজ তারা সব ছত্রভঙ্গ!

নদীর ভাঙ্গনে—একদিকে ধ্বংস, অন্যপারে সৃষ্টি। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ জলস্রোতে ধ্বসে পড়ে কত বাড়ী গ্রাম, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় লোকালয় জনপদ,—কিন্তু অপর তীরে, বালুচরে চলে তখন,—পত্তনের অভি-যান। কিন্তু তাদের এই ভাঙ্গনের সংসার—হয়তো আর গড়ে উঠবে না।

মনে পড়ে—দেশের বাড়ীর কথা—সম্মুখে বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ, অঙ্গনের মাঝে, দিদির রোপিত সেই শিউলি গাছ, কি ফুলই না ফুটতো তাতে!

—একবার পূজোর সময় এক কাণ্ড ঘটেছিল। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ-প্রায়, অথচ পুরোহিত ষষ্ঠী ঘোষালের দেখা নেই।

মল্লিক বাড়ীর বোমের আওয়াজের পর, বাবা লোক পাঠালেন পুরোহিতের খোঁজে। পুরোহিতের সঙ্গে বাবার তর্ক বিতর্ক হতে লাগলো। হঠাৎ দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ বলে উঠলো—"পুরোহিত কারুর বাবার ভৃত্য নয় হে রায়, বুঝেছ ?"

—তারপর ঘটলো এক বিপর্য্যয়। প্রহার-জর্জ্জরিত ঘোষাল তখন হতবাক্। বুড়ো ডাক্তার দাদুমণি না থাকলে, হয়তো ঘোষালের অবস্থা চরমে উঠতো। ব্রাহ্মণ পৈতা ছিন্নভিন্ন করে, অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল।

—আর একবার পূজোর সময় বুলিদি' মারা গেল। বেশ মনে পড়ে, বাইরে বাজছে আরতির বাজনা, ভিতরে দিদিকে তখন নামানো হচ্ছে খাট থেকে।

দাদা,—দাদা পড়তেন বহরমপুরে। পূজার সময় বাড়ীতে এলে, কি উল্লাসই না হোত তাদের। দাদার মত অমন সুপুরুষ, বড় একটা দেখা যায় না—। অলোকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—। উঃ' কি ভীষণ চেহারা হয়েছিল তাঁর রোগে ভুগে ভুগে—যেন একখানা অর্দ্ধদগ্ধ রুগ্ন মৃতদেহ।

স্বপ্ন—সব যেন স্বপ্ন। একটা শব্দে অলোকের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। একটু দূরে পুণিয়া বিড়ি ধরাচ্ছে।

"রাম রাম বাপুজি !"

"রাম রাম।"

পুণিয়ার চেহারা খুব শ্রীহীন হয়ে উঠেছে,—চোখ কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে,—চোয়ালের হাড় যেন চামড়া ভেদ করে ঠেলে উঠতে চায়।

"তোমার কি অসুখ করেছে ?"

"নেহিতো !"

কিছুক্ষণ পর, আস্তে আস্তে পুণিয়া বলে অনেক কথা। বাড়ীতে তার এতটুকু 'এক্তিয়ার' নেই। তার 'বহু', তার মায়ী, বহিন, এখন রঘুয়ার কথায় ওঠা বসা করে।

"রঘুয়াকে পনছাবেন—সেই মস্ত জোয়ান ঠিক পাহালবানের মত লোকটা ? তার চাচাতো ভাই"।

সব সে সহ্য করতে পারে, কিন্তু 'বহু' যখন রঘুয়ার সঙ্গে হেসে হেসে বাত চিত্ করে, তখন তার খুন বিলকুল শিরে ওঠে—সে বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে। কতবার সে বুঝিয়েছে, মানা করেছে, কিন্তু 'বহু' কিছু মানতে চায় না। রঘুয়া কারবারে খাটছেও খুব তাই তার খাতিরও বহুত্।

অলোক কোন কথা বলে না তবুও পুণিয়ার দুঃখের ইতিহাস—শেষ হতে চায়না। শেষ পর্যন্ত আপন মনে বক্-বক্ করে' চুপ করলো পুণিয়া।

অলোক উঠবার উপক্রম করতেই পুণিয়া নিম্ন স্বরে বলে "বাবুজি—"

অলোক তার দিকে চাইতে পুণিয়া বলে—

—"সেই জড়্টা জোগাড় করে দিজিয়ে না, জনমভোর গোলাম হয়ে থাকবো।"

বিস্মিত অলোক প্রশ্ন করে—"কিসের জড়্ ?"

পুণিয়া তার মুখের দিকে চেয়ে, নিঃসঙ্কোচে বলে— "যাতে জানকীর মন এক্তিয়ারে আনা যায়।"

অলোক বিরক্ত হয়ে একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। ক্ষণকাল পরে শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে —

"সে গাছ তো আমি চিনি না পুণিয়া।

পুণিয়া এতক্ষণ পরম আগ্রহভরে চেয়েছিল অলোকের দিকে—হঠাৎ সে অলোকের দুই পা চেপে ধরলো—

"বাহমন্ দেওতাকে একাঙ্ক করতেই হবে।" অলোকের হাসি পায়—পুণিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেছে—। শনি মঙ্গল বারে, অমাবস্যা তিথিতে, দিগম্বর হয়ে, চোখ বন্ধ করে এক টানে তুলতে হবে—একেবারে অমোঘ অব্যর্থ বশীকরণ।

"পাগলামী করো না, দুনিয়াতে এমন কোন গাছ নেই।" অলোকের ভর্ৎসনা মিশ্রিত সুরে পুণিয়া থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বলে—

"এ তো পুলিন ঘরামী বাতলায়া বাবুজি!" পুলিন ঘরামীর উপর অনেকের অগাধ বিশ্বাস। সময় সময় পুলিনের ভাগ্যে জোটে পায়রা মুরগী নতুন কাপড় নগদ টাকা ইত্যাদি। মজুর মজুরাণীর ভূত ছাড়াতে সে বড় ওস্তাদ—নামজাদা গুণী।

বিরক্ত হয়ে অলোক বলে—

"তাকেই তুলে দিতে বলো।"

হতাশভাবে পুণিয়া জবাব দেয়—

"সেতো বাহমন দেওতা নয় বাবুজী—"!

"আচ্ছা সময় মত তুলে দেব।"

বেচারীর বিশুষ্ক পাণ্ডুর অধর, তার উপর মিনতিভরা চোখের দৃষ্টি,—অলোকের মনে করুণা জাগে।

পুণিয়ার উদ্দীপ্ত আনন্দ নিমেষে নিভে যায়—। লাল সুরকি উড়িয়ে, স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে একটা তেজিয়ান সাদা ঘোড়া।

পুণিয়া বিড়বিড় করে গাল দিতে দিতে সরে পড়ে।— অশ্বারোহী সুবোধ ঘোষ খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

১১

প্রত্যেক নাটকে আপত্তি—সাবিত্রী, চিত্রাঙ্গদা, প্রভৃতির প্রতি দ্বিজেনবাবুর কটাক্ষ। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দিলীপ স্থির করেছে—কয়েকটি নির্ব্বাচিত দৃশ্য যা বেছে দিয়েছেন দ্বিজেনবাবু, সেই সঙ্গে নৃত্যগীত, এই নিয়েই সবুজ সঙ্ঘের সবুজের দল, রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে।

সত্যিই দিলীপ ভয়ানক পরিশ্রম করছে,—বেচারী মনে মনে আপশোষ করে, এ খাটুনির সার্থকতা কোথায়? সে দেখিয়ে দিত দ্বিজেনবাবুকে অভিনয় কাকে বলে—যদি রাণু সাজতো চিত্রাঙ্গদা কিংবা সাবিত্রী—সে নিজে হত অর্জ্জুন অথবা সত্যবান।

দ্বিজেনবাবুর উপর দিলীপ চটে যায়—লেখাপড়া শিখলে কি হবে? মন এখনও সেই পচা মান্ধাতা আমলের সংস্কারের কারায় আবদ্ধ। অভিনয়—অভিনয়, ব্যস—।

রাণুর প্রশংসায় দিলীপ পঞ্চমুখ।

রাণুর মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে সত্যিকার হিরোইনের ইয়ে—অর্থাৎ "পার্টিশ"। একটু নাচ গান শিখলে এ মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা!

রাণুর মা ভাবেন, আহা দিলীপ যদি আগে আসতো, তা'হলে কি ঐ পরীর মত পুঁটি সাবির বরাত এমন হয়—! পুঁটি সাবি দু'বোনই অপরূপ সুন্দরী—

কিন্তু উভয়েই পড়েছে দোজবরে। দিলীপ কথা দিয়েছে—"যেমন করেই হোক রাণুকে সে গড়ে পিঠে মানুষ করে দেবে—"

দুই মেয়ের বিয়েতে বাড়ি জমি বন্ধক দিতে হয়েছে—গায়ের গহনা একটিও নেই সব চেয়ে আপশোষ হয় নূতন অমৃতপাকের বালাজোড়াটার জন্যে—। আহা কত দিনের সাধ ছিল তাঁর, যদিই'বা অনেক কষ্টে তৈরী হোল—ক'দিনইবা ভোগ করলেন তিনি। মাসীমার বাসায় দিলীপের অগাধ অধিকার।

সেদিন হঠাৎ গীতা অসুস্থ হওয়ায় দিলীপ একলাই রওনা হল। রাণুর মা ধমক্ দিয়ে মেয়েকে দুমিনিটে তৈরী করে দিলেন।

মেয়ে যেন কি? একটুও হুঁস থাকেনা—। দিলীপকে লক্ষ্য করে বলেন—

"বুঝলে বাবা সব জিনিষেই চেষ্টা থাকা চাই, তুমি খাটলে কি হবে?"

পথে যেতে যেতে ডলি, শিউলি, মায়া, ইত্যাদির খোঁজ নেওয়া হল, কিন্তু তাদের তখনও খাওয়াই হয় নি। কিছুক্ষণ 'অরগান' বাজিয়ে দিলীপ চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকে—ক্লাবে মাত্র তারা দু'জন। একটু আগে ক্লাবের বেহারা গেছে দিলীপের সিগারেট আনতে।

—"আজ আমরা খুব সকাল সকাল এসেছি না দিলীপদা?"

"হুঁ"

বাইরে থেকে একবার ঘুরে এসেই দিলীপ একখানা বেঞ্চে সটান শুয়ে পড়লো।

"কি হোল?"

"কিছু না— মাথাটা কেমন করছে—"

"যা রোদ, কাল থেকে ছাতা এনো।"

মাথায় রুমাল বেঁধে দিলীপ চুপচাপ শুয়ে থাকে, রাণু নিঃশব্দে একখানা খাতার পাতা উল্টে যায়—যেন সে খুব মন দিয়ে পড়ছে।

"একটু টিপে দেবে?"

রাণু খাতা রেখে উঠে দাড়ালো।

"চলে যাচ্ছ নাকি?"

"আসছি।"

দরজার সামনে দাড়িয়ে রাণু বেশ করে চারিদিক দেখে নিল।

"বেশীক্ষণ টিপতে পারব না কিন্তু—"

রাণুর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠে।

দিলীপ রাণুর একখানা হাত ধরে বলে—

"এই খানে—কাণের পাশে এই শিরাটা, ভাল করে চেপে ধরতো।"

রাণু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেয়।

"কি হোল?"

"কিছু না।"

"তবে?"

"তবে কি?"

"কই টিপে দাও"

"দিচ্ছিলাম তো—"

"বন্ধ করলে কেন"

"আহা ন্যাকা সাজা হচ্ছে, হাত ধরলে যে বড়!"

রাণুর স্বর বেশ একটু রুক্ষ।

দিলীপ অবাক হয়ে বলে—

"হাত ধরলে কি হয়েছে!"

"আহা কিছু জানেন না যেন !"

"সকলের সামনেই তো কতবার ধরেছি—"

"তা হোক—তখনকার কথা আলাদা !"

"আলাদা কেন"

"জানিনা"

দিলীপ কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে হঠাৎ রাণুর থুতনি টিপে দিয়ে বলে

"রাগ হলো নাকি ?"

রাণু একটু দূরে গিয়ে বলে—

"এক্ষুনি চলে যাবো কিন্তু "

"বেশ যাও, মাসীমাকে বলবো তুমি আমাকে ছোট লোক বলেছ।"

রাণু হেসে ফেলে—

"বাঃ বেশতো মিথ্যেবাদী,—তাই বললাম নাকি ?"

"মুখে না বললেও, মানেতো তাই।"

দিলীপের স্বর বেশ গম্ভীর।

"আচ্ছা তুমি একটু বসে থাক, আমি ওদের ডেকে আনি,—"

"মাথা ধরেছে না ?"

"তা হোক—যাবো আর আসবো।"

"যেতে হবেনা"

"বেশ মজাতো, যেতেও দেবেনা আবার কাছে থাকলে মুখ ভার, কি হয়েছে খুলেই বলনা ?"

রাণু ক্ষণকাল ইতঃস্তত করে বলে—

"অমন করে হাত ধরে নাকি ? কেউ দেখলে কি মনে করতো ?"

"কি আবার মনে করতো !"

"অনেক—অনেক,যা-তা—।"

রাণুর মুখ চোখের ভাব দেখে দিলীপ হেসে ফেলে—।

মালী সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো।

সিগারেট ধরিয়ে দিলীপ বলে

"এ'সব এখন থাক, পেতলের ফুলদানিগুলো বেশ করে মেজে আন।"

উড়ে মালী ফুলদানী নিয়ে চলে গেল।

ওঃ বাবা পাকা নেশাখোর,—আচ্ছা, নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করতো।

হঠাৎ রাণু দিলীপের সিগারেটটা ফস্ করে ফেলে দিয়ে হি হি করে হেসে উঠলো।

"ফেলে দিলে যে—?"

"কি বিচ্ছিরি গন্ধ— মাগো"

দিলীপ রাণুর হাত চেপে ধরে বলে

"মজা দেখাবো,—"

"দেখাও না—"

"সিগারেট ফেলে দিলে কেন?"

রাগের ভাণ করে রাণু বেশ জোরের সঙ্গে বলে—

"বেশ করেছি—"

"বেশ করেছি"—?

রাণুর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে—চাপা স্বরে অনুনয় ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলে—

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি—"

দরজার বাইরে অনেকগুলি কণ্ঠে গেয়ে উঠলো—

"মোদের গরব মোদের আশা—"

রাণুকে ছেড়ে দিয়ে দিলীপ তাড়াতাড়ি অরগ্যানে গৎ ধরলো—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন—"

রাণু আস্তে আস্তে বলে—"প্রলয় নাচনই এতক্ষণ হচ্ছিল যে—"

অরগ্যান থেমে যায়,— রাণু ব্যস্ত হয়ে ওঠে—

"আঃ থামালে কেন, বাজিয়ে যাওনা।"

দিলীপ বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ডান হাতের আঙ্গুল কয়টাকে, দ্রুত নৃত্যছন্দে চালিয়ে যায়, বাদ্যযন্ত্রের কড়ি – কোমলের উপর দিয়ে।—রাণু ততক্ষণে বেশ একটু দূরের চেয়ার অধিকার করে ক্ষুদ্র খাতাটির প্রতি তন্ময়-চিত্তে চেয়ে থাকে।

গোলমাল করতে করতে মেয়েরা প্রবেশ করলো।

বিনতা জিজ্ঞাসা করে—

"শেফালী চলে গেল কেন দিলীপদা' ?"

"কই সে তো আসেনি।"

"বাঃ সে যে তোমাদের সঙ্গেই এসেছিল— ।"

দিলীপ রাণুর দিকে চেয়ে থাকে, রাণুর মুখ নিষ্প্রভ বিবর্ণ।

১২

সবেমাত্র পূর্ব্ব দিগন্তে অরুণ-আভা ধরেছে। সমস্ত রেলকলোনী নিস্তব্ধ নিঝুম। কেবল মাঝে মাঝে ভেসে আসে সদ্য-জাগরিত বিহগের বিভিন্ন স্বরলহরী।

দ্বিজেন্দ্রলাল চলেছেন প্রাতঃভ্রমণে। ব্রাহ্মমুহূর্তে কয়েক মাইল পথ চলা তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কলোনীর প্রান্ত-সীমায় দ্বিজেনবাবু থমকে দাড়ালেন—: কিসের শব্দ—এমন সময় এখানে মাটি কাটে কে? শব্দ লক্ষ্য করে দ্বিজেনবাবু এগিয়ে চললেন।

"ঐ যা হয়েছে ওতেই হবে—শেয়ালে না তুললেই হোল।"

রমণীবাবুর কণ্ঠস্বরে দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুহল বেড়ে যায়।

"আরে দ্বিজুভায়া যে—, আর দুর্ভোগের কথা বল কেন ভাই। রাত দুপুরে তোমার বৌঠান এই কাণ্ড করে বসলেন, সকাল বেলাতেই নিয়ে এলাম, আবার কাজ কর্ম্ম আছে তো। দে বাপধন আরোও দু'কোদাল মাটী চাপা দিয়ে দে।"

ঠিকাদারের কুলী কাজ শেষে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল

"তারপর দ্বিজেনভায়া, সংসার একটা নরক বিশেষ—কি বল ভায়া? চলনা ভায়া ঐ বিলে একটা ডুব মেরে আসি।"

পথ চলতে চলতে রমণীবাবু বলে উঠলেন—

"দেখ ভায়া, ছেলেটা থাকলে একটা কেউ কিছু হোত। নাক চোখের এমন গড়ন বড় দেখা যায় না।" দ্বিজেনবাবু নীরব।

"ওর দৌলতেই করে খাচ্ছি ভায়া! সেই দিনের কথা মনে আছে ত, বড়বাবু কি রকম করে উঠেছিলেন, ভাগ্যে এ এসেছিল তাই রক্ষে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—সখেদে রমণীবাবু বলে উঠলেন—

"এসেছিল উদ্ধার করতে,—উদ্ধার করে চলে গেল"।

রমণীবাবু আফিসের চাকুরী হারিয়ে হয়েছেন—ক্লাব সুপারভাইজার-নেপিয়ার সাহেবের নূতন সৃষ্টি।

দ্বিজেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

"বড় সাহেবকে কি করে ধরেছিলেন ? বলুন তো ?"

শোননি বুঝি ? বাসায় গিন্নিকে বললাম "সন্ধ্যের সময় একটু ফিট কাট হয়ে থাকবে। মেয়ে গুলোকে সাবান মাখিয়ে আচ্ছা করে চান করালাম। রমণী বাবু হঠাৎ হেসে উঠলেন।"

"বুঝলে ভায়া, তোমার বৌঠান ভেবেছে, আমি সারকেসে নিয়ে যাবো। সন্ধ্যে ঠিক হয় হয়, এমন সময় বড় সাহেবের বাংলোয় দল বল নিয়ে হাজির হলাম। সাহেব তখন ছিলেন না। গিন্নি বল্লেন, "সারকেস যে আরম্ভ হোল, বিগুল বাজছে—।

"দিলাম দু'কথা শুনিয়ে,—"

রমণী বাবু এমন ভাবে কথা গুলি বল্লেন যেন সত্যই অপরাধিনী তাঁর সামনেই রয়েছেন।

"মেয়ে গুলো বায়না ধরলো চলনা বাবা সারকেস দেখবো।"—দিলাম বেশ করে দু' এক ঘা। হঠাৎ চেয়ে দেখি স্বয়ং বড় সাহেব! তাড়াতাড়ি গিন্নি আর মেয়েদের বললাম—সাহেব এলেই পা চেপে ধরবি। ধমক—ধামকে ভয় করিস না। তারপর মকসো করা কাগজখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, জানো ভায়া সমস্ত দিন ধরে মুখস্ত করেও কাজের সময় সব গুলিয়ে ফেললাম। আর এনট্রেন্স দিয়েছি কি আজ! আফিসের মামুলী কথা ভিন্ন সব ভুলে মেরে দিয়েছি।

সাহেব থমকে দাড়ালেন, ওরা সবাই গেল ভড়কে। আমি এগিয়ে গিয়ে স্যালুট্ ভুলে নমস্কার করে ফেললাম। সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কি ব্যাপার—কি চাও ?" গিন্নি তখন ভয়ে সাত হাত ঘোমটা টেনে দূরে গিয়ে দাড়িয়েছে।

বললাম—"এদিকে এসো না, গুষ্টির পিণ্ডির জোগাড় করতে হবে

তো।" গিন্নিকে টেনে এনে তাঁর অবস্থা দেখিয়ে বললাম 'ফুল লোড' যে কোন মুহূর্ত্তে কিছু ঘটতে পারে,—'ইওর অনার' একটা বিহিত করুন।

সাহেব মুখ ফিরিয়ে একটু দূরে গিয়ে অবাক হয়ে কি যেন আমায় জিজ্ঞাস করলেন, কি বল্‌লো ভায়া, মাথামুণ্ডু একবর্ণও বুঝতে পারলাম না, কোন রকমে বললাম—"আমি তোমার "মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট্‌ ওল্ড সারভেণ্ট" কিন্তু চাক্‌রী গিয়েছে কি করে এ-দের খাওয়াবো তাই তুমি বল, এই আমার "হাম্বল প্রেয়ার।"

আমার ইংরেজি সাহেব বুঝতে না পেরে বলেন—"মালুম হোটা নেই"—আমিও বাঁচলাম কোন রকমে হিন্দিতে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিলাম মেয়েদের একে একে ওয়ান টু থ্রি করে গুণে দেখালাম, শেষে আবার ধরলাম ইংরেজী—মানেটা হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করবো তাই এদের তোমার কাছে রেখে যাবো, যেহেতু "নো আদার অল্টার নেটিব,—গতিরং নাস্তি।"

সাহেব একে একে জিজ্ঞাসা করলেন কি কাজ করতাম ইত্যাদি শেষে পকেট থেকে একখানা নোট নিয়ে 'বিস্তিকে' দিলেন। হারামজাদী কি নিতে চায়, ভয়েই মরে, সাহেব যেন বাঘ ভালুক। বুঝলে দ্বিজেন ভায়া, বাসায় এসে দেখি কড়কড়ে একশ টাকার নোট—তার পর দেখতেই পাচ্ছ—ক্লাবের 'সুপারভাইজার' হয়ে দিব্যি আরামে আছি।

বিলের কাছ বরাবর এসে দ্বিজেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "দাড়াবে নাকি?"

"না, আমার দেরী হবে ভায়া—প্রাতঃকৃত্য, স্নান শেষ করে ছুটবো বাজারে। বাসায় ঢুকলে কি আর রক্ষে আছে—সবাই মিলে চিঁ চিঁ করবে—"বাবা ক্ষিদে পেয়েছে—বাবার যেন জমিদারী আছে

"বাসায় ঢুকতে আর মন চায়না। দু'মাস হাঁড়ী ঠেলছি—আবার মাসখানেক চালাতে হবে—রাজরাণী শুয়ে শুয়ে হুকুম চালাবেন, মরি শালা আমি এখন খেটে—।"

১৩

দিলীপ পড়েছে মুস্কিলে। সে'দিন থেকে শেফালী আর ক্লাবে আসে না। "নাঃ, অতটা বাড়াবাড়ি না করলেই চল্‌তো! শেফালী যদি কাউকে বলে দেয়? এ যদি মামাবাবু জান্তে পারেন তবে?"

বিপদের কল্পনায় দিলীপ শিউরে ওঠে।

দু'বার আই, এ, ফেল্ করে সে হয়েছে সকলের চক্ষুশূল। দাদারা কথা বলেন না, বৌদিদের ঠাট্টার বিরাম নেই। এখানে জানাজানি হলে সে দাড়াবে কোথায়! চাকরীর চেষ্টায় এসে কি ক্যাসাদেই পড়লো সে। হেনার সঙ্গে মিশে সে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে।—কি ঢং-ই না দেখাতো সে—, অথচ বিয়ের পর একেবারে অন্য মানুষ। বলে কি না "আর একবার পড় দিলীপদা"। অথচ এই হেনাই তার সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ। পড়বার সময় সে পেতো কোথায়, সব সময় কেবল বাধে ফায়ফরমাশ খেটে, দু'টি বৎসর সে নষ্ট করেছে। সমস্ত অন্তর বিষিয়ে ওঠে—

"নাঃ, মেয়েদের ফাঁদে পড়ার মত আর মূর্গামী নেই।"

গীতা আস্তে আস্তে বলে—"একটা কথা বলবো দিলীপদা?"

দিলীপের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে—শেফালী কিছু বলেছে হয়তো, প্রকাশ্যে বলে—"বল না"

"কাউকে বলবে না তো?"

দিলীপ বিরক্ত হয়ে বলে—"বল না"

গীতা কাণে কাণে কি বলে,—দিলীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে "কেন ?"

"তাই বলছি, ওখানে সবাই বলাবলি করছে, শোভনাদি' নাকি বিষ খেয়েছিলো—"

হঠাৎ মায়ের আগমনে, গীতা বেশ জোরে বলে উঠলো—"বেড়াতে যাবে না দিলীপদা ?"

"অন্ধকারে বসে কেন রে,—ওরে লছমন্—একটা আলো দিয়ে যা।"

মায়ের প্রস্থানের পর গীতা বলে—"জানো শোভনাদির কোন দোষ নেই—ডাক্তার গুহ ই ভারী অসভ্য বুঝলে ?"

গীতার ব্যবহারে দিলীপ অবাক হয়ে যায়—কেমন সুন্দরভাবে সে, নিজেকে সামলে নিলে।

"কই বললে না"

"বলবো"—।

দিলীপ মনে করে গীতাকে পাঠাবে সে শেফালীর কাছে। মায়ের ডাকে গীতা চলে গেল। দিলীপ মনে মনে দুর্জ্জয় সংকল্প করে ফেলে—, 'এই ফাঁড়াটা কাটাতে পারলে আর নয়—চুলোয় যাক্ 'সবুজ সঙ্ঘ' – কারুর খপ্পরে সে আর পড়বে না।"

—"মা বল্লেন সকাল সকাল খেয়ে নিতে"—।

"তোর সেটা বুঝিয়ে দেব, আমার একটা কাজ কিন্তু করতে হবে-

"কি বল ?"

শেফালীকে ক্লাবে আন্‌বি, যদি না আসে, তবে বল্‌বি দুপুরে মামীমা ঘুমোলে যেন এখানে আসে,—"

"কেন বলতো—?"

"এমনি, দরকার আছে—"

ক্ষণকাল কি ভেবে গীতা বলে—"হুঁ—তাই এত শেফালী, শেফালী, করা হয় না ?"

"আঃ কি হচ্ছে—!"

গীতা নিম্নস্বরে বলে "মাকে বলবো শেফালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে—?"

"বল্ না, আমিও বলতে জানি,—"

"কি বলবে আমার শুনি—?"

"কি আবার, যা জানতে চেয়েছিলে তাই, বিয়ে না হলেও—" হঠাৎ দিলীপের মুখ চেপে ধরে গীতা বলে—"না—না ওসব কিছু বলো না দিলীপদা"—

"আমার কাজ করে দিবি"—"ঠিক তো"—

"সত্যি বলছি"—

রান্নাঘর থেকে মায়ের আহ্বানে—গীতা ব্যস্তভাবে বলে "এক্ষুনি চল, মা খাবার নিয়ে বসে আছেন যে—"

* * *

"সবাই ভয় করছিল মার কোল থেকে কি করে দিপুকে তুলে নেবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জানো—শ্যামলীর মা নিজেই বল্লেন মিছে রাত করে কি হবে, নিজেই ছেলেকে তুলে দিলেন—। শান্তিদেবীর কথার মধ্যে যেন কান্নার আভাস—। বিভূতিসিংহ উত্তর দিলেন—"শ্যামলীর মায়ের মাথার দোষ একটু আছে, এখন পাগল না হয়ে যান ! আজ আর খাবো না বুঝলে, এদের হ'লে, একটু দুধ পাঠিয়ে দিও।"

শান্তি দেবী ক্ষীণ স্বরে বললেন—"আচ্ছা"—

অন্যদিন হ'লে তিনি উকিলের জেরা করে বসতেন। অনাহারে—থাকার কারণ নিয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটিও চলতো, কিন্তু আজ. আজ সব নিরর্থক। সন্ত-সন্তানহারা জনক-জননীর মর্ম্ম-বেদনা যে কি ভীষণ মর্ম্মন্তুদ, তা' তিনি জানেন—!

"সে থাকলে কত বড় হোত!" দিলীপের চেয়ে মাস কয়েকের ছোট ছিল। ক্ষণকাল তিনি দিলীপের দিকে চেয়ে থাকেন। আবছা ভেসে ওঠে—লালমণি-হাটের ছোট্ট বাংলোখানি চারিদিকে অজস্র ফুলগাছ—ছোট্ট সুঠাম তপু ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে—। সে থাকলে আজ ঠিক এত বড় হোত। দিলীপ বলে,—"আর কিছু নেব না মামীমা; শান্তিদেবী যেন চমকে উঠলেন—

"ক'খানা আর খেলি বাবা , আর দু'খানা নে, দাও না ঠাকুর, তোমার দাদাবাবু আর দিদিমণিকে। দিলীপ অবাক্ হয়ে যায়, এমন মমতামাখা স্বর, সে কোনদিন শোনেনি।

অতৃপ্তির সঙ্গে বাধ্য হয়ে, দিলীপকে আরো কয়েকখানা খেতে হয়।

শান্তিদেবী লক্ষ্য করেন, দিলীপের চিবুকটা ঠিক তপুর মত।—সেবার পূজোর ছুটীতে দেশে ফিরছেন,—সহযাত্রীদের সে কি আদর—"আস্‌বে খোকা আমার কাছে? ছয় মাসের শিশু তুড়ি শুণে খল্ খল্ করে হেসে ওঠে,—গড়িয়ে পড়ে অজস্র লালা।

আহার শেষে গীতা বলে "মা"

"কি মা?"

"দিলীপদা'র কাছে শুয়ে গল্প শুনবো?"

"কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত জাগিস না মা, সময় বড় খারাপ।"

১৪

আজ ক'দিন ধরে স্বামী স্ত্রীর—কথাবার্ত্তা বন্ধ। অপূর্ব্ব সকালে বেরিয়েছে এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই। মাসের শেষ সংসার খরচের একটি পাই, পর্য্যন্ত বাক্সে নেই। যৎসামান্য যা ছিল তাতেই হয়তো এ কয়দিন মানসী অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারতো, কিন্তু বিশেষ দরকারে অপূর্ব্ব সবই নিঃশেষ করে নিয়ে নিয়েছে। ঘরে চাল ডাল তরি-তরকারী কিছু নেই। চুপ করে বসে আছে মানসী। চার বৎসরের মধ্যে অপূর্ব্ব এমন কখনও করেনি। কেন এমন হোল কি হয়েছে অপূর্ব্বর।

—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মানসী উঠে দাড়ালো মাথাটা বেশ করে ধুয়ে বারান্দায় একখানি চেয়ারে—মাথাটা হেলিয়ে দিল। স্নিগ্ধ বাতাস সস্নেহে সিক্ত কেশরাশিকে দোলা দিতে লাগলো এলোমেলো ভাবে। হঠাৎ মানসার সমস্ত চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ডায়েরীখানা কোথায়—সেটার মধ্যে হয়তো সমাধান আছে। টেবিলে ড্রয়ারে কোথাও নেই—অথচ চিরদিন এই ছু'ই স্থানেই পড়ে থাকে সেটা। অবশেষে খাতা মিল্‌লো অপূর্ব্বের 'ট্রাঙ্কের' মধ্যে।—'ডায়েরীর' প্রায় সবটুকুই তার জানা, বেশীর ভাগই, অপূর্ব্ব লিখেই তাকে শুনিয়েছে,—বাকী কেবল এই কয়দিনের।

তাড়াতাড়ি সে পাতা উল্‌টিয়ে চলে অপূর্ব্ব আসবার আগেই তাকে দেখতে হবে সব - এ গোপনতার রহস্য কোথায়, কেন এই অসহযোগ। মানসী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনা। এ কি লিখেছে অপূর্ব্ব! বার বার সে পড়ে যায়,—ডায়েরীর সর্ব্বশেষ পাতাটা।

দুর্ব্বল রুগ্ন দেহের সমস্ত রক্তটুকু নিমেষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো. প্রতিটি লোম কূপে তড়িতের স্পন্দন,—বুকের মাঝে কেমন একটা অব্যক্ত

অবর্ণনীয় ব্যথা। হাত থেকে খাতাখানা খসে পড়্‌লো—পায়ের তলায় মাটি যেন কাঁপছে থর্ থর্ করে। আপন মনে মানসী বলে,—"ওঃ তাই!"

খাতাখানা যথাস্থানে রেখে মানসী উঠে দাড়ালো, পায়ে যেন এতটুকু শক্তি নেই। উপবাসে, অনাহারে সে অভ্যস্ত কিন্তু এতখানি দুর্ব্বলতা কখনও সে অনুভব করেনি। পাগলের মত দু'চোখ বিস্ফারিত করে মানসী বলে,—"তাই—সেদিন সে—?"

মানসী দু'হাতে তার অলকগুচ্ছ টেনে ধরে,—মাথাটার মধ্যে—অসহ্য জ্বালা আর বেদনা।

মানসী আপন মনে ভাবে অনেক কথা, স্বেচ্ছায় সে গ্রহণ করেছে,—এই একান্ত অবাঞ্ছিত জীবন। কিন্তু তার মধ্যেও শান্তনা ছিল,—অপরিসীম্ সহনশীলতার সে যেন পরীক্ষা করছিল। অপূর্ব্ব?—অপূর্ব্বকে তো কোন দিন সে হেয়, হীন জ্ঞান করেনি—বরং তার ছন্নছাড়া জীবনটাকেই সে দেখতো অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে। সেই অপূর্ব্ব তার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনা করে গেল। কিন্তু কেন?

মনে পড়লো চার বৎসর পূর্ব্বেকার একটি রাত্রি!—দুর্য্যোগের রাত্রি,—বাইরে চলেছে প্রকৃতির বিপর্য্যয়, ভিতরে—জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। রোগীণীর দুই পার্শ্বে অপূর্ব্ব আর মানসী। চিকিৎসকেরা জবাব দিয়ে গেছে—"যে কোন মুহুর্ত্তে হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।" গভীর রাত্রে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মিনতি সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। মনে পড়ে, তারা বুঝতেই পারেনি কখন যে নিঃশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেছে কল্পনা। এতদিন তপস্যার মোহে, ত্যাগের মহিমায়—সে সমস্ত কিছু ভুলে ছিল—কিন্তু একি করল অপূর্ব্ব। তার বিশ্বাস—তার শ্রদ্ধা, সমস্ত কিছুকে ভেঙ্গে চুরে দিল সে—!

এতদিন যে কৃচ্ছ্র সাধনাকে, সে তার তপস্যা বলে বরণ করেছিল, আজ নূতন চোখে দেখে, সেটা একটা বিরাট প্রবঞ্চনা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমস্ত জীবন যেন বৈচিত্র্যহীন, আশাহীন, একান্ত এক ঘেয়ে।

মানসী তার শ্রদ্ধা-সিংহাসন থেকে অপূর্ব্বকে জোর করে নামিয়ে দিল। কি দরকার ছিল এই প্রবঞ্চনার ?

সেদিন প্রথমে সে একটু বিস্মিত হয়ে ছিল অপূর্ব্বর প্রণয় নিবেদনের অতিশয্যে, অথচ সে দিন— সে সুরা-পাত্র স্পর্শ করেনি।

মানসী নিজেকে ধিক্কার দেয়।—

কি করে ভুললো সে ? এত বড় অপমান, এতখানি লজ্জার বোঝা কি তাকে সারা জীবন বহন করতে হবে ?

অপূর্ব্ব তঞ্চক, অপূর্ব্ব প্রতারক।—নিশ্চয়ই—তা'নাহলে— সে ক্ষমা-প্রার্থী হত না কল্পনার।

মানসীর বিক্ষুব্ধ আত্মা অন্তরে-অন্তরে গজ্‌রে ওঠে—

কল্পনা—কল্পনা, মানসী—মানসী।—কল্পনা-ভ্রমে মানসীর প্রতি সেই রাত্রির আচরণ, সেই আত্মনিবেদন, কেবল তঞ্চকতা আর প্রতারণা।— ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, মানসীর ললাটের শিরা উপশিরা অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করে ওঠে—আপন মনে বলে—"এ জীবন কি শুধু প্রহসন, কেবল ফাঁকি ?" মানসীর দু'চোখ ছল ছল করে ওঠে।

দু'হাতে বোঝা নিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রবেশ করলো অপূর্ব্ব,— মানসী দেখেও দেখলো না। অপূর্ব্ব জামা, গেঞ্জি খুলে হাত পাখা চালাতে চালাতে আপন মনে বলে—আজ অফিস যাওয়া হলনা, কাজটা মিটলে বাঁচি।

মানসী কক্ষে প্রবেশ করতেই, অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি উঠে—টেবিলের উপর একটা কিছু অনুসন্ধান করতে লাগলো. মানসীর দিকে চাইবার সাহস তার হয় না। মানসী বেরিয়ে যেতে যেতে শোনে, অপূর্ব্ব বল্‌ছে—"এত বেলায় রান্না না করলেও চল্‌বে,—বড় ঠোঙ্গায় খাবার আছে।"

মানসী থম্‌কে দাড়ায়—ওষ্ঠ দংশন করে নিজেকে সামলে নিয়ে—ধীরে ধীরে চলে যায়।—

স্নানের পর—অপূর্ব্ব দেখে, সমস্ত খাবার তারই থালায় সাজিয়ে দিয়েছে মানসী—অপূর্ব্ব নামমাত্র মুখে দিয়ে উঠে পড়লো খিধে তার নেই—সে খেয়ে এসেছে—তবুও মুখে কিছু বলতে পারে না।

মানসী রান্নাঘরে—চুপ করে বসে থাকে.—

"টাকা কোথা থেকে এলো? ধার—ধার করাতো স্বভাব নয়—তা ভিন্ন এখানে তেমন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই"—!

অপূর্ব্ব কাযের অছিলায় বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে,—থালাভরা খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, মানসী কাল থেকে উপবাসী কিন্তু কি বলবে সে—

৯৫

আহ্নিক শেষে অশ্বিনী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু বলবে?"

যমুনা দেবী এক দৃষ্টে স্বামীর পানে চেয়ে—হেসে উঠলেন—

"কি ভুলো মন তোমার—বলতো? একটা কথাও কি ছাই মনে থাকে না।" অশ্বিনী বাবু চিন্তিত ভাবে চেয়ে রইলেন।—

যমুনা দেবী বিরক্ত ভরে—বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—"খোকার পায়েস দেবার—ব্যবস্থা করতে হবেত?

"পায়েস্?"

"হ্যাঁ পায়েস আকাশ থেকে পড়লে নাকি?"

"তা পায়েস দিতে চাও দাও"—

"দাও বললেই তো দেওয়া যায় না, সব জোগাড় করতে হবেতো—রোজ এত করে বলি তবু তোমার হুঁস থাকে না। আজ আর ভুলো না যেন, দিনাজপুরের সরু চিঁড়ে খেজুর গুড় আর দুধ" —

যমুনা দেবী দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেলেন—অশ্বিনী বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন—চাহনি ভঙ্গিমা কথাবার্তা সবতেই সুপরিস্ফুট মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ।—বুলু সরবতের গ্লাস হাতে, কাছে এসে দাড়ালো—

"মেসোমশায়"—

"কি মা ?"

"কলকাতায় তুমি একটা চিঠি দাওনা, আমিতো একখানারও উত্তর পেলাম না "

অশ্বিনী বাবু হেসে বললেন—"চিঠি দিয়ে কি হবে মা, তারা পাঠাতে বললেও আমিতো আর পাঠাতে পারিনা। আগে শরীর সারুক্ তবেতো যাবি,—তারপর তোর মাসীমার অবস্থা দেখছিস তো !"

"কিন্তু আমি থাকলে মাসীমা আরোও অসুস্থ হয়ে পড়বেন যে"—

"দূর পাগ্লী মা, মাসী, এদের কথায় কি দুঃখ করতে আছে !" বুলু অপরাধিনীর—মত নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকে।—কয়েক দিন ধরে অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করেছিল, মেসোমশাইকে বলে সে কলকাতা চলে যাবে।—মাসীমার সামনে দাড়াবার তার সাহস হয়না। আজো তার কাণে বাজে যমুনা দেবীর সেই রূঢ় সম্ভাষণ।

শ্যামলীর আন্তরিকতা, অশ্বিনী বাবুর স্নেহ,—বুলুকে যেন অতিষ্ট করে তোলে—সে জানে তারই দূষিত নিঃশ্বাসে—অকালে নিভে গেছে এ গৃহের নয়নানন্দ আনন্দের উৎস, 'প্রদীপের' জীবন—প্রদীপ।

শ্যামলী এসে বলে "তুমি দিদিকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও বাবা, ও ভাবে আমরা সবাই ওর পর,—কেবল মামারাই আপনার জন।"

বুলু ব্যাকুল স্বরে প্রতিবাদ জানায়—"না মেসোমশায়—তা কখ্খনো আমি ভাবিনা।"

"তবে কলকাতা যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন শুনি?—জানো বাবা কাল রাতে দিদি কিছু খেলেনা"—।

হঠাৎ শ্যামলী থেমে গেল। বুলুর চোখের মিনতি সে অগ্রাহ্য করতে পারলো না।

"কাল কি শরীর ভাল ছিলনা মা?"

শ্যামলী বলে ওঠে—শরীরের কি দোষ বল! অত ভাব্‌লে কি শরীর ঠিক থাকে? মামারা উত্তর দেননি, তাই ওর ভাবনা হয়েছে, আর বোধ হয় নিয়ে যাবেনা।

রান্নাঘর থেকে—যমুনা দেবীর আহ্বানে শ্যামলী চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে অশ্বিনীবাবু বল্লেন—

"দেখ্ মা আমার কাছে কোন কথা লুকোনো তো ঠিক নয়,—তুই না বল্‌লে আমি জানতে পারবো না। ফলে—তোর স্বর্গত বাবা মা কষ্ট পাবেন—।"

বুলু ধীরে ধীরে বলে "বাবার স্নেহ কাকে বলে, তা' আমি জানিনা মেসোমশায়-কিন্তু আপনার স্নেহ—" হৃদয়াবেগে বুলুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল—কেবল বিহ্বলনেত্র থেকে নেমে এলো,—তরল উষ্ণ মুক্তা বিন্দু—।

অশ্বিনীবাবু সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন "জানিস মা আমার কুষ্ঠিতে আছে।—শেষ পর্য্যন্ত থাকবে আমার দুটি সন্তান। খোকাতো চলে গেল, কিন্তু জ্যোতিষ

শাস্ত্রকে আমি মিথ্যে হতে দেব না। মনোরঞ্জনকে আজই লিখে দিচ্ছি,—আমার বুলুমাকে তোমাদের কাছে আর পাঠাবো না,—তার কোনো ভাবনা তোমাদের ভাবতেও হবে না।" বুলু মুখ নত করে থাকে,—।

"শ্যামলীর বিয়ের সব ঠিক হয়েই আছে, মনে করছি তোদের দু'বোনকে—একসঙ্গে সম্প্রদান করবো।"

শ্যামলী দরজার সামনে এসে থমকে দাড়ালো সম্প্রদানের কথাটা তার কাণে গেছে।—অশ্বিনী বাবু শ্যামলীকে লক্ষ্য করে বললেন·—

"সব ব্যবস্থা করে ফেললামরে।" শ্যামলী পিতার কাছে এসে দাড়ালো।—

"দেখ, ঠিক করলাম তোদের দু' বোনের বিয়ে এক সঙ্গেই দেব,—জ্যোতিষের ভাই—কি নাম যে ছেলেটির—তার সঙ্গে বেশ মানাবে, কি বলিস ?"

বুলু, শ্যামলী, অপরাধিনীর মত নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকে।—হঠাৎ যমুনা দেবীর আগমনে বুলু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।—

খোকার মৃত্যুর পর থেকে আজও সে মাসীমার সামনে একবারও দাড়ায়নি।—

বুলুর হাতখানা চেপে ধরে—মিনতি ভরা স্বরে যমুনা দেবী বললেন—"খোকন তোকে খুব ভালবাসতো তুই পায়েস রান্না করনা মা।"

বুলু অবাক হয়ে যায়,—এমন স্নেহ করুণ সম্ভাষণ সে জীবনে আশা করেনি। শ্যামলী সোৎসাহে বলে—"চল্ দিদি আমরা যাই,—দুধের গন্ধে বেড়াল ঘোরাঘুরি করছে"—

শ্যামলী বুল্টুকে টেনে নিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

"তুমি আজ অফিস যাবে ?

"কেন বল 'তো' ?"

"না গেলে হয় না ?"

"তোমার দরকার থাকলে যাবো না।"

"কাজ ? না, কাজ নেই,—তবে আজ কোথাও যাওয়া চল্‌বে না" হঠাৎ স্বামীর একখানা হাত খপ্‌ করে চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে বল্লেন "সত্যি তুমি আজও ঠিক সেই রকমই আছ!—মনে পড়ে সেই বিয়ের পর ভাগলপুরের কথা,—দুদিন ট্রেন ফেল করিয়েছিলাম হাঃ—হাঃ—হাঃ!—

পরক্ষণে ত্রস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে বলে ওঠেন—"ও মা,—আমাকে কি পাগল পেয়েছ ?" ভরা দিন দুপুরে,—মেয়েদের রান্নাঘরে পাঠিয়ে,—আড্ডায় মেতে উঠেছ ?—না বাপু, কাজের সময় গল্প ভাল লাগেনা।" বিরক্ত ভরে—যমুনা দেবী চলে গেলেন।

১৬

জিনিষ পত্র বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে, সারদা বাবু জনকয়েক কুলি নিয়ে খুব ব্যস্ত।—বেলা আটটা বাজতে চল্‌লো দশটায় ট্রেণ অথচ অনেক কাজ বাকী।—রাঙাদির কিন্তু কোন ব্যস্ততা নেই,—মুখখানা বিরক্তিতে থমথমে। সারদা বাবুর প্রতি কথায় তিনি ধমক্ দিয়ে উঠ্‌ছেন। তিন দিন ধরে' অনবরত যুক্তি তর্ক চালিয়ে—রাঙাদি' আজ পরিশ্রান্ত।

কলকাতা থেকে সারদাবাবু নিয়ে এসেছেন কালুখালিতে বদলির 'পরোয়ানা;'—সেই সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি আর পদন্নোতি।

হাসি মুখে সু-সংবাদটা পরিবেষণ করে, সারদা বাবু চমকে উঠেছিলেন।—

"কি গো শরীর ভাল নেই বুঝি?"

সারামুখে—আষাঢ়ের অন্ধকার নামিয়ে—ঝাঁজের সঙ্গে রাঙাদি জবাব দিয়েছিলেন—"আবার সেই—টানা হ্যাঁচড়াতো?—মালপত্তর টানতে টানতে গেলাম। দু দিন সোয়াস্তিতে একটু নিঃশ্বেস ফেল্‌বার কি যো আছে!—"

তারপর তিনদিন দিবারাত্র ধরে চলেছে,—স্বামী স্ত্রীর তর্ক বিতর্ক। শেষে নাচার হয়ে রাঙাদি পরাজয় বরণ করে শান্ত হয়ে পড়েছেন,—কিন্তু অন্তরের অন্তর্দ্দেশে যে একটা দাহ চলছে,—সেটা বুঝতে পারা যায়,—তাঁর প্রত্যেক কথায়।—

শান্ত আগ্নেয়গিরির—অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মত রাঙাদির—অন্তরের "লাভা" প্রতিটি সুযোগে—বেরিয়ে আসে, ঝঙ্কার আর বিরক্তির আকারে।

একয়দিন অলোকের দেখা নেই। কাজের চাপে সে আটক পড়েছে চম্পানগর ক্যাম্পে। পাঁচটাকা বখ্‌শিষ দিয়ে তিনি লোক পাঠিয়েছেন,—'বিশেষ দরকার যেমন করেই হোক একবার আজই অলোকের আসা চাই।'

"মোটে আর দুটি ঘণ্টা হাতে আছে এর মধ্যে যদি সে না আসে?"

রান্নাঘরের জানলার ধারে দাড়িয়ে আছেন রাঙাদি।—কে একজন সাইকেল চড়ে আসছে। সাইকেল আরোহী খুব কাছাকাছি আসতেই রাঙাদি চটে উঠলেন। জ্বালিয়ে খেলে এই ঠিকাদারের লোকগুলো—উনুনের কড়ায় চড়্ চড়্ পট্ পট্ শব্দ উঠ্‌লো,— রাঙাদির খেয়াল নেই,—

—"সব পুড়ে গেল যে—নামাও নামাও"। "দশ-ভুজা তো নই,—

একহাতে ময়দা মাখবো, বেলবো, না, তরকারী দেখবো ?"

কড়া নামিয়ে সারদাবাবু বল্‌লেন—"বলেছিলাম তো এ সব হাঙ্গামায় কাজ নেই।" রাঙাদি জবাব না দিয়ে লেচি কাটতে লাগ্‌লেন।

"বড় ট্রাঙ্কটার চাবিটা দাওতো।"

চাবির রিংটা ঝনাৎ করে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন—"সকালের ট্রেণে যেতে পারবোনা, যেতে হয় তুমি যাও !

সারদাবাবু ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন—"তাই না হয় হবে,—সন্ধ্যের গাড়ীতে বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে।"

রিংটা তুলে নিয়ে সারদাবাবু চলে গেলেন। জ্বলন্ত উনুনে বার কয়েক খোঁচা মেরে একরাশ কয়লা চাপিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন রাঙাদি।

তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল সারদাবাবুর কথায়—, রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন রাঙাদি।

"তোমার কি হুঁস বলে কিছু নেই,—বেচারী তেতে পুড়ে আসতে না আস্‌তে, নিজের কাজে লাগালে ?"

সারদাবাবু 'থ' খেয়ে গেলেন —।

"ছেড়ে দাও দাহু,—আমিই বেঁধে ছেঁদে নেবো—"

বিছানা জড়ানো শতরঞ্চির উপর একটা পা রেখে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অলোক বলে—"এই হয়ে গেল—"।

রাঙাদি অলোকের হাত ধরে বলেন—"থাক, যাদের কাজ তারা করুক"। পরক্ষণে সারদাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"বিছানাপত্তর নিয়ে তো মেতে উঠেছ", কিন্তু অন্য কাজ সব কখন করবে শুনি ?"

"অন্য কাজ" !

বিস্মিত হয়ে সারদাবাবু চেয়ে রইলেন।

"ভীমরতি না হলে কি এমন হয়, এককথা বিশবার না বললে মনে থাকেনা কেন ? অলোকের জন্যে কি বলেছিলাম ?"

সারদাবাবু লজ্জিতভাবে উত্তর দিলেন—"তাইতো একটুও মনে ছিলনা।"

"কিইবা তোমার মনে থাকে ? সকালের ট্রেনে যাবার জন্যেত ব্যস্ত !"

অপ্রতিভ সারদাবাবু অলোককে বললেন—"তুমি একটু দেখো দাদু আমি বাজারে যাচ্ছি—।

রাঙাদি রান্নাঘরে এসে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন,—"চলে তো যাচ্ছি এখনও রাগ ?"

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অলোক বলে—"রাগ করিনি তো রাঙাদি"।

"পাপিষ্ঠা বিদায় নিচ্ছে খুব আনন্দ না ?"

রাঙাদি হেসে উঠলেন। চা শেষ করে অলোক বলে—"কি দরকার বলুন ?"

"আচ্ছা বাজার এখান থেকে কত দূর ?"

"অনেক দূর—"

"আসতে যেতে কত সময় লাগবে ?"

"ঘণ্টা দু'য়ের কম তো নয়— !"

"চল ও ঘরে যাই— ।"

"আপনার উনুন নিভে যাবে যে—?"

রাঙাদি হেসে উঠলেন "আমার উনুন নিভবার নয়—"

"কি কাজ আছে বলুন"

"ঘরে চল বলছি—"

"না।"

রাঙাদি অলোকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে বললেন—আচ্ছা আমি আসছি—"।

অলোক নিজেকে ধিক্কার দেয়,—না এলেই হোত,—সব জেনে শুনে, পাগলামীর মধ্যে না আসাই উচিত ছিল।

"নাও ধর—।"

"কি আছে ?"

"খুলে দেখ—।"

অলোক বিস্মিতভাবে বলে—"এ কি হবে ?"

"তুমি একজনকে দেবে,—"

পিতলের ছোট বাক্সটিকে মাটিতে রেখে ঝাঁজের সঙ্গে অলোক বলে এইজন্যে ডেকেছিলেন ?"

রাঙাদি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসেন—।

"আচ্ছা আমি চল্‌লাম।"

উঠে দাড়াতে, রাঙাদি অলোকের কোচা চেপে ধরলেন। "ছিঃ রাগ করতে নেই —।

ভ্রূকুটিভঙ্গে অলোক বলে—"কি হচ্ছে বলুন তো, কুলিরা কি মনে করবে ?"

"সে দোষ কি আমার ?—তুমিই তো গলাবাজি করছো।"

বাক্সটা তুলে বললেন—"নাও ?"

"না।"

'নেবে না ?—পাপিষ্ঠার দান বলে ?'

"দান নয় চুরি ।"

"চুরি !"

"নিশ্চয়ই—. সারদাবাবুর সম্পত্তি আপনি চুরি করেছেন।"

রাঙাদির হু'চোখ যেন জ্বলে উঠ্লো. অলোকের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"সারদাবাবু যে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করে দিলেন. তার কি ?"

"বাজে কথা শোনাব আমার সময় নেই—!"

"নেবে না ?"

"না।"

"চলে যাচ্ছো ?"

"হ্যাঁ"—

"সারদাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে না ?"

"না।"

"শোন-শোন।"

রাঙাদি' অলোকের পিছু পিছু ছুটে গেলেন।"

"ঘরের মধ্যে চল, গয়না না হয় না নিলে "

অলোক বিব্রত বোধ করে — কুলিরা তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

* * *

রাঙাদির ঘরখানা আজ যেন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগার।

রাঙাদি' অলোকের কাছ ঘেঁষে বসে পড়লেন।

"বলুন কি বলবেন ?"

"এত ব্যস্ত কেন বলতো"

অলোক চুপ করে থাকে —

"পূজোর ছুটিতে কালুখালি যাবে !"

"না।"

"যদি টেলিগ্রাম করেন তোমাদের সারদাবাবু ?"

"না"

"আর,—যদি শোন যে পুড়ে মরেছি কিংবা গলায় দড়ি দিয়েছি, খুব সুখী হবে ত ?"

"কি সব বাজে বক্‌ছেন বলুনতো!"

রাঙাদি হাসতে হাসতে অলোককে জড়িয়ে ধরলেন—

"বাজে কথা একটুকুও নয়—অলোক।"

অলোকের সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো

"কি হোল ?"

"কি বিশ্রী গন্ধ !"

রাঙাদি' একটু দূরে সরে গেলেন।—

"আচ্ছা একটা কাজ করে দেবে— !"

অলোক চুপ করে থাকে—

"গয়নাগুলো বিক্রী করে দাও ! যা দাম হয় !"

"বিক্রী করবেন ?"

"হ্যাঁ, রেখে কি লাভ !"

অলোক পালাতে পারলে বেঁচে যায়, প্রকাশ্যে বলে "আচ্ছা দিন।"

"এখুনি যাবে ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা এক কাজ করবে,—তুপুরে রোদের মধ্যে না এসে—বিকেলে টাকা নিয়ে এসো,—আর গাড়ী করে যাবে আসবে কেমন ?"

"আচ্ছা"।

অলোক গয়নার বাক্স রুমালে বেঁধে বেরিয়ে গেল।

* * *

সারদা বাবু ফিরতেই রাঙাদি' বললেন—"রাতের গাড়ীতে সমস্ত রাত কাঠিহারে বসে থাক্‌তে হবে।"

সারদা বাবু রেগে উঠলেন "তা কি করবো বল!"

অলোক বল্‌ছিল—"তুপুরে এখান থেকে বরাবর কাঠিহার যাওয়াই ভাল। ঠিকাদারের গাড়ী তো আছে।"

"হ্যাঁ তা' হতে পারে।—কাপড় দেখবে ?

"বাঃ,—বেশ হয়েছে, ওদের মেসে পাঠিয়ে দাও, বেচারী ছুটেছে তার কাজে, হয়তো আর আস্‌তে পারবে না।

* * *

বৈকালে অলোক এসে দেখে,—সারদাবাবুর বাসা একবারে খালি,—চৌকিদার জানালো—

"মাইজি লোগ্।—দো' বাজে চলা গিয়া" -

১৭

"যে তো টাকা লাগে গুণগারী—
লো-ভাল নারী
এবে না ছোড়ব জিম্‌দারী।"

রঘুয়া খাটিয়ায় বসে অঙ্গভঙ্গি সহকারে গান গায়। ঠিক তার সামনের বারান্দায় জানকী রান্নায় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অবগুণ্ঠন খসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রঘুয়া কর্কশ-কণ্ঠে সঙ্গীত আলাপন শুরু করে—

"কাণে কুণ্ডল শোহে নাক্‌মে বেশরি
তোহারি সুরত হাম্ বিসরে ন পারি।"

পুনিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করে দেখে, তু'জনের রঙ্গ-বিলাস। মন তার বিষিয়ে ওঠে,। এক একবার ভাবে আচ্ছা করে ডাণ্ডা পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে সে—তুজনকেই—।

যেমন 'বহু' তেমনি তার ভাই,—বে-এক্তিয়ার, বে-হুঁসিয়ার। তবু নিজের শরীরের কথা ভেবে শেষ পর্য্যন্ত সে চোরের মত লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। রঘুয়া মস্ত জোয়ান আর সে তুর্ব্বল।

অভিমান জাগে বিধাতার উপর—"হায় ভগবান্ এ তোমার কোন বিচার—? ঐ লুচ্চাটার মত আমাকেও পাহালবান করলে, কোন কি ক্ষতি ছিল তোমার ?"

রাগ হয় মা-বাপের উপর —।

রঘুয়া না হয় জোয়ানী 'বহু' দেখে, বে-এক্তিয়ার, কিন্তু তার মায়ী, তার, বাপুজী কি, কিছু বোঝে না ? কোনই হুঁস নেই ? তুদিন আগে সে মায়ের কাছে অভিযোগও করেছিল। মায়ের জবাব আজো তার কাণে বাজে—"রঘুয়া বেটা না থাক্‌লে, ঠিকাদারীর কি ঘট্‌তো সে হুঁস আছে ? তুহার ভবিষ্যৎ 'তো হর্‌রোজ ধুঁক্‌ছে।"

'নাঃ, এখানে না দাঁড়ানোই ভাল, শুধু শুধু দিল খারাপ করে কি লাভ ?'

তবু সে যেতে পারে না,—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সহ্য করে মশক দংশন। জানকীর আগেকার কথা তার মনে পড়ে, ঘোষ সাহেবের কথাতো সে-ই বে-ফাঁস করে দিয়েছিল রাতে কত গপ্ সপ্ হোত। রঘুয়াই হচ্ছে শয়তান,—এখন জানকী একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে চায় না নিজে থেকে,—কিছু বল্‌তে গেলেই সে রুখে ওঠে।

দরজায় দাড়িয়ে রঘুয়া জিজ্ঞেস করে—"খানা হুয়া বহু" ?

জানকী ইসারা করে ডাকে —। কিনারা উঁচু পিতলের থালায় রুটির গোছা চাপিয়ে জানকী খুব আস্তে আস্তে কি বলতেই রঘুয়া হেসে উঠ্লো।

শিকারী জন্তুর মত নিঃশব্দে অপেক্ষাকৃত কাছে এসে, লুকিয়ে থাকে পুনিয়া।

রঘুয়া রুটি মুখে দিয়ে বলে ওঠে—"হায় রাম ডাল্‌মে নিমক্ কাঁহা গৈল ?" জানকী ফিক্ করে হেসে খানিকটা নুন থালায় দিয়ে—কি বলতেই, রঘুয়াও হেসে উঠ্লো। পুনিয়া ক্ষুদ্র চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব বড় করে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।

মচ্ছর তাড়াবার সময় কিছু ঘট্‌লো নাকি ! "থোড়াসে ডাল্‌তো দেও।"

পরিবেষণের সময় জানকীর হাতা শুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে রঘুয়া বলে "বেঠ—"

জানকী ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে বলে—"কই দেখ লেতা তব ?"

সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে তার হাসি,—বিরক্তি কিংবা রাগের চিহ্নমাত্র নেই—।

রঘুয়া তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেয়—"ওহি রোজ চাচিকো মালুম হো গিয়া।"

পুণিয়া ঘেমে ওঠে—রাগে তার সমস্ত শরীর গরম হয়ে যায়।— আহার শেষে রঘুয়া চলে গেল। জানকী চীৎকার করে—"এ হো পারবাতী বুধনিয়া,—তু লোগ আজ খইব কি ন ?" পার্ব্বতী, বুধনিয়া, খেতে বস্‌লো,। জানকী রামলালের খাবার নিয়ে গেল ! রামলাল এখন আর লোটা হাতে পুণিয়ার মাতারীর কাছে খানাপিনার জন্যে আসে না, খাটিয়ায় বসে, আহার শেষ করে। মজুর থেকে ঠিকাদারীতে উন্নীত

হয়ে এইটেই দাড়িয়েছে তার বিলাসে। পুণিয়ার মাতাস্নী প্রথমে আপত্তি করলেও শেষে টেকেনি। সেও দেখেছে-সিন্ধি আর কাচ্ছি ঠিকাদারেরা এতে বড় অভ্যস্ত, হয়তো এটা ঠিকাদারদের রেওয়াজ —।

মাথা ঠাণ্ডা করে সহজ স্বরে পুণিয়া খাবার চায়। সে বেশ বুঝেছে রাগ অভিমান শাসন সবই জানকীর কাছে বৃথা।

খাবারের থালা এগিয়ে দিয়ে ঘোমটা টেনে জানকী চুপ করে বসে থাকে।

পুণিয়া মাথা নিচু করে রুটি চিবোয়।—প্রতিটি চর্ব্বণের সঙ্গে উদ্দীপ্ত হয় অহেতুক রোষ।

রঘুয়ার সঙ্গে'তো বেশ রং তামাসা চল্‌ছিল,—তাকে দেখেই কেবল সরম্! শাশুড়ীর ডাকে জানকী চলে গেল। পুণিয়া রুটি শেষ করে, শূন্য থালার সামনে বসে থাকে,—জানকীর দেখা নেই! শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে ডাকে "মায়ী—এ মায়ী!

—"ক্যা হুয়া"

পুণিয়া চটে যায়—কিন্তু মুখে কিছু বলে না। পুণিয়ার মা কয়েকখানা রুটি দিয়ে বলে "একটা বহুত ভারী কাম্ মিলেছে, প্রায় তিন হাজার নাফা থাক্‌বে, ।

পুণিয়া ঢক্ ঢক্ শব্দে লোটার জল শেষ করে মায়ের কথা শোনে।

কল্কে হাতে রামলাল এসে উপস্থিত। উনুন থেকে আগুন তুলে ফুঁ দিতে দিতে বলে—"কুলী কামীন্ আনবার জন্যে পুণিয়াকে বিলাসপুর যেতে হবে ইত্যাদি সব কথার পর পুণিয়ার সাফ জবাবে রামলাল চটে ওঠে,—। পুণিয়া ভাবে, ওসব রঘুয়ার কারসাজি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায়,—সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

রঘুয়ার খাটিয়া শূন্য,। সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে গেল ?

তন্ন তন্ন করে পূর্ণিয়া খুঁজে বেড়ায়। জ্বালানী কাঠের চালা-খানার ভিতর শব্দ হতেই, পূর্ণিয়া একখানা লাঠি নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে যায়। রান্নাঘর থেকে জানকীর গলা শুনে মনটা তার অনেকটা হাল্কা হয়—'নাঃ জানকী ততটা – নয়!'

নিশ্চিন্ত হয়ে খাটিয়ায় বসে একটা বিড়ি ধরালো পূর্ণিয়া—। মিঠা মৌরী বিড়িটা তার বেশ লাগে—। আজই সে জানকীর সঙ্গে আপোষ করে ফেলবে।—জানকী নিশ্চয়ই আপত্তি করবে; কিন্তু সে মানবে না,—সোনার হাঁস্‌লী আলবৎ কিন্‌তে হবে। মায়ী কি ভাববে? বাপুজী কি বলবে? সব কিছুকে সে থোড়াই কেয়ার করে। সে তার বহুকে যদি দেয়, তাতে কার কি?

পূর্ণিয়া তার সংকল্প দৃঢ়তর করে ফেলে।

* * *

সাংসারিক কাজ কর্ম্ম মিটিয়ে জানকী ঘরে এলো, পূর্ণিয়া আর একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘন-ঘন টান্‌তে থাকে, কি বলবে কিছু ঠিক করতে পারে না।

জানকী তার দিকে একবার চেয়েও দেখল না, চাটাই বিছিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়্‌লো।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে—পূর্ণিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—। জানকী যদি ঘর ছেড়ে পালায়!

ফ্যাসাদ বাধিয়েছে পার্ব্বতী আর বুধন,—ভৌজিকে পেলে এখুনি তারা গপ্‌ সপ্‌ সুরু করবে।—

জানকীর উপর সে চটে ওঠে—কিছুই যেন সে বুঝ্‌তে পারছে না,

দিন ভোর খেটেখুটে এতক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে থাকার মানেটা, তার বোঝা উচিৎ! সব সে বুঝতে পারে,—কেবল তার বেলাতেই—বেহুঁস—!

জানকীর নাসিকা—গর্জ্জন শোনা যায়। পূর্ণিয়া নিজেকে ধিক্কার দেয়,—'সাহস করে এগিয়ে গেলেই সব মিটে যেতো' নিশ্চয়ই আজ জানকীর মন মেজাজ ভালো ছিল। আবার পুরা একরাত, একদিন, বাদ সুযোগ মিলবে। গালে একটা মশা বসতে, নিজের গালেই একটা চড় কষিয়ে দিল পূর্ণিয়া,— দূর, এখন পস্তালে কি হবে—? একটু সোহাগ করে দুটো মিঠা কথায় কাজ মিটে যেতো, শুধু সে ভয়েই গেল! এত ভয়ই বা কিসের—? লণ্ঠনটা নিভিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো পূর্ণিয়া।

* * *

"এ হো—" মৃদু কণ্ঠে ডাকলো জানকী, পূর্ণিয়ার মুখ থেকে একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ নির্গত হয়, যেন সে কোন কিছু চর্ব্বণ করছে।

জানকী আর একবার ডাকলো,—তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লো—!

অন্ধকার! অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা ছায়া মূর্ত্তি নিঃশব্দ—পদ-সঞ্চারে—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

ঠুন্, ঠুন্, করে চুড়ী বেজে ওঠে। আগন্তুক ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় জানকীর দিকে।

ঘণ্টা খানেক পর—আগন্তুককে বিদায় করে, খিল এঁটে, জানকী শুয়ে পড়লো পূর্ণিয়ার পাশে—।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে পূর্ণিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখে—জানকীর একখানা হাত এসে পড়েছে, তার বুকের উপর। সন্তর্পণে পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশে জানকীকে আবৃত করে শীতে কাঁপতে থাকে পূর্ণিয়া।

বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি নেমেছে—।

১৮

উজ্জ্বল আলোক-পাতে মণ্ডপটিকে দেখাচ্ছে সুন্দর। নাট্যমঞ্চের সম্মুখে প্রলম্বিত রয়েছে মস্ত বড় একখান চিত্রপট। বিশাল নীল সমুদ্র,—মধ্যস্থলে অস্পষ্ট আকারে রক্ষোপুরী স্বর্ণলঙ্কা। সৈকত'পরি শরসন্ধানে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় শ্রীরামচন্দ্র। অপূর্ব্ব চিত্রপট এই সমুদ্র শাসন।

সন্ধ্যা থেকে লোক জমায়েত হতে শুরু হয়েছে—রাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে জন কোলাহল।

সাজ ঘরেও খুব হট্টগোল। রাত আটটায় নাটক আরম্ভ হবার কথা, ৯টা বেজে গেল অথচ দণ্ডীরাজ রূপী শ্রীভূষণের দেখা নেই। আসর থেকে জনকয়েক ছোক্‌রা টিটকারী দেয়, শিষ আর হাত তালির বিরাম নেই। অভিনেতারা নেপথ্যে নীরবে সব সহ্য করেন।

চতুর্থ ঘন্টার পর ড্রপ্‌ সিন্‌ উঠে গেল। পাউডার মুখে বেরিয়ে এলো শ্রীভূষণ। "দেবতার গ্রাস" তার একচেটে। আবৃত্তির—পর ডাঃ গুহ গাইলেন একখানা গান। গানের শেষে আরম্ভ হল অভিনয়।

ইন্দ্র সভা— সিংহাসনে দুর্ব্বাসা ও ইন্দ্র,—চারিপাশে দেবগণ, সম্মুখে নৃত্যরতা উর্ব্বশী। হঠাৎ উর্ব্বশী হেসে ফেল্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে ছন্দঃপতন হয়ে গেল নৃত্যের—। সন্ন্যাসী বুঝ্‌তে পারলেন সব কেন এই হাসি, আর কি জন্যই বা তালভঙ্গ।

এত স্পর্দ্ধা এই স্বর্গ বারাঙ্গনার?" আসন ত্যাগ করে ক্রোধ সর্ব্বস্ব ঋষি দিল অভিশাপ। উর্ব্বশী মার্জ্জনা চায় করজোড়ে কিন্তু ক্ষমাহীন দুর্ব্বাসা মানেনা কোন অনুনয়।—"ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই!" শেষে ইন্দ্রের কাতরতায় বলে দেন,—শাপ বিমোচনের উপায়।

নির্ব্বাক অভিনয়ের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌লো সমস্ত পৌরানিক আখ্যায়িকাটুকু। দর্শকদের মুখে কথা নেই—বাস্তবিক এতখানি সাফল্যের আশা তারা করেনি। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী তুলসীদাসের ঊর্ব্বশী-নৃত্য অতুলনীয় কিন্তু দেবেন ফিটারই সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। মাত্র চোখের অভিব্যক্তি প্রকাশে পেশাদার অভিনেতাকেও সে হার মানিয়েছে।

সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে এলো প্রথম যবনিকা। এক্সি-কিউটিভ্‌ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ নেপিয়ার আসন ত্যাগ করে উঠলেন। তাঁর সুবিধার জন্যে সমগ্র নাটকের মূল ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরাজীতে লিখে দেওয়া হয়েছে। মিঃ নেপিয়ার দ্বিজেনবাবুকে ডেকে পাঠা-লেন।—কঞ্চুকী বেশী—দ্বিজেনবাবুকে দেখে সাহেবের হাসি থামে না। অভিনয় তাঁর খুব ভাল লেগেছে—কিন্তু এখুনি তাকে কাঠিহার যেতেই হবে,—সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন কলকাতার।

প্রতিটি দৃশ্য সুষ্ঠু ও সু-অভিনয়ের সঙ্গে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চল্‌লো। শেষ দৃশ্য—স্বর্গ ভ্রষ্টা—চির-যৌবনা ঊর্ব্বসী—মুক্তি পাবে অষ্ট বজ্র সম্মিলনে। চিরশত্রু কুরু—পাণ্ডব শত্রুতা ভুলে দাড়িয়েছে যাদবীয় আর দেব-সেনার বিরুদ্ধে। সুদর্শন ধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন খড়্গপানি মহাকালী। কি আশ্চর্য্য, ঊর্ব্বশী যে সত্যই ঊর্দ্ধলোকে মিলিয়ে গেল। ভোরের স্নিগ্ধতার মাঝে নেমে এলো শেষ যবনিকা। আবার আরম্ভ হোল চিৎকার হাঁক ডাক হট্টগোল। সকলে এক সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করতে ব্যস্ত। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে শান্ত ভদ্র ভাবে নিষ্ক্রমনের সহিষ্ণুতা কারুরই নেই।

নানা রকমের সমালোচনা চল্‌ছে—

"নাঃ অলোকের শ্রীকৃষ্ণ সব চেয়ে সুন্দর ."

কেউ বলে "দণ্ডীর" পাঠ শ্রীভূষণ ডুবিয়েছে—"

অন্য জনে প্রতিবাদ জানায়

"সামাজিক হোলে দেখতিস একবার ; 'জীবানন্দে' অবিকল 'শিশির বাবু' ।"

গ্রীনরুমে হুলুস্থুল বেধেছে— । ড্রেসার কুঞ্জবাবুর মেজদা মহাদেবের ত্রিশূল নিয়ে কুঞ্জকে আক্রমনে উদ্যত ।

"এইবার এই বার বধিব তোরে, রে পামর কুঞ্জনাথ, তিনদিন অভুক্ত আমি, ক্ষুধানলে জ্বলে নাড়ী ভুঁড়ী, তাই ধরিয়াছি সংহার ত্রিশূল। শূলাঘাতে বধিব জানিস ?" দ্বিজেনবাবু থিয়েটারের ভঙ্গিতে মিনতি জানান— 'মার্জ্জনা—মার্জ্জনা মেজদা"

শান্তবাবু কলোনীর সরকারী মেজদা, মাথা দুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন "নহে নহে কভু নহে—ক্ষমা নেই ।" শান্তবাবু ছিলেন রেলের ওভারসিয়ার । স্ত্রী বিয়োগের পর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে,—তুলসীদাস শান্তবাবুকে লক্ষ্য করে বলেন—শান্তদা ?

শান্তবাবু এক দৃষ্টে চেয়ে আনন্দে বলে উঠেন,—

"তুলসী—তুলসী মাষ্টার ? ওঃ কতকাল পরে দেখা ভাই ।"

বহুদিনের আলাপী বন্ধুর অপ্রত্যাশিত মিলনে জমে উঠে অতীতের আলোচনা । "মনে আছে—মাষ্টার, লালমনিহাটে আলীবাবার কথা ? আমার আবদাল্লা ?"

"—সেকি আজকের কথা, সবেমাত্র তখন ষ্টেজ্ তৈরী হয়েছে ।"

"তোমার নাচ দেখে মনে হচ্ছিলো বটে যে চেনা চেনা ।

ভাল করে কি কিছু দেখেছি ? জানো মাষ্টার ঐ রাস্কেল আমার

পাগল সাজিয়েছে। এরা না জানুক কিন্তু তুমিতো জানো, কি করে ওকে মানুষ করেছি—গর্দ্দভ পাঁচবারে ম্যাট্রিক পাশ করলো 'থার্ড ডিভিসনে'। সমস্ত জোগালাম,—মানুষ করলাম,—আর আমি এখন পাগল।" সকলে চেয়ে থাকে কুঞ্জনাথের দিকে।

"জানো মাষ্টার,—সুশীল বোম্বে থেকে টাকা পাঠায় কাকার নামে, কারণ আমি পাগল। মেয়ে দেখা করেনা—কাকা বুঝিয়েছে—পাগলে কামড়ে দেবে—! দুঃখের কথা আর কি বলবো—তিন দিন খেতে দেয়নি। স্নান করে বসে থাকি, কেউ উঁকি মেরে দেখে না। আজ কি খেয়েছি জান ?"

শান্তবাবু কোঁচার একটা দিক তুলে ধরলেন—।

"বুঝতে পারছনা ? ছাতু—,ছাতু খেয়েছি কাপড়ে মেখে,-কুলীদের কাছে ভিক্ষে চেয়ে—„

রাগে দুঃখে শান্তবাবু ক্ষুদ্র বালকের মত ফুঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

সকলে চটে যায় কুঞ্জনাথের উপর, কুঞ্জনাথ কি মানুষ না শয়তান ? কুঞ্জনাথ অনেক আগেই কেটে পড়েছে।

১৯

'সবুজ-সঙ্ঘের' জমাট আড্ডা দিলীপ ইচ্ছে করেই ভেঙ্গে দিয়েছে। মেয়েদের মোটা বুদ্ধিতে নাকি কোন্ কাজই চলেনা, তারা কেবল পারে রাঁধতে, খেতে, আর ঘুমোতে, তা'নাহলে দিলীপ দেখিয়ে দিত অনেক কিছু। দিলীপের মন্তব্যে অনেকে চট্‌লেও গীতা, রাণু, ও শেফালী একটি প্রতিবাদও করেনি। অথচ এই তিন জনেরই মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দিলীপের গবেষনার অন্তঃ নেই।

'সবুজ সঙ্ঘ' ভেঙ্গে গেলেও রাণু আর শেফালীকে দিলীপ খুব আপনার করে নিয়েছে।—শেফালী বাসায় লুকিয়ে তোলে রুমালে ফুল, রাণু প্রায় পাঠিয়ে দেয় পানের খিলি দিলীপদার কাছে! গীতার লুকোচুরির বালাই নেই,—তার সঙ্গে যে সত্যিকার রক্তের সম্বন্ধ। দু'জনে সব সময় এক সঙ্গে থাকে, গল্প গুজবে মেতে। গীতা তার সঙ্গিনীদের ত্যাগ করেছে, কি হবে সব বাজে খেলা খেলে—ওসব আর তার ভাল লাগেনা। তার চেয়ে বরং দিলীপদার কাছে মহাভারত ইতিহাসের গল্প শোনা ঢের ভাল।

মহাভারত-ইতিহাসের নামে অভিযোগ চলেনা, তবুও শান্তি দেবী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন। 'দিনরাত কি কেবল গল্প শুনেই কাটাবি, কাজকর্ম্ম শিখতে নেই?'

দিলীপ গীতাকে সর্ব্বদা বাঁচিয়ে চলে, "চির-দিনতো কাজ করবে মামী মা, দু'দিন একটু শুনুক না?" শান্তিদেবী আর কিই বা বল্‌তে পারেন? মাতৃহারা দিলীপ এসেছে—মামার কাছে,—গীতা তার কোলের সন্তান—

শান্তি দেবী চলে যেতেই রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাস,—তলিয়ে যায়—বর্ত্তমান দুনিয়ার আধুনিক আলোচনার মাঝে।—

গীতা অবাক হয়ে বলে—"এত তুমি শিখলে কি করে বলতো?"

সারামুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে—দিলীপ জবাব দেয়—"অনেক সব ইংরেজী বই পড়তে হয়েছেরে।"

গীতার মুখখানা বিকৃত হয়ে যায়—যেন একটা ভীষণ দুর্গন্ধ প্রবেশ করেছে তার নাসারন্ধ্রে,—

"মা গো, সব খোলাখুলি লিখেছে,—একটুও লজ্জা নেই, কি বেহায়া - "

দিলীপ হেসে জবাব দেয়—"তোরও লজ্জা নেই,—হাঁ করে সব গিলছিস কেন ?

গীতাও রুখে ওঠে—"আহা—প্রথমতো শুনতেই চাইনি, নিজে শুনিয়ে এখন আবার ইয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

বিভূতিবাবু ক্লাব থেকে ফেরেননি দিলীপ গেছে রাণুদের বাড়ী নেমন্তন্নে, শান্তি দেবী - আহ্নিকে মগ্ন।

গীতা এই অপূর্ব্ব সুযোগে দিলীপের স্যুটকেস থেকে বের করে নিল একখানা বেশ মোটা রকমের বই। বইখানা মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছে—কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে গীতা দেখতে পায়নি।

পরপর কয়েক খানা পাতা উল্টে একটা ছবি দেখে গীতা শিউরে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে আপন মনে ভাবে—কি করে তুললো এ ছবি!—নাঃ,—আর দেখবো না।

দেহের রোমাঞ্চ কাটতে না কাটতে আবার কৌতুহল জেগে ওঠে—তাড়াতাড়ি উল্টে যায় পাতার পর পাতা, কেবল ছবি আর ছবি—এ দেশের ও দেশের নানান দেশের নানারকম বয়সের বিচিত্র রকম ভঙ্গীমার।

বইখানা স্যুটকেসে রেখে—গীতা উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে—কণ্ঠতালু শুষ্ক প্রায়। গীতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—এই হতভাগা বই আর কখন দেখবো না।

"কিরে এমন সময় জল খাচ্ছিস কেন ?"

গীতা গেলাস রেখে বলে—"কি রকম গরম, তেষ্টা পাবে না বুঝি ?"

শান্তিদেবী অবাক হয়ে যান, গরম কোথায় গা ধোয়ার সময়তো আজ বেশ শীতের আমেজ পেয়েছেন তিনি।—প্রকাশ্যে বলেন—'গরমের দোষ কি, ফ্রকের মধ্যে কি বাতাস যায় নাকি?"

গীতা আব্দারের সুরে বলে, "খেতে দাও না মা, বড্ড খিদে পেয়েছে যে?" শান্তি দেবী মনে মনে তৃপ্তি পান,—বাড়ন্ত গড়ন হলে কি হয়, গীতুর মন কিন্তু আজও খুব……।

* * * * * * * * *

অনেক রাত্রে গীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। 'আঃ এতো জায়গা থাকতে দিলীপদা একেবারে এত কাছে এসে পড়েছে!" দিলীপকে একটু ঠেলে দিল গীতা।

আলোটা নিভে গেছে!—গীতা মনে মনে চটে যায়, 'এত করে বলা হয় তবু—শিবুর হুঁস থাকে না, এ ঘরের আলোয় বেশী তেল দিতে কি হয় তার?' চোখ তুটো বন্ধ হয়ে গেল গীতার।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কৌতুহল—কৌতুহল ভোজরাজ অন্তঃপুরে অনূঢ়া শূরসেন তুহিতার অপ্রমিত কৌতুহল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে, তুই ওষ্ঠ চেপে ধরলো গীতা। সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরেছে তার। ওষ্ঠে বক্ষে উরসে, এক নূতন অনুভূতি এক অভিনব পরিচিতি জেগে উঠলো।

উদ্বেলিত প্রাণে, আশঙ্কা ও পুলকের মাঝে, উৎসুক সুখে, নিজেকে সঁপে দিল গীতা। সারা তনুতে আনন্দের অমৃতধারা—অজস্র ধারায়

নেমেছে যেন। এতদিন জীবন কি তার মরেছিল নিস্ফলতার মাঝে? এতদিন কি পৃথিবীটা ছিল, অনুভূতি বিহীন এক বিরাট মরুভূমি?

—রিক্তাতিথি শেষে আজ কি এসেছে—পরিপূর্ণা জোয়ার, অন্ধ-মন্দিরে পড়েছে কি উদার জ্যোৎস্নালোক? —আজ—আজ—আজ পূর্ণা তিথি তার। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মত, ফুঁসে ফুঁসে গর্জ্জে ওঠে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

কুমারী গীতা, যেন আজ জাতিস্মর। মনে পড়ে, কত কোটী-কল্পকালের কত সব কাহিনী। আদিম উপবনে এরাই ছিল যেন প্রথম নর-নারী, ছিলনা যখন গৃহ, বস্ত্র, লজ্জা, ছিলনা সভ্যতার নাগপাশ, মুক্ত-বিবসন, সহজ সুন্দর আদিম নর-নারী। তারপর মধ্যে গেছে কত যুগ কত যুগান্তর, উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীতটে আবার দুজনে দেখা। আবার—আবার দেখা, মুঘলের রাজ অন্তঃপুরে, রাজপুতানার মরু বক্ষে, পার্ব্বত্য বনপথে কতবার কতবার মিলিত হয়েছে তারা।

—যাক সব ধুয়ে মুছে লুপ্ত হয়ে :—

মেঘ ডম্বরু বাজিয়ে বৃদ্ধ বিধাতা হানুক বিজলীর বান—গ্রাহ্য করে না গীতা. যাক যাক সব নিবিড় তিমিরতলে, শুধু থাক এই দাদুরীর ডাক আর এই অরূপের লীলা অনন্তকাল ধরে অসমাপ্তরূপে :

মৎসগন্ধা, পৃথা, জুদা, তামার, নীরো, অরিস্তিপাস, লাইসা সকলের প্রেতাত্মা যেন একসঙ্গে এসে ভীড় করেছে অন্ধকার গৃহমাঝে। জীব জগতের আদিমতম ক্ষুধার উদ্দাম প্রবৃত্তি ভুলিয়ে দিয়েছে অন্যায়, অনুশাসন, শোনিত-সম্পর্ক।

মাত্র একটী প্রাচীরের ব্যবধানে পরম নিশ্চিতে অঘোরে ঘুমায় গীতার জনক-জননী। ভীষণ এক দুঃসপ্নে বিভূতি সিংহের ঘুম ভেঙ্গে

যায়। রোষ-কষায়িত নেত্রে জটা জুটধারী বিরাট পুরুষ যেন ভৎর্সনা করছেন তাঁকে—"মাতা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন.......................।" স্বপ্ন, স্বপ্ন—অর্থহীন মনের প্রলাপ, বিভূতি বাবু পুনরায় নিদ্রিত হলেন। গৃহ শীর্ষ হতে নিশাচর বিহঙ্গম কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

২০

চিঠি খানা টুকরো টুকরো করে ফেললো মানসী।

নাঃ।—তার একান্ত আপন জীবনের খুঁটি নাটি কি কাউকে জানানো যায়? জানিয়েই বা কি লাভ' শুধু দীনতার প্রকাশ, আর তো কিছু নয়। মানসী নূতন করে লিখলো, ছোট্ট চিঠি—

মাকে বুঝিয়ে বলো দাদা, আমার যাওয়া অসম্ভব। আপনভোলা লোকটিকে কার কাছে রেখে যাবো বল? মাকে বলো তাঁর মানু সত্যিই খুব ভাল আছে। মা' কে প্রণাম দিলাম তুমিও নিও। ইতি—

নিজের লেখাটুকু পড়ে মানসী তৃপ্তি পায়। বাঃ বেশ হয়েছে। পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে মানসী।

এটা কি ঠিক হোল? হয়তো মায়ের সঙ্গে আর দেখাই হবে না।

কিন্তু সে যে নিরুপায়-পর্ব্বত প্রমান কর্ত্তব্যের বোঝা সে গ্রহণ করেছে, তাকে তো অগ্রাহ্য করা যায়না,—অসম্ভব।

হয়তো সে চলে যেতো অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যে, কিন্তু সব জেনে শুনে একদিনও অপূর্ব্বকে এক্‌লা ফেলে যেতে পারেনা সে।

বিনয় বোসের স্ত্রী লছমীর কাছে সে শুনেছে অনেক কথা, অপূর্ব্ব পড়েছে আনন্দ কবিরাজের খপ্পরে।

কবিরাজ আনন্দ সুকুল। মধুবনী বাজারে বড় ইঁদারার পাশে বিরাট বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো যার কবিরাজী ওষুধের দোকান। আনন্দ সুকুল—অফুরন্ত আনন্দের উৎস—"আনন্দ কল্পতরুর" আবিষ্কারক। "কল্পতরুর" অসংখ্য গ্রাহক অদ্ভুত কাটতি, আলোকে অন্ধকারে

প্রকাশ্যে গোপনে আনা গোনা যত সব আকাঙ্খা-উন্মাদ্ আর কামনা বিলাপীর।

নাঃ কবিরাজের ক্ষমতা আছে, অল্পদিনের মধ্যে রেল-কলোনীর অনেক ঘরেই তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। বিদেশ থেকে যারা এসেছে তারা ভুল করতে পারে—মানুষ চেনা সহজ ব্যাপার নয়! কিন্তু এখানকার নিজস্ব অধিবাসীদের কি এতটুকু কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই, দূর করে দিতে পারেনা এই সমাজ বিদ্রোহী—ভদ্র ভেকধারী পাষণ্ডটাকে। তাসের আসর সাজিয়ে কেমন অবাধে চালিয়েছে জুয়ার আড্ডা নাঃ—আনন্দ স্থকুলের ক্ষমতা আছে।

দ্বিধা সঙ্কোচ অভিমান আত্মসম্মান সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ তাকে মুখোমুখি লড়তে হবে। চাকরী। জীবন ধারনের একমাত্র অবলম্বন, অথচ এত অবহেলা কেন? কি এমন জরুরী কাজ থাকে তার কবি-রাজের বাসায়। মাইনের টাকা সব সব গেল কোথায় - সংসার চল্‌বে কি করে। তারপর এতদিনের-সাধনা, প্রানপাত পরিশ্রমের ফল, সমস্ত পাণ্ডুলিপি গুলোর কি হোল।

মানসী নিজেকে দৃঢ় করে তোলে।

প্রতিবাদ করা চাই, নিশ্চয়ই। তর্ক বিতর্ককে সে চিরদিন ঘৃণা করে এসেছে অথচ আজ প্রয়োজনের খাতিরে তাকে নাম্‌তে হবে তর্কের আসরে। অপূর্ব্ব-অপূর্ব্বর জন্যে সে সব কিছু করতে পারে শুধু তর্ক কেন?

দশটায় অফিস্ অথচ এগারটা বেজে গেলেও দেখা নেই কেন। তবে কি?

চিন্তান্বিত হয়ে উঠে মানসী, না—চাকরী গেলে এতক্ষণ বাসা ছেড়ে দেবার পরোয়ানা এসে যেতো।

বহরমপুরে সব সময় ছিল ছেলেদের ভীড়, পরিশ্রমের অন্তছিলনা। কিন্তু কত আনন্দ ছিল সেই খাটুনীর মধ্যে।—এখানে কেবল অবসর, এই এক ঘেয়েমী আর তার ভাল লাগেনা। লছমী, সুপ্রিয়া এদের সঙ্গে আলাপ না হলে হয়তো সে পাগল হয়ে যেতো।

অপূর্ব্ব প্রবেশ করলো, সারা মুখে চোখে রাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট ছাপ্। মানসী একবার মাত্র চাইলো তার দিকে। আজ তার চরম পরীক্ষা।

আহারান্তে মানসী প্রশ্ন করলো

অফিসে কি ছুটি নিয়েছ ?

অপূর্ব্ব থতমত খেয়ে জবাব দিল, "ছুটি, হ্যাঁ, তা ছুটি বই কি ?"

"কদিনের ?"

"যতদিন না যাই।"

"চাকরী থাকবে ?"

অপূর্ব্ব তাচ্ছিল্য ভরে বলে—"বয়েই গেল, একটা যায় অন্য জুটবে।"

"টাকা পেয়েছ ?"

"টাকা।"

"সংসার খরচের একটি পয়সা নেই।"—

"কত টাকা দরকার ?"

"যা দেবে।"

একটু ইতঃস্ততঃ করে মানসী বলে—"অফিসের টাকা সব কি হোল ?" অপূর্ব্ব ঘড়ি দেখ্তে দেখ্তে বলে "আছে।"

"বইয়ের খাতা সব কাকে দিলে ?"

অপূর্ব্ব বিরক্ত বোধ করলো—"কেন" ?

"এমনি"।

"আমার এক বিশেষ বন্ধুকে দেখতে দিয়েছি,—ছাপাবার ব্যবস্থা হতে পারে"।

"অপূর্ব্ব বাবু আছেন না কি"?

অপূর্ব্ব বাইরে চলে গেল।

মানসীর কাণে আসে এলোমেলো অনেক কথা।

"এই পঞ্চাশ"—"তা'হোক কিছু না কিছু না,—

ভারী'তো তিন শো—যাবেন আজই বুঝলেন।"

অপূর্ব্ব টেবিলের উপর খানকয়েক নোট রেখে বলে—"এতেই এখন চালাও"।

মানসী চলে গেল। অপূর্ব্ব বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হোল।

আজ মোটেই দেরী করা চলবে না, একবার তিনখানা টেক্কা পেলে হয়,—রাত্রে আচ্ছা ঠকিয়েছে নেকীরাম—মাত্র একখানা সাহেব নিয়ে টাকার জোরে তার অত বড় হাতখানা ফেলিয়ে দিলে—

"শোন?"

"অপূর্ব্ব পিছনে চাইল।

"এ দিয়ে আনন্দ শুকুলের ঋণ শোধ করে দাও।"

অপূর্ব্ব বিস্মিত হয়ে গয়নাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে—

মানসী আনন্দ শুকুলের ব্যাপার জানলো কি করে?—

"থাক, আমি শোধ করে দেব"—

মানসী একটুখানি হাসলো—নিরাশার হাসি।

অপূর্ব্বর সঙ্কোচ, মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হোল বিরক্তিতে, "বিশ্বাস হোলনা বুঝি?"

মানসী একবার মাত্র চাইলো অপূর্ব্বর দিকে—দুই চোখে যেন মিনতি-মিশ্রিত ভর্ৎস .

"হঠাৎ কি হয়েছে তোমার বলতো ?"

"হঠাৎ কিছু তো হয়নি"

অপূর্ব্ব রুখে ওঠে—"তার মানে",—

"মানে—কিছু না, শুধু ভাবছি—একটা কথা"—

"ভয় হচ্ছে বুঝি, ।"

"ভয় ?"

"হ্যাঁ—ভবিষ্যতের ভয় !"

"তার মানে ?"—

"মানে,—খুব সোজা, যা সব মেয়েই ভাবে,—

তা দেশে আমার যা আছে—তাতে তোমার চলে যাবে নিশ্চয়ই ।"—

"কি বলছ তুমি ?"—

অপূর্ব্ব শ্লেষ দিয়ে বলে—"ঠিকই বলছি—ভুল মানুষ একবারই করে। যাক্, তর্ক করার সময় আমার নেই,—তুমি সুধীর বাবুর সঙ্গে চলে যাও ।"

"চলে যাব কেন বলতো ?"

মানসীর স্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে ।—

"কারণ তোমার যাওয়াই মঙ্গল, সারাজীবন ভূতের বোঝা বয়ে বেড়ানোর মত আর বিড়ম্বনা নেই মানসী ।"—

"কি সব বলছো বলতো—হয়তো তুমি নিজেই বুঝ্তে পারছ না।"

"সব দিক্ বিবেচনা করেই বলছি,—তুমি যাও,—তুমি যাও, আমি রেহাই পেতে চাই। আমার সমস্ত সম্পত্তি, সব কিছু আমি তোমায় লিখে দেবো—শুধু তুমি আমায় রেহাই দাও।"—

মানসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কোথায় মিলিয়ে গেল অপূর্ব্ব, চারিদিকে কেবল রাশি রাশি পিঙ্গল বুদ্বুদ,—দু'কানের ভিতর বেজে চলেছে ইঞ্জিনের দীর্ঘতীক্ষ্ণ একটানা বাঁশী—মাথায় অস্বাভাবিক দপ্‌দপানী—হৃৎপিণ্ডের উপর একখানা বিরাট প্রস্তরখণ্ড চাপা পড়েছে যেন।—

একান্ত আগ্রহ ভরে আশ্রয়-আশায় প্রাচীরের দিকে হাত বাড়ালো মানসী, প্রাচীর যেন বহু যোজন দূরে, বহু বিস্তৃত পারবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।—মানসীর দেহটা দুলে উঠলো,—মৃত্তিকা, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র-ভরা পৃথিবী ও যেন এক অব্যক্ত বেদনায় দুলে উঠছে।

অপূর্ব্ব সহসা কাছে এসে বসলো, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল একটা বিস্ময়সূচক অব্যয়—

"আহা"!

একটি মাত্র শব্দে অপূর্ব্ব যেন প্রকাশ করতে চায় তার অন্তরের সমস্ত স্নেহ,—মায়া,—ভালবাসা, মাত্র একটি শব্দ—যেন বিশ্বের সমস্ত বিস্ময়কে কেন্দ্রীভূত করে সবিস্ময়ে বলে এত রক্ত,—এত রক্ত!"

২১

পুনিয়া পঞ্চাশ জন মজুর নিয়ে পূর্ণিয়ায় ফিরলো। ফিরবার পথে কাঠিহারে সে অনেক কিছু কিনেছে। মা বোন-জানকীর জন্যে গয়না ও শাড়ী, বাপের আর ভাইদের জন্যে জামা কাপড় ইত্যাদি। অনেক টাকা খরচ করে, সমস্ত পথটা সে বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে, কিন্তু পূর্ণিয়া ষ্টেশনে নেমে তার বেশ ভয় করতে লাগলো। শ'খানেক কুলী আনার কথা, অথচ সে এনেছে তার অর্দ্ধেক, তার উপর এত টাকা খরচা হয়ে গেল, বাপুজি যদি কিছু বলে? পুনিয়া মনে মনে ঠিক করে ফেলে, সেও গতর খাটায়, মুনাফার উপর তার ভি হিস্যা আছে, রঘুয়াতো হর্ মাহিনা মুলুক মে রূপিয়া পাঠায়। নাঃ ভয়ের কি আছে? বরং বাপুজি এসব দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। না, বাপুজী রাগতে পারে না। বাপুজী নিশ্চয়ই বলবে এ পুনিয়া কো মায়ী, দেখ তেরা লেড়কা কোন চিজ লে আয়া। মায়ী নিশ্চয়ই জবাব দেবে, মেরা লেড়কা তুম-হারা নেহি? পুনিয়ার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের হাসিভরা মুখের ভঙ্গীটুকু।

তারপর জানকী যখন নূতন শাড়ী গয়না পরে কাজ করবে, তখন জুযমণ রঘুয়ার কলিজা ফাটবে। গেল মাহিনায় রঘুয়া কেবল জানকীর

জন্যে একখানা শাড়ী এনেছিল, মায়ী সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে রঘুয়ার বহুকে, বেশ করেছে মায়ী। পুণিয়া কোর্টে বাস পৌঁছে গেল, সঙ্গে তার মনের মধ্যে একটা সংশয় জেগে উঠলো, পুনিয়া মনকে প্রবোধ দেয় ভয় কিসের এত! অন্যায় সেতো কিছু করেনি।

* * *

বাসার পথে একটা কুলিকে দেখে পুণিয়া বলে—

"আচ্ছা-ন?"

কুলিটা তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে পালালো। পুণিয়া অবাক হয়ে যায়, ভাবে তাড়াতাড়ি ফিরেছে বলে মুনেশ্বর অবাক হয়ে গেছে। বাসার কাছে এসে দেখে সামনের বড় আলোটা জ্বালা হয়নি। বাপের উপর চটে যায় পুণিয়া। কোম্পানীর তেলে দরদ দেখিয়ে কি লাভ? বাসাও অন্ধকার। কি ব্যাপার? সব গেল কোথায়।

"মায়ী—এ মায়ী?" বুধন এসে দাঁড়ালো—।

পুণিয়া ঝাঁঝ দিয়ে বলে—

"লালটিন বিলকুল টুট গেল কা?

বুধন ছুটে পালালো—। পুণিয়ার খটকা বাধে।

"বেটা,—বেটা পুণিয়া—ও হো হো,—হায় ভগ্‌বান!" মায়ের কান্নায় পুণিয়ার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, কারুর কিছু হয়নি তো?

"বাপুজী কাঁহা?"

"আরে বেটা সর্ব্বনাশ হো গিয়া—, হায় ভগ্‌বান এ তোম ক্যা কিয়া? হায় মেরা বেটা পুণিয়া।"

পুনিয়া রেগে যায়—"ক্যা হুয়া, ওহিতো বাতাও ?"

পার্ব্বতী এসে মায়ের সঙ্গে কান্নায় যোগ দেয়। তাদের বিনিয়ে-কান্নার মধ্যে অনেক কষ্টে পুনিয়া "বহু" শব্দটি বুঝতে পারে।

তবে, তবে কি জানকী মারা গেছে—মনে পড়ে যাবার দিন সকালে ঘরের কোণে মস্ত সাপ দেখেছিল সে; কিন্তু কাউকে বলেনি। সভয়ে জিজ্ঞাসা করে "বহুকে কি সাপে কেটেছে—"

অকস্মাৎ পুণিয়ার মায়ের কান্না থেমে যায়।—"সে হারামজাদীকে সাপে কাটবে কেন ? সেই তো সকলকে কেটে গেলরে বেটা," আবার কান্না স্থুরু হোল। পুণিয়ার মনে সন্দেহ জাগে কিন্তু বিশ্বাস হয় না,—এতদূর অসম্ভব !

রাগে চীৎকার করে বলে—"আঃ ঠিক্‌সে বাতাও না, ক্যা হুয়া ?"

পুণিয়ার মা কান্না বন্ধ করে হাত মুখ নেড়ে বলে—"ঘুম থেকে উঠে দেখি বহু নেই—রঘুয়াও নেই,—প্রথমে সন্দেহ হয়নি। কিন্তু ঠিকাদার যখন বল্‌লো—"এ পুণিয়াকো মায়ী হামারা হাত বাক্‌সা কি ধার গৈল ?" তখন সব সমঝ্ মে আগেলো। লাডডুমল ঠিকাদারের কুলী ছেদীলাল তাদের বাজারের দিকে যেতে দেখেছে। বেলা ন'টা থেকে লোক ছোটাছুটি করছে—সড়ক্, টিশন সব যায়গায় পাহারা আছে কিন্তু কোন পাত্তা নেই।"

পুণিয়া 'থ' হয়ে যায়। মনে করে মায়ের চুলের মুঠি ধরে বেশ করে দেয় কয়েক ঘা কষিয়ে।

আমি কিছু বললে—আমাকেই গাল দেওয়া হোত এখন কেমন ? তখন বলা হোত তেরা নজর বহুত ছোটা।

পুত্রকে যেতে দেখে মা হাত চেপে ধরে বলে, "তু মত যা বেটা, রঘুয়া ডাকু আছে।"

পুণিয়া এক ঝটকায় মাকে ফেলে দিয়ে—ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো—।

২২

সুমিত্রাকে দিলীপ কোনদিনই দেখতে পারতো না। বড় ঘরে বিয়ে হয়ে তার মেজাজ হয়েছে কেমন বেয়াড়া। কথাবার্ত্তা চালচলন সবেতেই জমিদার বধুর গর্ব্বই যেন প্রকাশ করতে চায়। ভারীতো জমিদার ! অমন জমিদার সে অনেক দেখেছে।

দিলীপ যদি জানতো সুমিত্রা হঠাৎ আস্‌বে তবে সে সাবধান হোত নিশ্চয়ই। দিনকতক কোথাও চলে গেলেও চল্‌তো। গীতাটা বড় বোকা। এত করে সাবধান করা সত্ত্বেও বইখানা সাম্‌লে রাখলো না। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে গীতার উপর। একটা সামান্য ভুলে সমস্ত কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দিলীপ মনে মনে হিসেব করে দেখে—যতবার বিপদ এসেছে, ততবারই সেটা একরকম ডেকে এনেছে মেয়েরাই, অথচ হাজারবার সাবধান কর্‌লেও তারা নিজেদের গোঁ ত্যাগ করতে পারে না। মেয়েদের এটা মস্ত দোষ, নিজেদের কিছুতেই খাটো করতে চায় না, ভাবে পুরুষদের চেয়ে তারা বেশী বোঝে। একে একে হেনা থেকে গীতা পর্য্যন্ত অনেকেরই মুণ্ডপাত করে চল্‌লো দিলীপ।

চাকরী অবশ্য মামাবাবু করে দিয়েছেন, মাইনে যৎসামান্য কোনরকমে তার হাত খরচ চলতে পারে, অথচ উদয় অস্ত খাটুনী, পদবী—শিক্ষিত—খালাসী। বড়বাবুর ভাগিনেয় হিসাবে যারা তাকে সমীহ করে চল্‌তো আজ তারাও তাকে গ্রাহ্য করে না। সুবোধ ঘোষ সেদিন সামান্য একটা

ভুলে কি রকম অপমানটাইনা করলো তাকে। বলে কিনা "রিমলেস চলবেনা এখানে।"—নাঃ এ-কাজ সে ছেড়ে দেবে। সকাল না হতে শয্যার সুখ-স্পর্শ ত্যাগ করে তাকে ছুটতে হয় মাঠে মাঠে। সবদিন আহারও জোটে না—কে তার জন্য সাত সকালে রেঁধে দেবে? মামাবাবু তবুও দু'দিন রান্নার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন, সে নিজেই বন্ধ করিয়েছে, শ্যামত্রার গজ্‌গজানি কে শুনবে?

মামাবাবুর উপর দিলীপের ভক্তির মাত্রা বেড়ে যায়। ওঃ কি বিপদেই না পড়তো সে, যদি মামাবাবু বলতেন এখানে তোমার স্থান হবে না তবে? সেবার ছোট পিসিমার বাড়ীতে একটা কাণ্ড ঘটতেই তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন "তুমি বাবা আজই চলে যাও"। ভাগ্যিস আংটিটা ছিল, তাই মান বজায় রাখতে পেরেছিল—ছোট পিসির মুখ সে আর জীবনে দেখবে না।

দিলীপ মন দৃঢ় করে—আর মেয়েদের খপ্পরে সে যাবেনা, কিছুতেই না। এমন দৃঢ়তা সে অনেকবার দেখিয়েছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে কেমন হয়ে যায়—, এখানেই তো যত দুর্ব্বলতা। সময় সময় নিজের উপর তার বিতৃষ্ণা জন্মে। লেখাপড়ায় সে তো মন্দ ছিল না বরং সাধারণের চেয়ে অনেকখানি উঁচুতেই ছিল। ম্যাট্রিকে দুটো 'লেটার' তাদের স্কুলে আর কেউ পায়নি। কলেজে পড়বার সময় মিত্তির বাড়ীর মেয়েটাই তার সর্ব্বনাশ করলে। লেখাপড়া গেল, সম্মান খোয়ালো, শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়া করেও নিস্তার নেই। সে যদি পথ না দেখাতো তাহলে নিশ্চয়ই—এতখানি সাহস তার হত না কোনদিন। এই বয়সে নিশ্চয়ই সে এখন কলেজে পড়তো, এখন তো তার এম, এ পড়ার সময়। সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর চটে যায় দিলীপ।

বেশ করেছে—শেফালী রাণু গীতা সকলকে ঠকিয়ে। গীতা! গীতার জন্যে দিলীপ চিন্তিত হয়। এক সঙ্গে জেগে ওঠে ভয় আর ঘৃণা। আর নয়, আর ওপথে নয়।

একটু দূরে কুলিরা হিউম পাইপ বসাচ্ছে। দিলীপের উপর পড়েছে তদারকের ভার। নাঃ কাজের যায়গা ছেড়ে দূরে থাকা ঠিক নয়, যদিও সে এসব কাজের কিছু বোঝে না। একটা বিড়ি ধরিয়ে দিলীপ কুলীদের কাছে এগিয়ে চল্‌লো।

দিলীপের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে,—সুপারভাইজার আশুতোষ দাস্ কখন এলো—। এত অন্যমনস্ক হওয়া ঠিক নয়। চুপ করে সে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে—। সুপারভাইজার জিজ্ঞাসা করলেন—"কতজন কুলি কাজ করছে"।

দিলীপ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। কুলীদের সে গণনা করেনি অথচ এটা তার কর্ত্তব্য। ভয়ে ভয়ে বল্লে—"জন পঞ্চাশ হবে"

"নোট বুক দেখি।"

কি লিখে সুপারভাইজার বল্লেন "এটা নিয়ে এস, এস, কে, পির কাছে যাও.—ফরটিনাইন ব্রিজের "রং" ডেসপ্যাচ হয়েছে—।" দিলীপ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক এতক্ষণে একটা কাজের ভার পেল সে। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে কি ভাল লাগে।

* *

ষ্টোর কিপার নোটবুক পড়ে ডাকলেন—"তারাপদ ও তারাপদ।

তারাপদ ছুটে এসে বলে—"আজ্ঞে!"

"বলি চাকরী করবে না বাড়ী রওনা হবে হে—"?

তারাপদ মাথা চুলকোয়।

"যাও এখুনি লরী নিয়ে ফরটিনাইন ব্রিজের মেটিরিয়েল ডেলিভারী দিয়ে এসো,—যা, না দেখবো, তাই ভুল করে বস্‌বে, যত সব—" নোটবুক হাতে তারাপদ বাইরে যেতে চায়।

বলি নোটবুকটা কি তোমার যে হন্তদন্ত হয়ে নিয়ে চল্‌লে? আবার হাঁ করে দাঁড়ালে কেন হে?

তারাপদ নোটবুক দিলীপকে দিয়ে গমনোদ্যত হতেই স্টোরকিপার খেঁকিয়ে ওঠেন - "কি পাঠাবে বলতো?"

তারাপদ নিরুত্তর।

"নোটবুক থেকে টুকে নাও বুঝলে?"

তারাপদ বোকার হাসি হেসে টুকে নিয়ে চলে গেল।

"দাঁড়িয়ে কেন বসুন না দিলীপবাবু!"

দিলীপ একটা টুলে বসে পড়লো।

"আমার ষ্টোরে জুটেছে যত সব গবেট আর নিরেটের দল বুঝলেন কিনা? কারুর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই যত সব—"।

ডাক্তার গুহের বাসার সামনে লরীতে জিনিষপত্র বোঝাই হচ্ছে। শোভনার দাদা কলকাতায় মামলা দায়ের করেছেন তাই গুহ যাচ্ছেন কাজে জবাব দিয়ে।

গুহকে জব্দ করবার জন্যে অনেকে চেষ্টা করেছিল কেবল নেপিয়ারের জন্যেই শেষ পর্য্যন্ত কিছু হয় নি। নেপিয়ার ডিসচার্জ লেটার ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেছিলেন "তুমি তাকে বিয়ে করবে জেনে সুখী হলাম, 'রেজিগ্‌নেসন' দাও আমি য়্যাক্‌সেপ্ট্‌ করবো।" অন্তরালে বাঙালীবাবুর দল নেপিয়ারের মুণ্ডপাত করতে ছাড়ে না—"অন্য কেউ ইঞ্জিনিয়ার থাকলে তারা গুহকে দেখে নিতো।"

ডাঃ গুহ জিজ্ঞাসা করলেন—"দিলীপ কলকাতায় যাবে নাকি ?"

দিলীপ জানালো সে চাকরী পেয়েছে। "বেশ বেশ আচ্ছা, কলকাতায় গেলে দেখা করো সার্কুলার রোডের বাসাটা চেনো নিশ্চয়ই"

দিলীপের মনে সংশয় জাগে ডাঃ গুহ বেঁচে গেল কিন্তু তার কি হবে ? আজ কালের মধ্যেই তাকে জানতে হবে সব।

* * * * *

নিঃশব্দে বাগানে প্রবেশ করে – দিলীপ ডাকে "রাণু !"

রাণু থতমত খেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজ পড়ে মাটীতে,—দিলীপ সেটা তুলে নিতেই রাণু বলে "তোমার পায়ে পড়ি পড়ো না দিলীপদা।"

দিলীপ আশ্চর্য্য বোধ করে, তার পরিত্যক্ত আসন কে অধিকার করলো।

"কে লিখেছে ?"

"বিল্টুদা।"

"বিল্টু।—সে আবার কে ? ও সেই ছেলেটা !"

দিলীপ হেসে ফেলে, ক্লাস এরিটের ছেলে প্রেমপত্র লিখতে শিখেছে। অগ্রগতি হয়তো এরই নাম ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত দিলীপ কিছুই জানতো না অথচ বিল্টু ক্লাস এয়িট থেকে - দুনিয়া এগিয়ে চলেছে যে—!

"পড়বোনা একটা কাজ করে দিতে হবে কিন্তু ?"

"বল ?"

গীতাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলীপের কথায় রাণু প্রতিবাদ জানায়—"ছিঃ এ অসভ্যপনা আমি পারবোনা।"

"না পারো চিঠি পাবে না।"

দিলীপ একটু অগ্রসর হতেই আব্দারের স্বরে রাণু বলে "আচ্ছা আচ্ছা। বাব্বা, একটুতেই মেজাজ গরম হয়ে যায় যে।"

দিলীপ ফিরে এলো—।

"কিন্তু এটা জেনে তোমার কি লাভ বলতো ?"

"লাভ যাই হোকনা ?"

"বুঝেছি—, গীতার পেটে পেটে এতো।"

মুখে কাপড় দিয়ে হেসে ওঠে রাণু।

দিলীপ বলে "তোমরা কোন মেয়েই কম যাওনা ?"

রাণু চটে ওঠে—"তোমাদের মত নই বুঝলে মশাই—?"

"নিশ্চয়ই—এখন বিশ্টুময় দুনিয়া কিনা ?"

রাণুর ভয় হয়। চিঠিখানা তখনও দিলীপের হাতে।

"রাগ করলে ভাই দিলীপদা ?"

"আর আদরে কাজ নেই,—কাজ শেষ হলে চিঠি দেব, নইলে মজা টের পাবে—"

"বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি ?"

"না"

"তোমরা আমাদের কি মনে কর বলতো ?"

রাণু বেশ ভারিক্কে চালে কথাগুলো বলে ফেলে। দিলীপ হেসে ওঠে,—মেয়েদের মুখ থেকে পাকা পাকা কথা শুনলেই তার হাসি পায়, তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেয় "ফানুস—ফানুস কাকে বলে জানো,—যার ভেতরে কিছু নেই, বাইরে থেকে দেখতে কিন্তু বেশ"—রাণু রাগ করে হন হন করে চলে গেল—।

২৩

অলোক স্থির করতে পারেনা কোনখান থেকে আরম্ভ করবে সে তার আজকের ডায়েরী। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত একটার পর একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গিয়েছে—প্রতিটিরই বিশেষত্ব আর অভিনবত্ব অসাধারণ।

সকালে সানাইয়ের মধুর সুরের মাঝে পিন্টুর আকুল আহ্বান—“শিগ্‌গীর চলুন কাকা বাবু, বাবা কেমন করছেন”।

রমণী বাবুর মুমূর্ষু অবস্থা, সদ্য আগত ডাক্তার [illegible] দেব রায়ের সঙ্গে আলাপ, চিকিৎসকের আপ্রাণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা, রমণী বাবুর মৃত্যু।

শব-যাত্রাকালে পথের মাঝে শান্তবাবুর সাক্ষাৎ মাথায় পাতার মুকুট,পরনে ঘাগরার আকারে শতছিন্ন রঙীন শাড়ী। অপরূপ বেশে বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিশালবপু শান্তবাবু উন্মত্ত ভঙ্গিতে নৃত্য গীত সুরু করেছেন—

“যাবোনা, যাবোনা, যাবোনা ঘরে, পাগল করেছে মোরে মনোচোরে!” — এক দুই, এক দুই, সাড়েতিন এং— তাল কেটে গেল.”।

রমণী বাবুর স্বর্গারোহণে শান্ত বাবুর উল্লাস,—

কিন্তু পুষ্পবৃষ্টি না হওয়ায় দেবরাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ। “হ্যালো দেবরাজ “বি-কুইক” ফুল ফেলো—ফুল ফেলো, থরে থরে কর বরিষণ অম্লান মন্দার কুসুম, রমণীদা, রমণীদা যাচ্ছেন, সহি বহু ক্লেশ, আদরে বরিয়া লহ হে দেবেন্দ্র।... রাজ্যহারা বনচারী রাজা মান্ধাতা, নল, অথবা শ্রীবৎসের ন্যায় শান্তবাবু ঊর্দ্ধমুখে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অভিনয় করে গেলেন ঠিক যাত্রার আসরের মত।

শববাহী দল এগিয়ে যেতে, কাণে এলো শান্তবাবুর ঝুমুর গান

—কাঁদিয়া দ্রৌপদী বলে, যাবোনা যমুনা জলে, বসে আছেন রাবণ রাজা, দিদিলো লাজে মরি।”—

শ্মশান—শ্মশানে বিন্তির প্রবল আপত্তি—“বাবার মুখ যে পুড়ে যাবে গো”

নয়না দেবী নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেল্‌লেন রঙীন শাখা, মুছে দিলেন সিমন্তের সিন্দুর রেখা। কি বিশ্রী—কি ভীষণ দৃষ্টি কটু এই বিধবার বেশ

একজন বিখ্যাত চিত্রকরের একখানা ছবির কথা মনে পড়লো অলোকের। কি যে নাম ছবিটার? ‘ব্যর্থতা কিংবা ‘নিরাশা’। শিল্পীর উপর অলোকের শ্রদ্ধা জাগে, আজ সে বুঝ্‌তে পারে ছবিখানার সার্থকতা কতখানি, কত বড় গুণী সেই শিল্পী। ছবিখানা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, সদ্য বিধবা নয়না দেবীর মাঝে।

সমস্ত বিয়োগান্ত করুণ-দৃশ্যকে পরাজিত করে অলোকের মনে পড়ে কিছুক্ষণ আগেকার একটা ঘটনা। ছিঃ অমন করে হঠাৎ ভেতরে যাওয়া কোন মতেই তার ঠিক হয়নি। কি ভেবেছেন তাঁরা?

‘একটা নিরেট একটা অপদার্থ নিশ্চয়ই।’

কিন্তু কি করবে সে,—ঘুমের ঘোরে কথাটা কি ঠিক মত বোঝ্‌বার তার শক্তি ছিল? সমস্ত দিন অনাহার আর অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রমের পর চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। হঠাৎ নিজের নামটা কাণে যেতেই না পর্দ্দা ঠেলে সে ঢুকে পড়্‌লো পাশের ঘরে!

ডাক্তার রায় বেশ লোক, ঘটনাটিকে বেশ সহজ ভাবেই নিয়ে বল্লেন —“আপনার নাম অলোক বাবু বুঝি?”

অলোকের বেশ লাগে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ঐ মেয়েটির নামের সঙ্গে তার নামের সামঞ্জস্য দেখে। সত্যি এতখানি আশ্চর্য্য মিল কি করে সম্ভব হল? এখনো তার চোখের সামনে ভাস্‌ছে—চকিতে দেখা এক

তরুণীর সলাজ মুখ-ছবি,—রংটা ফর্সা নয় কিন্তু মুখখানা বেশ। অলোক হেসে ওঠে—দূর, এসব ভেবে কি লাভ।

যা খুসি মনে করুন তাঁরা, সে আর ডাক্তার রায়ের বাসায় যাচ্ছেনা, কখনো না।

'দূর পাতাটা সাদাই থাক মাথা মুণ্ডু কি লিখবো ছাই!'

খাতা রেখে অলোক শুয়ে পড়লো।—

আজ মহাসপ্তমী, কল্পনায় সে দেখে পূজাবাড়ীর সমারোহ দর্শনার্থীর ভীড়। সহকর্ম্মীদের কথা মনে পড়ে—আত্মীয় স্বজন দেশ বাড়ী পেয়ে—অন্ততঃ এই স্বল্প কয়টি দিন তারা আনন্দে কাটিয়ে আস্‌বে—কিন্তু সে! অলোকের মুখখানা কঠিনতর হয়ে ওঠে—

সে কারুর নয়—তারও কেউ নেই।—বেশ আছি। এই বেশ—এই বেশ—নিঃঝঞ্ঝাট নিঃসঙ্গ জীবন।

আজ সপ্তমী। আনন্দের দিন, কিন্তু কোথায় আনন্দ? আনন্দময়ীর আগমনের দিনে কেন ওঠে ক্রন্দনের করুণ রোল,—কোন অপরাধে অপরাধী বিত্তি আর তার ছোট বোনেরা! সব মিথ্যা, সব ভাঁওতা কেবল বুজরুকি, চার্ব্বাক আর বিদ্যাসাগরের কথাই ঠিক।

তন্দ্রা-বিজড়িত চোখের সামনে আবছায় ফুটে ওঠে একখানা মুখ।

২৪

গয়া কাশী এলাহাবাদ মথুরা ঘুরে অশ্বিনীবাবু এসেছেন বৃন্দাবনে। যমুনাদেবীর স্বাভাবিকতায় তিনি অনেক খানি আশান্বিত, মস্তিষ্ক বিকৃতি বুঝি কেটে গেল।

বৃন্দাবন যমুনাদেবীর খুব ভাল লেগেছে—। সময় সময় তিনি বলেন—"দেখ মেয়ে দুটোর ব্যবস্থা করে আমরা চলে আসবো এখানে!

অশ্বিনীবাবু উৎসাহ দেন—"চাকরীর মেয়াদ্‌তো আর দু'বৎসর, চিরকাল বিদেশে কাটিয়ে দেশের অজ পাড়া গাঁয়ে কি মন বসবে, তার চেয়ে বৃন্দাবন মন্দ কি? বৃন্দাবনের প্রতি কিন্তু শ্যামলীর আক্রোশ অসীম।

"তীর্থ স্থান না ছাই, যত সব ভণ্ডের ব্যাপার"!

সেদিন সন্ধ্যা-আরতির সময় সে লক্ষ্য করেছে ভক্তবৃন্দের দর্শনেন্দ্রিয় কোথায় নিবদ্ধ ছিল। বুলুর সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা কিন্তু শ্যামলী তাকে রাত্রে সব বলেছে। অথচ এসব কথা পিতা মাতাকে বলা চলেনা। কেবল নানা অছিলায় তারা কাটিয়ে চলে সন্ধ্যা-সকালের পূণ্যক্ষণ। অশ্বিনীবাবু স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান—শেঠ শাহজী-লালাবাবু ইত্যাদির বিখ্যাত মন্দিরে।

সপ্তাহ কালের মধ্যে বুলু ও শ্যামলী যমুনার জল স্পর্শ করেনি অথচ যমুনা স্নান একান্ত কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। মাসীমার কথায় অনেক কষ্টে বুলু শ্যামলীকে যমুনা স্নানে রাজী করিয়েছে শ্যামলী পরিষ্কার বলে দিয়েছে "এই প্রথম আর এই শেষ, যোগ-যাগ যাই হোকনা কেন কারুর কথা আর রাখবোনা"।

শেষ রাত্রি—, আধো আলো অন্ধকারের মাঝেই যমুনাতটে স্নানার্থীর—লোকারণ্য জমে উঠেছে। যুগ-যুগান্তের গৌরব-বাহিনী যমুনা স্বীয় মাহাত্ম্যে আজিও অম্লান। কিন্তু কেন এই ভক্তি প্রীতি? হয়তো ভক্ত শুধু মানব মনের বহিরাবরন আসলে যমুনা মানুষ কে আকর্ষণ করে করুণ কাতর কণ্ঠে যেন বলে যায়—ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস—শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব, উত্থান পতন, তারপর তথাগতের প্রেম ধর্ম্মের বিকাশ—বৈদেশিক আক্রমণ শক্‌ হুন্‌ মোগল পাঠান—উপনিবেশ

রাজ্য সাম্রাজ্য—। আবার বিদেশীর পদার্পন সাধু সজ্জন বনিকের বেশে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বাংলার দাবানল সমগ্র ভারতকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল— সে দুর্দ্দিনে কেউ কাঁদলো না কেউ পরামর্শ দিল না। বিভীষণ, জয়চাঁদ, মীরজাফরের শয়তানীতে. কেবল যমুনা ফেলেছ দীর্ঘশ্বাস। যমুনা ভারতের শাশ্বত সাক্ষী তাই মানুষ ছুটে যায় যমুনার তটে—তর্পনের উদ্দেশ্যে আর ভণ্ড ছোটে পুণ্য প্রয়াসী স্নানার্থীর বেশে কলুষিত কামনা চরিতার্থের আশায়।

শ্যামলী বলে "যেখানে ভীড় কম সেই ঘাটেই নামবো দিদি"।

অশ্বিনীবাবু এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত ছোটাছুটি করলেন কিন্তু শ্যামলীর কোন ঘাটই মনঃপূত হয় না। অন্ধকার যত দূরীভূত হয় ততই বৃদ্ধি পায় মৃদঙ্গ মন্দিরা, করতালের সঙ্গে কীর্ত্তনিয়ার দল।

শ্যামলী বিরক্ত হয়ে ওঠে,—"যে ঘাটেই হোক ডুব দিয়ে চল বাবা" অশ্বিনীবাবু ইতঃস্ততঃ করেন, এতক্ষণ এত চেষ্টা কি পণ্ড হবে—আর একটু না হয় দেখি!

"রাধে!"

অশ্বিনীবাবুর পিছনে এক আলখাল্লাধারী বাবাজী দণ্ডায়মান। অশ্বিনীবাবু একটু এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে বাবাজী বলে উঠলেন —"বলি অ-রাধে – শুনছো!"

"তোমরা এখানে দাঁড়াও সাধু বোধ হয় আমাকেই ডাকছেন্ শ্যামলী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'যমুনায় স্নান না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো একেবারে!

বুলু শান্তনা দেয়—"একদিন বৈত নয়।"

এত জায়গা থাকতে মায়ের মন বসলো বৃন্দাবনে-। শ্যামলী চুপ করে যায় অশ্বিনীবাবু বাবাজীকে নিয়ে কাছে এসে পড়েছেন।

"সুদীর্ঘকাল আমি লক্ষ্য করলাম রাধে—তুমি যেন কি অন্বেষণে ব্যাপৃত। কৌতুহল হল, এখানে'তো লজ্জার বালাই নেই' আর কেনই বা থাকবে বল? এখানে একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র ভিন্ন সবই রাধাময়। জয়.—প্রেম সুন্দর—প্রেম দাও প্রভু। এ তুটি যমজ নাকি রাধে—?"

অশ্বিনীবাবু বুলু শ্যামলীর পরিচয় দান করলেন।

"বেশ বেশ। প্রেমসুন্দর তোমাদের মঙ্গল করুন।—আহা তোমাদের দেখে—আমার সেই যুগের কথা মনে পড়ছে—যখন কানুর বাঁশরী-তানে যমুনা উজান বইতো। তা' দাঁড়িয়ে কেন যমুনার কোলে মনের কালী ধুয়ে ফেল। লজ্জা কিসের গো। আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি তোমরা জলে নাম আমি অপেক্ষা করছি, তোমাদের স্নান-ক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এ ঘাটে কেউ নামবেনা।"

"না, না আপনাকে আর কষ্ট করতে হবেনা" অশ্বিনীবাবুর কথায় বাবাজী হেসে উঠলেন—

"কষ্ট? বলি কষ্ট কিসের গো। শ্রীবৃন্দাবনে কি কষ্ট বলে কিছু আছে নাকি? মায়ায় জড়িয়ে আছ তাই বোধশক্তি খুইয়েছ—যাও বিলম্ব করো না"

* * *

"দেখ্ ভাই দিদি, ব্যাটা আলখাল্লা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, খসবে আজ বাবার বেশ কিছু। বুলু বলে ঐ দেখ লোক গুলো সব সরে যাচ্ছে, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই এখানকার খুব নামজাদা।"

"তাড়াতাড়ি ধর্ম্মশালায় যেতে পারলে বাঁচি ভিজে কাপড়ে এতটা পথ"—হঠাৎ শ্যামলী চীৎকার করে উঠে—, তার চারপাশে যেন অসংখ্য সাপ।

তীর থেকে বাবাজী চিৎকার করে বলেন—"ভয় নেই, ওরা অনিষ্ট-কারী নয় নিশ্চিন্ত মনে স্নান কর।"

শ্যামলী তাড়াতাড়ি বস্ত্র সংযত করে ফেলে—

"সন্ন্যাসী না ছাই, আমাদের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে আছে কখন ডুব দিয়ে উঠবো। যত সব মায়ের কাণ্ড কারখানা।"

কচ্ছপের দল বুদ্বুদ্ ত্যাগ করে চলে যায়।

"আপনার অনুগ্রহে বেশ আরামে স্নান করা গেল।

"কৃষ্ণ-কৃষ্ণ সবই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আমার আর কতটুকু শক্তি" রাধে!"

"কোথায় আপনার দর্শন পাবো?"

শ্যামলী ক্ষুব্ধভাবে পিতার পানে চেয়ে থাকে—।

এখন কি কথা বলার সময় – কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনা। ইতিমধ্যে পাণ্ডার দল তাদের বেষ্টন করে ফেলেছে।

"যাওগো এখন কিছু হবেনা"

জনৈক পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করে—"এরা কি বাবাজীর আখড়ার?"

"বলি আমার আখড়ার কে আর কে নয়, তাতো আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। তুচ্ছ প্রশ্ন কিন্তু উত্তর কঠিন এর মীমাংসা প্রেম-সুন্দরই জানেন। এখন যাও, পাওনা গণ্ডা আমার কুঞ্জ থেকেই নিও।"—"চল রাধে আমার কুঞ্জ দর্শন করে, ক্ষণেক বিশ্রাম নিয়ে তারপর ধীরে সুস্থে" ধর্ম্মশালায় যেও। বলি উঠেছ কোথায়?"

"এঁ্যা—ঝুন ঝুনলালের ধর্ম্মশালায় সে যে একপ্রান্তে!"

তাড়াতাড়ি সেখানেই উঠেছি।"

"শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন অসুবিধে নেইতো?"

"বিদেশে অসুবিধে হলে কি আর করছি বলুন?"

বল কি রাধে? ভগবান যে ভক্তাধীন, বিশেষ করে এই প্রেম-বৃন্দাবনে—, এখানে ভক্তের কষ্টেতে যে প্রভুর অপমান।"

সিক্তবস্ত্রে কোথাও যাবার ইচ্ছা অশ্বিনীবাবুরও ছিল না কিন্তু বাবাজীর অনুরোধ। শ্যামলী ক্রুদ্ধ রোষে ফুলতে থাকে।

* * *

কৃষ্ণকুঞ্জ—কৃষ্ণদাস বাবাজী—দুইই বৃন্দাবন বাসীর বিশেষ পরিচিত।

"ঐ যে দেখছ কুঞ্জ, ঐ ওরই নাম কৃষ্ণকুঞ্জ। আমারই স্থাপিত বুঝেছ রাধে! সংসার পাপে পূর্ণ, জগৎ আজ প্রেমহীন তাই গ্রহণ করেছি প্রেম বিতরণের ব্রত।"

কৃষ্ণকুঞ্জ প্রাচীর বেষ্টিত দ্বিতল অট্টালিকা, সম্মুখে সুন্দর একটি ক্ষুদ্র মন্দির চতুর্দ্দিকে ফুটেছে অজস্র ফুল।

"তোমাদের জীবন ধন্য হোক, নয়ন ভরে দর্শন কর আমার আরাধ্য দেবতা প্রেমসুন্দর। ভারতের কোথাও এই চিত্ত বিমোহন বিগ্রহ স্থাপিত হয়নি।"

বিগ্রহের অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায়না,—

শ্রীকৃষ্ণের পদতলে উপবিষ্টা শ্রীরাধা চেয়ে আছেন ঊর্দ্ধ-মুখে, শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করছেন তাঁর হাত দুখানি। বোধ হয় কৃষ্ণনগরের শিল্পী গড়ে গিয়েছে এই মূর্ত্তি। বাঙালী ভিন্ন অন্য শিল্পী এমন কমনীয় রূপদানে অক্ষম। সকলে প্রণতি জানায়।

"ললিতে বিশাখা এদিকে এসো, কুঞ্জে যে অতিথি এসেছে গো"।

দুটি সুন্দরী যুবতী ছুটে আসে—একজন বর্ষণ করে শান্তি জল অপরে বিতরণ করে চরণামৃত।

"এবার যাই বেলা হয়ে যাচ্ছে বাবাজী"

"বেলাতো বয়েই যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ কি কামিনীকাঞ্চনের মোহে সেদিকে একবারও দৃকপাত করে রাধে"।

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় কয়েকটি নারী সঙ্গে এক সুঠাম সুন্দর নধর-কায় বালক।

যমুনা দেবী এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন বালকের দিকে, তাঁর প্রাণের মধ্যে জেগে ওঠে খোকার স্মৃতি।

বালক চলে যায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে, যমুনা দেবীর বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটানা দীর্ঘশ্বাস।

যমুনা দেবীর হাবভাব অপরের চোখে না পড়লেও কৃষ্ণদাসের শ্যেনদৃষ্টি এড়ায়নি।

ললিতা, শ্যামলীর হাত ধরে বলে—"কুঞ্জে এসে কি অভুক্ত অবস্থায় যেতে আছে সখী।

বিরক্তিতে শ্যামলীর মন বিষিয়ে ওঠে, হাত টেনে নিয়ে বলে,—

"বাবা আর কত দেরী করবে"

"এখন যাই বাবাজী, বৈকালে আসবো।"

কৃষ্ণদাস উত্তর দেন—"তাই এসো, আমরা তোমাদের পথ চেয়ে থাকবো রাধে।"

কুঞ্জ দুয়ারে বিদায় বেলায় কৃষ্ণদাস যমুনাদেবীকে লক্ষ্য করে বলেন "প্রাণে তোমার জ্বলছে অশান্তির আগুন, তা আমি জানি রাধে। বৃথা চক্ষু লজ্জায় নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করোনা—এখানে এসো শান্তি পাবে। তোমার গোপাল এখানেই আছে প্রেমসুন্দরের বুকের মাঝে।"

'যমুনা দেবী বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন'।

২৫

রমণীবাবুর বাসার জিনিষ পত্র কিনে দিয়ে মেসে এসে অলোক দেখে ঠাকুর চাকর বেড়াতে যাবার উদ্যোগ করছে। অলোক চটে ওঠে। সামান্য আস্কারা পেলেই এরা মাথায় উঠতে চায়! পূজার কাপড় জামা বক্‌শিষ কে না সে দিয়েছে এদের, অথচ তাকে অভুক্ত রেখে এরা বেড়াতে যাবার জন্য ব্যস্ত, বেইমান স্বার্থপর সব!

কঠিন গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে অলোক বলে, "ঠাকুর দেখ্‌তে সন্ধ্যায় যাবে।"

ঠাকুর, চাকর, মাথা নিচু করে চলে গেল।

টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা তুলে অলোক বলে – "ঠাকুর, ডাক্তার বাবু কখন এসেছিলেন?

ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে সব জানায়, প্রাণের মধ্যে তার তখন দারুণ অশান্তি, বাবু যদি খেতে চান তবেই মুস্কিল, আহার্য্য কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই, ডাক্তার বাবু তাকে কি বিপদেই ফেল্‌লেন।

অলোক দুটো টাকা দিয়ে বলে, যাও ঠাকুর দেখে এসো, ও-বেলাতেও এখানে খাবোনা।

ঠাকুর নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেল। ভগবান খুব মুখ রেখেছেন।

অলোকের মন অস্বস্তিতে ভরে-ওঠে, আজ আবার খেতে যেতে হবে ডাক্তারের বাসায়, কালকের ঘটনাটুকু বুকের মাঝে যেন খোঁচা দিতে থাকে। ভাল করে না শুনে কি বেকুফিই না করেছে সে। কিন্তু কি করে জানবে যে ডাক্তার-শ্যালিকার সঙ্গে তার নামের অতখানি মিল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর উপর অলোক বেশ একটু চটে ওঠে।

বোনের নামতো অলোকা, কিন্তু আদর করে অলোক নামে না ডাকলেই কি চলেনা !

শেষ পর্য্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ে রমণী বাবুর উপর নিজেত গেলেন স্ত্রী কন্যাদের পথে বসিয়ে সেই সঙ্গে তাকে ও অপদস্ত হতে হল। রমণী বাবুর অসুখ না হলে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের তার কোন দরকারই ছিল না।

ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই কিছু মনে করেন নি। তাঁর স্ত্রী হয়তো একটু বোকা ভেবেছেন, কিন্তু ঐ তরুণী।

নাঃ, আজ আর সে খেতে যাচ্ছে না! রাত্রে খেতে বসা অনেক সহজ কিন্তু দিনের বেলায় সম্পূর্ণ অপরিচিতার সামনে! না কিছুতেই সে যাবেনা।

মনে পড়ে বন্ধুর বাড়ীতে সুক্তোটা সে খেয়েছিল শেষের দিকে যার ফলে অন্তরালে উঠে ছিল চাপা হাসির ফোঁস ফোসানী। সমস্ত দিনটা সে কাটিয়ে দেবে সহরের সব কয়টা ঠাকুর দেখে, না হয় চলে যাবে কাঠিহারে। হ্যাঁ কাঠিহারই শ্রেয়ঃ সেখানে আজ রাত্রে থিয়েটার হবে।

মেস থেকে বাইরে আসতেই দেখা হয় কালীচরণের সঙ্গে, মা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন,—আপনার কি দেরী আছে বাবু?"

"চল এখুনি যাচ্ছি।"

সদ্য মাজ্জিত পোষাকে সজ্জিত অবস্থায় মিথ্যা বলতে গলায় বাধে। পথের মাঝে অলোক নিজেকে তালিম দিয়ে নেয়।

নাঃ এত ভয় কিসের! কোন দিকে না চাইলেই হোল। কাকে সে লজ্জা করবে, ঐ মেয়েটাকে—রামঃ। কালকের ব্যাপারটা একটা

দুর্ঘটনা মাত্র। নিশ্চয় দুর্ঘটনা না হলে কোনো ভদ্র লোকই অমন ভাবে অপরিচিতার সামনে যেতে পারে কি? "আসুন অলোক বাবু নমস্কার। মনে করলাম এখনো বোধহয় আপনি ফেরেননি—"। প্রতি নমস্কার দিয়ে অলোক বলে,—"বড্ড দেরী হয়ে গেল।" "ছুটীর দিনে এমনিই হয়।"

খেতে বসে বসুদেব রায় বলেন,—"বাড়ীতে বলছিল ঠাকুর দেখতে যাবে, আমিতো মশাই নোতুন এসেছি গাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে কি?" "এক্কা খুব পাওয়া যাবে।" এক্কার নামে ডাক্তার প্রতিবাদ জানান — না মশায় এক্কা টেক্কা চলবেনা, গেল বৎসর আগ্রায় সে কি বিভ্রাট, আর একটু হলেই মাসী মাকে তাজমহল দেখতে হোত না, যেতে হোত হাঁসপাতালে।"

অলোকা লুচি নিয়ে আসে, অলোক আপত্তি জানায়—।

ডাক্তার বলেন, "লজ্জা করবেন না বুঝলেন, অবশ্য আমি বললেই যে আপনার লজ্জা যাবে তা-নয়, দাও অলোকা ও কখানা দিয়ে দাও।"

বাধ্য হয়ে অলোককে খেতেই হয়। শেষে পায়েসের সময় সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে।—"পেটে এতটুকু জায়গা নেই।" "তা কি হয়, আজ বছরের একটা দিন, না হয় একটু বেশী খেলেন।" আহারান্তে পান নিয়ে আসে ডাক্তারের দুই বৎসরের শিশু পুত্র সুদর্শন। অলোক হাত পেতে বলে "দাও।" "ও হাতে দেবেনা, হা করুন মুখে দিয়ে দেবে।" অলোক সুদর্শনের হাত চেপে ধরতে সে বলে ওঠে "গা-গা-।"

"জানেন। চশমা থাকলেই গা-গা- অর্থাৎ কাকা।"

হঠাৎ অলোকা এসে বলে,—"দিদি বল্লেন এ-কয়দিন এখানেই খাবেন" অলোক বসুদেব বাবুর দিকে চায়,—"আমার নেমন্তন্ন নয়

মশাই, স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর আদেশ এনেছেন ছোটরাণী,—" অলোকা ছুটে পালালো।

অলোক মাথা নিচু করে ভাবে কি করা যায়—এখানে আসতে খেতে তার বাধ বাধ ঠেকে, অথচ কোন অজুহাতই খুঁজে পায় না।

অলোকার পুনঃ প্রবেশ—"দাদাবাবু আজ কি ঠাকুর দেখতে যাওয়া হবে ?—দিদি জিজ্ঞেস করলেন ?" "অলোক বাবুকে বল ?" অলোকা চলে যাওয়ার পর অলোক বলে,—"কখন গাড়ী আনতে বল্‌বো ?" "সন্ধ্যার মুখে হলেই ভাল হয় না ?" "আচ্ছা।"

সন্দেহাতীত সাফল্যের সম্ভাবনায় সদ্য পরীক্ষা-ভবন-ত্যক্ত-ছাত্রের ন্যায় অলোক আজ উৎফুল্ল। নাঃ। এরা কিছুতেই তাকে আর নিরেট ভাবতে পারে না। আজকের ব্যবহারে তার এতটুকু ত্রুটী নেই। তবে ঐ তরুণীর সামনে সে কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। না :—সে ঠিকই করেছে, এরই নাম হচ্ছে ভদ্রতা। একটা গাড়ীর ব্যবস্থা তার করা চাই যত টাকা লাগে লাগুক।

মধুবনী ভাট্টা খাজাঞ্চিতে একটিও মোটর নেই সব গেছে চম্পানগরের মেলায়। অলোক বিব্রত হয়ে ওঠে, গাড়ীর ব্যবস্থা না করলে সে মুখ দেখাবে কি করে। শেষ পর্য্যন্ত পুর্নিয়া ষ্টেশনে একটা বাস ড্রাইভারের সঙ্গে দর দস্তুরী আরম্ভ করে দেয়—। 'ট্যাক্সির' অভাবে বাস মন্দ কি ?

"মেলায় যাবেন না কি ?"

"না"

"তবে।" অলোক ঠিকাদার কিষন সিংকে বলে সব কথা।

'তা বাসের কি দরকার, আমার মোটরেই এ কয়দিন ঠাকুর দর্শন

করুন না। আমিতো পাঁচ ছ'-দিন থাকছিনা।' অলোক মনে মনে তৃপ্তি পায় এই মোটরের কাছে কি ঐ ঝরঝরে বাস্!

প্রতিমা দর্শনের পর বাসায় ফিরে ডাক্তার বলেন,—"অলোকবাবুর দৌলতে দিব্যি আরামে'তো দেবী দর্শন হোল এখন ভদ্রলোককে কিছু পুরস্কার দাও,—"। অলোকা চা নিয়ে আসে।

"এত পরিশ্রমের পর শুধু চা?"

"মিষ্টি আনবো?"

অলোক আপত্তি জানালো, তার পক্ষে চা-ই-যথেষ্ট।

"গলা না হয় ভিজলো, আচ্ছা অলোকবাবু এখন মিষ্টির বদলে মিষ্টি গলার গান কেমন হয় বলুনতো?"

অলোক নিরুত্তর।

অলোকার পিছু পিছু ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ করলেন—। অলোক একখানা মাসিক পত্রিকা নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে।—ভিতরে অর্গ্যান বেজে ওঠে,—ডাক্তার রায় মাসিক পত্রিকা খানা টেনে নিয়ে বলেন,—"মন দিয়ে শুনুন—আপনার সম্মানের জন্যে রাজী করিয়েছি মশাই বুঝলেন।"অলকার গানের পর ডাক্তার রায় চিৎকার করে বলেন,—"আর একখানা নতুন গলার হোক্ আসর বেশ জমে উঠেছে।"

নেপথ্যে চুড়ির আওয়াজ, ডাক্তারকে পুনরায় উঠতে হয়। অলোক বসে বসে শোনে বসুদেব রায়ের মন্তব্য গুলি,—"ওসব বুঝিনে, তোমাকে গাইতেই হবে, লজ্জার কি আছে, পাঁচজনকে শোনানোর জন্যেইতো শেখা—।" বাধ্য হয়ে অপর একজনকে গাইতে হয়। সত্যই শোনবার মত গলা। এক সময় নিশ্চয়ই ইনি সঙ্গীত সাধনা করতেন—প্রতিটি মূর্চ্ছনা গমকের মাঝে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেক রাত্রে অলোক বিদায় নেয়

বাঃ, আজকের দিনটা তার কেমন সুন্দর ভাবে কেটে গেল। এদের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় না হলে, বৎসরের এমন দিনটি কি বিশ্রী ভাবে কাটতো কে জানে। হঠাৎ মনে পড়ে রমনীবাবুর বাসার কথা। অলোক নিজেকে ধিক্কার দেয়—সম্পূর্ণ অমানুষ হয়ে উঠেছে সে—নিজের আনন্দে দুস্থ পরিবারের কথা বিস্মৃত হওয়া তার উচিৎ হয়নি। অনেকরাত হয়েছে,—তা হোক. একবার খোঁজ নিতেই হবে।

বিন্তি তার বোনেরা ঘুমিয়ে পড়েছে রমণী বাবুর স্ত্রী সুখনলালের মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। রমণীবাবুর স্ত্রী বল্লেন,—"কাল ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিন আমার কর্ত্তব্য তো' করি।

রমণীবাবুর বাসা থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অলোক বেরিয়ে পড়লো! মাত্র একজনের অবর্ত্তমানে তাদের সংসারেও এই হাল হয়েছিল। ওঃ সেকি দিন গিয়েছে তাদের। অজস্র আত্মীয় স্বজন কেউ একবার খোঁজ নেয়নি, চিঠি লিখলে জবাব দেয়নি ভয়! পাছে অতবড় সংসারটা স্কন্ধে চাপে। সমস্ত দিনের আনন্দটুকু তার নিঃশেষে উবে যায়।

মনে পড়ে প্রতিমা প্রাঙ্গনের কথা—হয়তো অন্যায় করেছে. অপরের চোখে পড়লে সে হয়তো তাকে ভাবতো বেহায়া। কিন্তু আরও অনেক কুমারীতো সেখানে ছিল দু'একজনকে রীতিমত সুন্দরী বলা চলে। তবুও অলোকার মুখখানি তার চোখে এত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত মনে হয় কেন? সুন্দর ভাসাভাসা চোখ দু'টিতে কি কোন যাদু আছে। অলোক আপন মনে ভেবে চলে—।

২৬

অশ্বিনীবাবু চমকে উঠ্‌লেন—ঘরের দরজা খোলা আসবাবপত্র চারিদিকে ছড়ানো. চামড়ার স্যুটকেশটার ডালা কাটা. ট্রাঙ্কটা তোবড়ানো।

পিতার বিমূঢ় অবস্থায় শ্যামলী বলে—"গেলতো সব, এই জন্যেই সবাই মিলে যেতে চাইনি।"

তোর কথাই ফললো মা, ট্রাঙ্কে টাকা পয়সা যা ছিল সব গিয়েছে—। বুলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কি হবে মেশোমশাই—!"

"সঙ্গে যা আছে, তাতেই দু'দিন চালাই আর বীরেনকে টেলিগ্রাম করি—টি, এম, ও করুক। আসবার সময় খাবার নিয়ে আস্‌বো রান্না বান্নার আজ আর কাজ নেই।" "অমনি থানায় খবর দিও বাবা"

বুলু প্রতিবাদ করে,—"থানায় জানিয়ে কি হবে, শুধু শুধু,—হ্যাঙ্গামা ভোগ বইতো নয়।" অশ্বিনীবাবুরও মত তাই—।

থানাওয়ালারা চোর ধরার চেয়ে হয়রাণীই করে বেশী। শ্যামলী আজ সকাল থেকেই চটেছিল—রুক্ষস্বরে বলে "আরো গেল ঐ বেটা বোষ্টমের পাল্লায় পড়ে।" যমুনা দেবী এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি,তাঁর মনে কেবল তোলপাড় করছে কৃষ্ণদাসের কথা। কৃষ্ণদাসকে তিনি এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন। কন্যার কটুক্তির তিনি প্রতিবাদ করলেন,—"যা যাবার ছিল গেল,তারজন্যে সাধু সজ্জনকে দোষী করছিস্ কেন?" চুরির কথা ছড়িয়ে পড়তে. আসতে আরম্ভ করলো নানা শ্রেণীর লোক। আগন্তুকদের কথাবার্ত্তায় শ্যামলী জ্বলে ওঠে.—আচ্ছা পাজী তো এরা. কি করে গেল. কি কি ছিল, কাউকে সন্দেহ হয় কিনা—এ সব প্রশ্নের উত্তর আর সে দিতে পারে না।

দ্বিপ্রহর-পুরী মেঠাই দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে অশ্বিনীবাবু বিশ্রাম নিচ্ছেন, শ্যামলী বুলুর কাছে বৃন্দাবন উদ্ধারে ব্যস্ত. যমুনাদেবী বারান্দায়

দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে আছেন। সকালের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল কিন্তু দ্বিপ্রহরে গায়ে কাপড় রাখা দায়, যেন গ্রীষ্মের দাপট। যমুনাদেবীর আহ্বানে শ্যামলী বুলুর আলোচনা স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়। "দেখ কত সন্ন্যাসী নগর কীর্ত্তনে বেরিয়েছেন—। অনিচ্ছা স্বত্বেও তাদের দেখতে হয়।

বুলু বলে—"বোধ হয় কৃষ্ণদাস বাবাজীও আছেন।" যমুনা দেবীর মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে। "বুলু তোর মেশোমসাইকে তুলে দে।"

বুলু বিরক্ত হয়—"আহা, বুড়ো মানুষ সকাল থেকে দৌড় ঝাঁপ করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু মাসীমার কথা উপেক্ষা করার সাধ্য তার নেই। শ্যামলী বলে,—"ঐতো সেই কাছাখোলা বদমায়েসটা,—বেহায়া আবার ধর্ম্মশালায় ঢুকছে—"

যমুনা দেবী কন্যার দিকে কটমট করে চাইলেন। বুলুর ডাকে অশ্বিনী বাবু ধড়মড় করে উঠে বলেন,—"কি মা কি হোল আবার?"

যমুনা দেবী বল্লেন—"হবে আবার কি, কৃষ্ণদাস বাবাজী আসছেন।"

"রাধে—।"

"আসুন আসুন!"

আসন গ্রহণ করে কৃষ্ণদাস বলে চলেন,—"প্রেমসুন্দরের আরতির শেষে মনে করলাম ক্ষণেক বিশ্রাম নিই, কিন্তু মুদ্রিত নয়ন সমক্ষে ভেসে উঠলো তোমাদের মলিন মুখ—। আরও আশ্চর্য্য ঘটনা রাধে, প্রেমসুন্দর যেন অভিমান-ছলছল নয়নে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। চিন্তার অকুল সমুদ্রে ভাসতে লাগলাম। এমন সময় ধর্ম্মশালার তেওয়ারীজি উপস্থিত। তার মুখে সব শুনে প্রভুর সম্মুখে নিবেদন করলেম—"প্রেমময়

আমি আনছি তাদের, তুমি ব্যথিত হয়ো না প্রভু। চল রাধে আমার কৃষ্ণকুঞ্জে. তোমাদের জন্যে ভক্তাধীনের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে কয়দিন প্রেম-বৃন্দাবনে আছ, প্রভুর সামনে কৃষ্ণকুঞ্জেই থাকবে কি বল ?"

শ্যামলী বুলুর দিকে চায়,—ভাবে পারিস্ফুট হয় - ভণ্ডামীর ঘটাখানা বেশ জমাট বেঁধেছে তো।' অশ্বিনীবাবুকে নিরুত্তর দেখে - কৃষ্ণদাস বলেন— "শ্রীবৃন্দাবনে 'ক কাঞ্চনের শোকে অভিভূত হওয়া শোভা পায় রাধে ?"

"টাকার কথা ভাবছিনা বাবাজী।"

কৃষ্ণদাস কর্ণমূলে অঙ্গুলি স্থাপন করে প্রতিবাদ জানান, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বাবাজী নই বাবাজী নই, বল রাধে, ।"

"শুনুন রাধে, টাকার জন্যে টেলিগ্রাম করেছি, কাজেই সেটা না নিয়ে এখান থেকে কি করে যাই বলুন ?"

কৃষ্ণদাস হেসে উঠলেন,--"সব ভাবনা সমর্পন কর প্রেমসুন্দরের চরণে, তিনিই ব্যবস্থা করবেন। তুমি নির্ভয়ে চল রাধে, শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমসুন্দরের সেবক, অধম কৃষ্ণদাসকে সকলে ভাল ভাবেই চেনে, বিশেষ পোষ্টমাষ্টার আমার ভক্ত স্থানীয়—তবে কি জানো ? সংসার মায়ায় আজও আবদ্ধ।"

যমুনা দেবী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা শুনছিলেন কাছে এসে হঠাৎ কৃষ্ণদাসকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণদাস ত্রস্তে, আসন ত্যাগ করে বলে ওঠেন। "হায় হায় কি করলে রাধে, তোমার মত বৈষ্ণবীর প্রণাম-যোগ্য আমি নই।"

সম্মোহিতের মত যমুনা দেবী বলেন,—"আমার মন বলছে আপনার আশ্রমে আমি শান্তি পাবো, আপনি মহাপুরুষ।"

কৃষ্ণদাস আর্তনাদ করে ওঠেন,—"হা প্রেম সুন্দর, এ তোমার কি ছলনা প্রভু !" পরে যমুনা দেবীকে লক্ষ্য করে বল্‌তে লাগলেন,— "রাধে, আর কত ভুল করবে ? শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষ বলতে যে সেই পরমপুরুষ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকেই বোঝায়, অন্য সকলে যে প্রকৃতির অংশ গো।"

অশ্বিনীবাবুর সংশয় জাগে,—যমুনার বুঝি আবার মস্তিষ্কবিকৃত হয়ে গেল। শ্যামলী আরক্ত নয়নে চায় কৃষ্ণদাসের প্রতি, বুলু হতবিস্মিত,— মাসীমার আচরণে।

যমুনা দেবী বলে চলেন,—"জানো রাধে—আমার গোপাল, আমার কোল খালি করে চলে গেছে, তুমি তাকে এনে দাও —দোহাই তোমার।"

সেই জন্যেইতো এখানে এসেছি সখী তোমার গোপাল যে মিশে রয়েছে প্রেমসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে গো।"

"ওগো তুমি চুপ করে কেন ? চলনা সকলে চলে যাই রাধের সঙ্গে কৃষ্ণ কুঞ্জে।" যমুনা দেবীর চোখের দৃষ্টি, ভাব ভঙ্গি সমস্তই অস্বাভাবিক।

স্বামীর মৌনতায় রুষ্ট হয়ে যমুনা দেবী অকস্মাৎ একটা কাণ্ড করে বস্‌লেন, নির্বিকার চিত্তে কৃষ্ণদাসের হস্ত ধারণ করে বললেন – "এরা যাবে না রাধে' তুমি আমাকেই নিয়ে চল"

কৃষ্ণদাস এক পলকে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন,— "মনে করে দেখ রাধে, সেই মথুরার কথা। দানব কংশের কারাগারে বন্দী বসুদেব-দেবকী; তখন ভক্ত শ্রেষ্ঠ অক্রুর গিয়েছিল দূতরূপে। আজ তাঁরই নির্দ্দেশে ভক্তাধম কৃষ্ণদাস এসেছে তোমাদের বন্ধন মোচন করতে।"

অশ্বিনীবাবুর বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। বিরাট সরীসৃপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বন্যজীব যেমন তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে, তিনিও সেই ভাবে চেয়ে আছেন কৃষ্ণদাসের দিকে।

শ্যামলী আর সহ্য করতে পারে না. যমুনাদেবীর হাতখানা তখনও রয়েছে কৃষ্ণদাসের হাতের মধ্যে—। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শ্যামলী বলে ওঠে,— "বাবা! তুমি,—তুমি চুপ করে কেন! তুমিও কি পাগল হয়েছ বাবা। দূর করে দাও পাজী শয়তানটাকে।"

কন্যার কথায় যমুনাদেবী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

—'রাধে প্রেম সুন্দরের দোহাই, তুমি আমায় নিয়ে চল, এরা কেউ যাবেনা. এরা তোমায় বিশ্বাস করে না।"

শান্ত সংযত স্বরে কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন'—"অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের বীজ নিক্ষেপ করাই ভক্তের ধর্ম্ম! পরে শ্যামলীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—"তুমি কি যাবেনা রাধে—? অভিমান হয়েছে বুঝি? কিন্তু অভিমানই যে অনুরাগের লক্ষণ—।"

রাগে দুঃখে শ্যামলী কেঁদে ফেলে,—। চিরদিনের ভীরু স্বভাবা বুলু যমুনাকে আকর্ষণ করে বলে,—"এ তুমি কি করছ মাসীমা।"

কৃষ্ণদাস মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলে উঠেন,—মায়া মায়া, এ সব মায়ার খেলা।"

যমুনা দেবী বুলুর হাত ছাড়িয়ে কক্ষত্যাগ করে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন. "এরা যাক আর না যাক, আমি চল্লাম কৃষ্ণ কুঞ্জে!"

"আমি বলছি এরাও যাবে, প্রেমসুন্দরের আকর্ষণ কেউ অগ্রাহ্য করতে তো পারেনা। কেউ আগে কেউ-বা পিছে—চল রাধে আমরা অগ্রসর হই!"

বুলু চীৎকার করে উঠে— "মাসীমা—মাসীমা"।

সোপান অতিক্রম করতে করতে যমুনা দেবী উত্তর দেন—"আমি তোদের কেউ নই, তোরাও আমার কেউ না।"

অভাবনীয় ঘটনায় শ্যামলী সব চেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে—অথচ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে সেই ছিল বহুগুণে সাহসিকা দৃঢ়চেতা।—অশ্বিনী বাবু শ্যামলীকে বুকের কাছে টেনে নিলেন—

"শেষ পর্য্যন্ত তোর মাকে উন্মাদ আশ্রমেই পাঠাতে হবে দেখছি।"

"কিন্তু মা যে চলে গেল বাবা।"

"গাড়ী এনে জিনিষ পত্র নিয়ে আমরাও যাব সেখানে,—টাকা এলেই পুর্নিয়ায় ফিরবো, কাজ নেই আর তীর্থ ভ্রমণে"।

"ঐ শয়তানের ওখানে? না বাবা ওখানে যেয়োনা"!

"ভয় কি মা আমি তো আছি, না গেলে তোর মাকে দেখ্‌বি কি-করে, পাগলের ওপর কি রাগ করতে আছে মা"।

২৭

বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা। সন্দেশ, খেলনা নিয়ে অলোক ফিরলো ডাক্তার রায়ের বাসায়। দরজা খুলে কালীচরণ অভ্যর্থনা জানালো,—"আপনি বসুন বাবু—বড়মা আর বাবু এলেন বলে।

খাবার আর খেলনার বোঝা নিয়ে কালীচরণ ভিতরে চলে গেল। অলোক মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলো, নানান রকমের বিজ্ঞাপন বেশীর ভাগই স্ত্রী রোগের—।

"বাবু আসুন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!" অলোক চমকে ওঠে—"কি হয়েছে কালী"—।

"আগুন,-আগুন ধরেছে ছোটমার কাপড়ে—। ছুটোনা, ছুটোনা মা,—জল ঢেলে সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।"

মুহূর্ত্তকে চিন্তার পর, অলোক ক্ষিপ্রগতিতে ভিতরে প্রবেশ করে দেখে,—অলোকা পাগলের মত আগুন নিভানোর জন্যে ছুটছে। পিছনে এক বিরাট বালতী নিয়ে কালী জল নিক্ষেপনে উদ্যত। অলোক কালীর বালতিটা এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে অলোকাকে জোর করে মাটীতে বসিয়ে দিয়ে বলে, "ছুটলেই সমস্ত কাপড় ধরে যাবে, ভয় করবেন না"। অলোক দুহাত দিয়ে জলন্ত অংশ চেপে ধরে, এক অংশ নিভে গেলেও, অন্য অংশ জ্বলে ওঠে—কুঁচি দিয়ে আঁটশাট করে পরা রেশমী-বস্ত্রের পরতে পরতে আগুন প্রবেশ করেছে। শায়ার ফিতে যে কিছুতেই খোলা যায় না, টানা টানিতে ফাঁস বেশ জোরে আটকে গিয়েছে। অলোকা কেঁদে ওঠে—"উঃ জ্বলে গেল"

শায়ার কিছুটা অংশে আগুন ধরে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত—কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা ক'রে অলোক,—'দূর হোক ভদ্রতা শালীনতার মাপ কাঠী', ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক্! অলোক সজোরে টান দিয়ে ছিন্ন করে ফেলে শায়ার বাঁধন—। ভয়ে লজ্জায় নগ্ন দেহে অলোকা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লো। মিনিট খানেক,—ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটুকু আলোকিত করে অলোকার অঙ্গবস্ত্র ভস্মে পরিণত হল। স্কন্ধ ও জানু অবলম্বনে অলোক সজ্ঞাহীনাকে বহন করে নিয়ে গেল শয্যায়। কালীচরণ একখানা ধুতি নিয়ে বলে—"নিন বাবু"।

কালী এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে, তার শরীরে যেন বল্ নেই—কোন রকমে কথাটা বলে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অলোকার দেহ আবৃত করে অলোক বলে—"তুমি এখানে বসে বাতাস কর, আমি ডাক্তার বাবুর খোঁজ করি!"

কালী বাধা দেয় —"না বাবু আমিই যাচ্ছি আপনি বসুন, আমার ভীমরতি লাগার মত হয়েছে।" ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। অলোকার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে, অলোক হাতপাখাটা তুলে নিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পর অলোকা চোখ মেলে চায়।

"ভয় পাবেন না, কালী ডাক্তার বাবুকে আনতে গেছে, এখুনি এসে যাবেন"।

পাশ ফেরার সঙ্গে আবৃত বস্ত্র স্থানচ্যুত হতেই অলোকা বিব্রত হয়ে ওঠে, অলোক কাপড়খানা চারিদিকে ভালো করে টেনে দেয়।

"একটু জল দিন্‌না"!

অলোক ঘরের চারিদিকে চায়।

"ওখানে বারান্দায় আছে"।

হস্ত প্রসারণের সঙ্গে অলোকার মুখে ফুটে ওঠে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

"হাঁ করুন, আমি ঢেলে দিচ্ছি"।

অলোকার ডান হাতখানা বেশ ঝল্‌সে গেছে। টেবিলের উপর গ্লাস রাখতে গিয়ে অলোকের চোখে পড়ে সুগন্ধি তেলের শিশিটা।

"হাতে একটু লাগিয়ে দেব? জ্বালা কমতে পারে।"

"দিন"।

"একটু কমেছে মনে হচ্ছে"।

"হুঁ"।

"বাতাস দিলে আরো কমে যাবে"।

মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে অলোক পাখা চালায়।

অলোকার অন্যান্য দগ্ধস্থানে জ্বালা ধরেছে ভীষণ, কিন্তু কোন

উপায় নেই, না কিছু করবার, না প্রাণভরে কাঁদবার। সে কেবল ভাবছে কখন দিদি আসবে, কালী কি এতক্ষণ পর্য্যন্ত খুঁজে পেলনা তাদের!

দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করলেন সস্ত্রীক্ ডাক্তার বসুদেব রায়!

অলোকা কেঁদে ফেলে বলে—"দিদি"।

"ভয় কি ভাই, এখুনি ওষুধ দিলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কালী আলোটা ধরতো"।

"ইস্"।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রায়ের প্রতিবাদ—"কিচ্ছু পোড়েনি, স্রেফ্ একটু ঝল্‌সে গেছে, আচ্ছা আমি ওষুধ নিয়ে আস্‌ছি। চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে দিদি বলেন, —"বিপদ'তো কেটে গেছে ভাই, ভয় কিসের। আপনি বসুন না অলোক বাবু!"

"ওঘরে বসছি!"

"এখানেই বসুন, আপনি না থাকলে, যে কি হোত তাই ভাবছি।"

অলোক দাঁড়িয়ে থাকে, বস্‌বার চেয়ার টুল কিছুই নেই।

"বসুন না বিছানায়, লজ্জার কি আছে।"

অলোক শয্যার একপ্রান্তে বসে পড়লো।

ইনজেকসন্‌—প্রলেপের পর, অলোকা ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তার রায় বললেন—"খুব সময়ে এসেছিলেন তো। বেচারী অলোকা,—বিজয়ার দিনে কি দুর্ঘটনা বলুন তো? কালী বেটা গিয়ে কিছু বলতেই পারে না, কেবল হাঁফায় আর বলে—সব্বনাশ হোল সব্বনাশ হোল।"

আহারের সময় সুরুচি দেবী লক্ষ্য করেন অলোক মাত্র দুটি আঙ্গুলের সাহায্যে আহার গ্রহণ করছে।

"দেখি হাতখানা !"

অলোক হাসতে হাসতে বলে—"কেন বলুন তো" ?

"দেখান না,—ইস্" !

ডাক্তার জিজ্ঞাসুনেত্রে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন।

"ঝলসানো হাতে খাচ্ছেন কি করে, আচ্ছা লাজুক তো আপনি !"

"ও কিছু নয়, রাত্রেই ভালো হয়ে যাবে।"

"বাঁ হাত দেখি।" বাম হস্তের অবস্থা আরো শোচনীয়, অলোক নির্বিকার চিত্তে বলে,—"ও হাতে কিছু হয়নি।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অলোককে দেখাতেই হোল।

"দাঁড়ান, অমন করে খেতে হবেনা।" ডাক্তার রায় হেসে ওঠেন,—"হাউস সার্জ্জেনের হাতে পড়েছেন মশাই, থাকুন এখন হাত গুটিয়ে বসে।—"

ধোয়া ধুয়ির পর মলম লেপন, তারপর দুহাতে পড়লো বেশ শক্ত রকমের ব্যাণ্ডেজ, সুরুচি দেবী এ সব কাজে বেশ অভ্যস্ত।

বসুদেব রায় বলেন,—"বাঃ দিব্যি প্রভু জগন্নাথত্ব লাভ করলেন দেখছি, কিন্তু খাবেন কি করে ? দৃষ্টি আহার চল্‌বে বোধ হয় !"

"সে ভাবনা তোমার নেই—"

অলোকের থালাখানা সুরুচি দেবী নিয়ে গেলেন অলোক ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসে,—"কি মুস্কিলে পড়লাম বলুন তো" !

"লেডি ডাক্তারের বুদ্ধির দৌড়টা দেখুন না চুপ করে।"

খাবারের থালা খানা নামিয়ে সুরুচিদেবী ঠিক অলোকের সাম্‌নে বসে পড়লেন—"দেখবেন আঙ্গুল যেন খেয়ে ফেলবেন না"

"তার মানে !"

স্নুরুচি দেবী হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন—নিন মুখ খুলুন।"

অলোক প্রবল আপত্তি জানায়, কিন্তু স্নুরুচি দেবীর উঠ্‌বার কোন লক্ষণই নেই।—গম্ভীর মুখে—ডাক্তার বলেন ;—"কাল ঠিক্ আমিও হাত পুড়িয়ে ফেল্‌বো।"

"বেশতো মধুস্নদন খাইয়ে দেবে, হরিজনের হাতে খেলে দেশ উদ্ধার আর পুণ্যি সঞ্চয় দুই-ই হবে"।

"বাঃ বেশ তো খাচ্ছেন, বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত কেউ খাইয়ে দিতেন বুঝি" ? অলোক হেসে ফেলে,—ডাক্তার রায় পদ্মাসনে বসে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকেন। অলোকের মনে পড়ে তার স্নেহময়ী বৌদি'কে—বার তের বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত স্কুলে যাবার সময় তিনি খাইয়ে দিতেন—। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে অলোক বলে,—"আস্নুন ডাক্তার বাবু বিজয়া করে নিই।"

"তাই তো কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছি—"পিছন থেকে স্নুরুচি দেবী বলেন,—"জানেন্‌তো বিজয়ার দিনে মিথ্যে বল্‌তে নেই—";

অলোক সপ্রশ্নে চেয়ে থাকে।

"যতদিন না হাত ভাল হয়, এখানে হু'বেলা খেয়ে যাবেন, কেমন ?"

"আচ্ছা—"।

"ঠিক তো" ?

"হ্যাঁ"।

পথের মাঝে অলোক ভাবে স্নুরুচিদেবীকেত' বিজয়ার সম্ভাষণ জানানো হলনা, পরক্ষণে মনে করে দূর্ শুষ্ক নমস্কার না করাই উচিৎ, আজ পর্য্যন্ত কোন মহিলাকেই সে কাষ্ঠ ভদ্রতা সূচক নমস্কার করে নি। মেসে তখন ঠাকুর রামচন্দ্র সুর করে রামায়ণ পড়ছে—"যিনি কোটি সুধাকর দর হাস্ত কি মধুর,—ঝরছি অমিয় অঝর তাঙ্কু চাখিলিরে"—

মুণ্ডিত মস্তক নিরাভরণা যমুনা দেবীকে চেনা যায় না। দিবারাত্র বিগ্রহ সম্মুখে তিনি জপে চলেছেন ইষ্ট মন্ত্র।

অশ্বিনী বাবু যথেষ্ট শঙ্কান্বিত, অনেক সময় বিরক্তি বোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণদাসের সম্মুখে প্রতিবাদের ভাষা যেন খুঁজে পান না। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অশ্বিনী বাবু আজ কৃষ্ণদাসের বন্দী। বুলু, শ্যামলী, আশ্রয় পেয়েছে দ্বিতলে, প্রত্যেক আশ্রমবাসী তাদের সমীহ করে চলে। কৃষ্ণদাস তাদের সামনে একবারও আসেনি, কিন্তু বুলু, লক্ষ্য করেছে কৃষ্ণদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে তাদের উপর,—চারিপাশে যারা ঘোরাঘুরি করে, তারা প্রহরী ভিন্ন কিছু নয়।

সন্ধ্যার পর প্রাঙ্গনে আরম্ভ হল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন। সমস্ত রাত্রিব্যাপি চলবে নাম গান। কীর্ত্তনিয়াদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণদাসের গুরুভ্রাতা লোচনদাস বাবাজী। কুঞ্জস্থাপয়িতা হরিদাস বাবাজী প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবনে এসেছিলেন তখন লোচনদাসই ছিলেন একমাত্র শিষ্য। কৃষ্ণদাসের আসার পর কৃষ্ণকুঞ্জ ত্যাগ করে তিনি স্থাপন করেছেন অন্য মঠ। মাঝে মাঝে লোচন দাসকে কৃষ্ণকুঞ্জে আসতে হয় কারণ এখানে রয়েছে গুরু হরিদাস বাবাজীর সমাধি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বার্দ্ধক্যে বৃন্দাবনের রুক্ষতায় পরিম্লান কিন্তু মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব শান্ত সৌম্যভাব।

ধীর সংযত স্বল্পভাষী সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। লোচন দাসের সংকীর্ত্তন শেষে প্রবেশ করলেন কৃষ্ণদাস।

জনতা বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস আজ ধারণ করেছেন কৃষ্ণ মূর্ত্তি—মস্তকে শিখি—পুচ্ছ-শোভিত সুন্দর চূড়া, পরিধানে পীত বাস। লোচন দাস ভিন্ন অন্য সকলে প্রণতি জানালো—।

কৃষ্ণদাস বক্তৃতা শুরু করলেন—"এই কি আমার অতি সাধনার শ্রীবৃন্দাবন ? কিন্তু বেণু নীরব কেন ? কোথায় সেই প্রেমপূর্ণ হিয়া ব্রজাঙ্গনা ব্রজনারী ? কোথায় আমার রাখাল সখা শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল ।

ভক্তবৃন্দ কান্নার সুরে চিৎকার করে,—উদ্ধার কর—উদ্ধার কর দয়াময়, আমরা মহাপাপী"—। বুলু শ্যামলী কৌতুক অনুভব করে। বুলু শ্যামলী স্থান পেয়েছে মন্দির-চত্বরে, সেখানে অন্য কেউ নেই। সন্ধ্যা থেকেই বুলুর মাথা ধরেছে, তারপর এই সব দৃশ্য আর চীৎকারে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

শ্যামলী দেখে—তার বাবা বৈরাগীদলে বেশ মিশে গিয়েছেন তো' কিন্তু মা কই ? কৃষ্ণদাসের পায়ের কাছে উপবিষ্টা রমণীর সঙ্গে মায়ের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। শ্যামলী অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে। লোচন দাস হঠাৎ বলে উঠলেন,—"কৃষ্ণদাস সব জিনিষের একটা সীমা আছে। তুমি ভেবেছ ধর্ম্মের নামে এত বড় ভণ্ডামী করে নিস্তার পাবে ?"

"আমি ভণ্ড ! লোচনদাস এখনো তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হল না। মূর্খ ভাল করে চেয়ে দেখ—আমি সেই—"।

সরোষে লোচন দাস উত্তর দিলেন—"এই সব অপদার্থদের ভোজ-বাজী দেখিয়ে মুগ্ধ করতে পার, কিন্তু ভুলে যেওনা যে লোচন দাস বৈরাগী নয় বৈষ্ণব। মনে রেখো এত অনাচার ভগবান সহ্য করবেন না. তোমার পতন অনিবার্য্য।"

লোচনদাসকে আসর পরিত্যাগ করতে দেখে—কৃষ্ণদাস শ্লেষের

সঙ্গে বল্‌তে লাগল—"ভক্তগণ, তোমরাই বিচার কর, কে প্রকৃত ভক্ত এবং ভণ্ড। যেখানে নাম-কীর্ত্তন, সে স্থান যে বৈকুণ্ঠের সমতুল্য এ জ্ঞান যার নেই সে আবার কিসের বৈষ্ণব কিসের ভক্ত ?"

লোচনদাস বাধা হয়ে বসে পড়লেন। বুলু শ্যামলীকে বলে,—'চল আর ভাল লাগে না।"

"তুই যা, আর একটু মজা দেখে আমি যাচ্ছি"।

বুলু উঠে গেল। কৃষ্ণদাস বলে চলেছে,—"মনের ময়লা যার আজো দূরীভুত হলনা সে বৈষ্ণবের কলঙ্ক! কামনা-কলুষিত মনেই তো সন্দেহের সৃষ্টি। নির্ম্মল মন কি সন্দেহ সংশয়ে নমিত হয় ? শ্রীরাধার যদি কলঙ্কের ভয় থাক্‌তো, তবে কি তিনি শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের প্রেম-কণালাভে সক্ষম হতেন"। পরক্ষনে কৃষ্ণদাস —চিৎকার করে উঠলেন—"আমায় ডাকছে—আড়াল থেকে বেণু বাজিয়ে আমায় আকষণ করছেন আমার প্রেমময়। এসো প্রভু, এসো, তোমার জন্য যে আমি হৃদয় আসন পেতে রেখেছি। আমার হৃদয় তীর্থে তোমার অবিনাশী বংশী ধ্বনিত হচ্ছে মুরলীধর।

"ওগো প্রভু আমাদের দিব্যাবস্থা লাভ করেছেন,।" কেউ বলে— "সখি ললিতে প্রভুর কর্ণমূলে কৃষ্ণ নাম শোনাও। ললিতা কৃষ্ণদাসের মস্তক জানুর উপর রেখে কানে কানে নাম শোনায়, বিশাখা চামর ব্যজন করে। লোচন দাস ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে আসর ত্যাগ করে চলে গেলেন। বুলুর কাণে আসে চাপা চাপা কান্নার আওয়াজ, সিঁড়ি—ঘরের পাশেই কে যেন কাঁদছে। বুলু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো—বাইরে ঝুলছে তালা অথচ ভিতরে রয়েছে মানুষ!

"কে ললিতা ? একটু জল দেবে ভাই ?"

"কে গৌরী বুঝি ?"

"না, নতুন এসেছি"

"ওঃ সেই জন্যে আজকের অহোরাত্রি বুঝি ?" বুলু হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে "কি বলছ।"

"কি আবার বল্‌বো,—বলি কৃষ্ণদাসের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছ ত ?

"তোমার কথা তো ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না !"

"না বোঝবার তো কিছু নেই। তুমি কি বিধবা ?"

"এখনো বিয়ে হয়নি।"

"তবেত তোমার কপাল ভালো,।"

"কেন ?"

"ন্যাকামি করছ কেন ভাই—?"

সত্যি বলছি। কিছু জানিনা, কিন্তু তোমার কথায় আমার ভয় করছে,—"

বন্দিনী হেসে ওঠে,—"ভয়,—ভয়ের কথা আগে মনে ছিল না, এখানে যখন এসেছ তখন ভয় করলে চলবে কেন বল"

বুলু সংক্ষেপে বর্ণনা করে তাদের আগমনের কারণ—।

"তবে তো আমার চেয়েও তোমরা বিপদে পড়েছ !"

"এখন উপায় ?"

উপায় তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, রাত্রেই সব টের পাবে। বুলু সত্রাসে বলে,—"চুপ্ কে আস্‌ছে,—একটু পরেই আবার আসছি।"

একজন বয়স্কা বৈষ্ণবী চলে যেতে বুলু পুনরায় দরজার সামনে এসে দাড়ালো।

"এখন কি করব ভাই ?"

"তোমার মেশোমশাইকে সব খুলে বলে দাও, দেরী করোনা।"

"কিন্তু দেখা করবো কি করে ?"

"তাইতো ! আচ্ছা দরজা খুলতে পারো ? ভাঁড়ার ঘরে কুলুঙ্গিতে চাবি থাকতো, একবার দেখে এসো !"

ভাগ্য ক্রমে যথাস্থানে চাবি পেয়ে বুলু দরজা খুলে ফেললো,—বন্দিনী বাইরে এসে বলে,—খোকাটা দেখি ফটকের চাবিটা নিতে হবে। দরজায় তালা বন্ধ করে উভয়ে দ্বিতলে চলে গেল—।

আলোকিত কক্ষে বন্দিনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বুলু অবাক হয়ে যায়। বয়েসও বেশী নয়, বোধহয় সম-বয়সী।

বন্দিনীর নাম পার্ব্বতী। পার্ব্বতী একে একে জানায় তার ইতিহাস। পিতা মস্ত ব্যবসায়ী, কলকাতায় চার পাঁচখানা বাড়ী। কৃষ্ণদাস তার পিতৃগুরু। সদ্য-বিধবা-কন্যাকে পিতা পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে তীর্থ ভ্রমণে। বুলু ভাবে—মানুষ কি ভাবে প্রতারিত হয় ধর্ম্মের নামে ভণ্ডের ভাঁওতায় ! কীর্ত্তনের আসর থেকে একটা হট্টগোল উঠলো।

"কীর্ত্তন থেমে গেল নাকি ?"

"না, না, গান থামবে না, গান থামলে বিপদ ঘটতে পারে, রাস্তায় লোক চলাচল আছেত ! আচ্ছা ভাই তোমার বোন কি খুব সুন্দরী—"?

"সুন্দরী কিন্তু তোমার মত নয় !" পার্ব্বতী ক্ষণকাল থেমে বলে, আমার সব গেছে—কিন্তু তোমাদের বাঁচাতে চেষ্টা করবো। তবে তোমাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে আর যখন যা বলবো তাই শুনতে হবে। পারবে —?"

"খুব পারবো।"পার্ব্বতীর কথায় বুলু অনেকখানি আশান্বিত হয়।

মুদ্রিত চক্ষে—ভাবোন্মত্ত কৃষ্ণদাস বলে চলেছে—

অন্ধ দিশাহারা জগতে আবার শোনাব আমি বাঁশরী নিনাদ,—" ভক্তগণ কেঁদে ওঠে,—"প্রভু দয়াময়, চক্ষু উন্মিলিত করে আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত কর!"

"দ্বারাবতী,—লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী দ্বারাবতী, রমণীয় পর্ব্বত-বেষ্টিত দ্বারাবতী। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনা আমার বাল্যের বৃন্দাবন আমার শ্রীরাধা, আমার বাল্য সখা—গোপ বালকগণ।

"দয়াময় এত করুণা তোমার! কৃষ্ণনাম শোনাও, কৃষ্ণনাম শোনাও।" —"কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—"

নিদ্রোত্থিতের মত কৃষ্ণদাস উঠে বসলো।

"কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম। কে আমার ঘুম ভাঙ্গালে?"

প্রধান ভক্ত করজোড়ে বলে—"তুমি না তরালে আমাদের উপায় কি হবে প্রভু!"

"ভয় কিসের বৎস। আমি কি তোমাদের ত্যাগ করিতে পারি? তোমরা যে আমার রাখাল সখা। দাও,—প্রেম সুন্দরের চরনামৃত দাও, কণ্ঠতালু শুষ্ক প্রায়!

কৃষ্ণদাস গ্রহণ করার পর চরণামৃত বিতরিত হল অন্য সকলের মাঝে, অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও শ্যামলীকে পান করতে হল। পুনরায় কৃষ্ণদাসের ভাব জেগে ওঠে,—"অভিমান? অভিমান কার উপরে সখী! তোমার মনের-মালঞ্চে যে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে তা কি আমি জানিনা ভেবেছ?" জনমে জনমে তোমার আমার মিলন যে চির,—চিরন্তন। থাকুক জটিলা থাকুক কুটিলা কিন্তু তোমাকে

কে দেবে বাধা। ভক্তবৃন্দ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—প্রভু কার উদ্দেশ্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণদাস ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো—"কি বলিছ সখী, কাণে কাণে কয়ে কথা, নয়নে বুলায়ে মোর হাত, সুধা ওষ্ঠে সপ্রেম চুম্বন!

ভক্তগণ শশব্যস্তে পথ করে দেয়। শ্যামলীর সামনে এসে দাড়ালো কৃষ্ণদাস—।

"কোথায় প্রেম-সুন্দরের পূত পাদোদক ?"

"এই যে—এই যে প্রভু।" জনৈক ভক্ত ভৃঙ্গার এগিয়ে দিল।

"নাও পান করে অমরত্ব লাভ কর!" শ্যামলী অভিভূতের মত পান করে সুমিষ্ট সুগন্ধি পাণীয়।" কৃষ্ণদাস আসন গ্রহণ করায় আবার আরম্ভ হোল নাম কীর্ত্তন!

কীর্ত্তন শুনতে শুনতে শ্যামলীর চক্ষু দুটি মুদ্রিত হয়ে আসে—। "বাঃ এরা বেশ গাইছে তো ধীরে ধীরে তার মাথা নুয়ে পড়ে! ললিতা হাত ধরে বলে, "বিশ্রাম নিতে চল সখী, পরিশ্রান্তা তুমি! দ্বিরুক্তি না করে শ্যামলী ওঠে দাঁড়ালো—। কীর্ত্তনিয়া গেয়ে চলেছেন— "গোকুল নগরী মাঝে, আরো কত নারী আছে তাহে কেন না পড়িল বাধা।"

বুলু এসে দেখে শ্যামলী নেই, তার বুকের ভিতর কেঁপে উঠলো। "কিন্তু শ্যামলীতো বোকা নয়।" কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস কোথায়! তবে—তবে কি! বুলু ছুটে যায় পার্ব্বতীর কাছে—।

২৯

"দিদি !"

"তিনি মন্দিরে আছেন, এখুনি আস্‌বেন।"

সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ, কীর্ত্তনের শব্দও কাণে বাজেনা। ব্যাকুল স্বরে শ্যামলী জিজ্ঞাসা করে—"এ ঘরে আনলে কেন ?"

"অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে কি না তাই,—এখুনি তোমার দিদি আসবেন, এলেই ওপরে নিয়ে যাবে, বেশী কথা বলো না আবার মাথায় যন্ত্রণা হবে।" শ্যামলী খানিকক্ষণ চুপ করে বলে,—"কই জল দিলে না ?"

"বিশাখা জল আন্‌তে গেছে, এই এলো ব'লে।" শ্যামলী শুয়ে থাকে,—শরীরে যেন শক্তি নেই, সময় সময় বুকের ভেতর কেমন ধারা হয়ে ওঠে,—গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে বেশীক্ষণ চাইবার শক্তি নেই - সব ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। তন্দ্রার মাঝে শ্যামলী ধড়মড় করে ওঠে বসলো "উঃ মা গো"।

বিশাখা তার গায়ে হাত দিয়ে বলে,—"কি হোল ?"

"উঃ মনে হচ্ছিলো বিছানা শুদ্ধ যেন পড়ে গেলাম, মাথার ভেতর কেমন দপ দপ করছে।"

"পড়ে যাবে কেন, এই তো বিছানায় শুয়ে আছ ভাই।"

লজ্জিত শ্যামলী ভাবে—কেন এমন হোল। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না।

"সত্যি আমার ভাল লাগছেনা, দিদিকে তুমি ডেকে দাও।" বিশাখা শিকল টেনে চলে গেল।

কৃষ্ণদাসের ভৃঙ্গারে, চরনামৃতের পরিবর্ত্তে ছিল তীব্রমাদক মিশ্রিত পানীয়, যার ফলে শ্যামলী এমন অভিভূতের মত হয়ে পড়েছে। ললিতা জল কলস নিঃশব্দে রক্ষা করে শ্যামলীর দিকে এগিয়ে যায়।

"ঘুমোলে নাকি ?"

"কে দিদি ভাই ?"

ললিতার মুখে চোখে বিরক্তি ভরে ওঠে,—আচ্ছা শক্ত মেয়ে তো বাপু !

প্রকাশ্যে বলে—"দিদি আসছেন, আমি ললিতা। জল খাবে নাকি গো ?"

দ্রুতপদে বিশাখা এসে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করে—"পার্ব্বতীর ঘরের চাবি কোথায় ?"

"কেন, ভাঁড়ার ঘরে !"—

"সর্ব্বনাশ ঘটেছে—পার্ব্বতী পালিয়েছে—!" উভয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেল—।

শ্যামলীর বুকের ভেতর গুলিয়ে ওঠে। অতি কষ্টে কোন রকমে সে উঠে বসলো—সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঝলক বিশ্রী দুর্গন্ধ যুক্ত তরল পদার্থ উদগীর্ণ হয়ে গেল। বমনের ফলে অবসাদ—ভাব অনেকখানি কমে আসে।—মাথা ধুয়ে কিছুটা জল পান করে শরীর অনেকখানি হালকা হোল শ্যামলীর।

প্রাচীর-রক্ষিত আলোটাকে জোর করে দিয়ে শয্যায় বসে ভেবে চলে শ্যামলী। মনে পড়ে চরণামৃত পানের কথা! দিদির সঙ্গে চলে গেলেই ভালো হোত! কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুলু আসেনা কেন ? ওরা দু'জনে কি সব বলাবলি করতে করতে অমন করে ছুটে পালালো কেন ? দরজা আকর্ষণ করে দেখে বাইরে থেকে বন্ধ শ্যামলী যেন চমকে ওঠে,—যদি তাই হয়! যদি কেন এইটাই সত্যি! এখন কি করা যায়—! চীৎকার করলে কোন ফল হবেনা, একটা লোকেরও সাড়াশব্দ

তো আসছে না! শ্যামলী উঠে দাঁড়ালো—বসে থাকলে চলবেনা, মাথা ঠিক করে নিজেকে আজ বাঁচাতে হবে! ভাবনা স্রোতে শ্যামলী চলে যায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার—পিতৃকর্ম্মস্থান সৈয়দপুরে,—মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালিনী বলে সে পেয়েছিল পুরস্কার! বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরীসাহেবের কথা গুলি যেন তার কানে এসে বাজে—"তুমি বাঙালীর মেয়ে কিন্তু শক্তিতে তুমি রাজপুতানী। অনেক বাঙালী মেয়েরও শারীরিক শক্তির অভাব নেই, কিন্তু সাহস অভাবে বিপদের সময় তারা আধমরা হয়ে যায়। আশীর্ব্বাদ করি যেমন তোমার শক্তি তেমনি যেন সাহস থাকে " শ্যামলীর সর্ব্বদেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল।—সে আজ লড়বে মুখোমুখি লড়বে, যদি বিপদ আসে সে পিছপা হবেনা তারপর যা থাকে ভাগ্যে! কক্ষে কোন আসবাবপত্র নেই, ইষ্ঠক বেদীর উপর শয্যা বিছানো হয়েছে।—দেওয়াল ল্যাম্পের সামনে ছোট্ট কুলুঙ্গিতে রয়েছে—অর্দ্ধহস্ত পরিমিত এক চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই বিপদের মাঝেও শ্যামলী হেসে ফেলে। বৃন্দাবনে এসে এক বিষয়ে তার বেশ জ্ঞান জন্মেছে—দেবতার নাম নিয়ে ভণ্ডের দল যত কুকাজ করে,—তার—সহস্রভাগের এক অংশও বোধ হয় নামজাদা গুণ্ডা বদমায়েসে সারাজীবনে করে উঠতে পারে না। অথচ সাধারণের চোখে এরা ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। শ্যামলী পুরুষের বেশে নিজেকে সজ্জিত করলো—।

* * *

ললিতা বিশাখা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় পার্ব্বতী ও বুলুর। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারে না। কৃষ্ণদাসকে তারা বেশ চেনে, অসাবধানতার নির্ম্মম শাস্তির ভয়ে তারা শিউরে ওঠে।

উদ্যানের মাঝে বুলু আর পার্ব্বতীর পরামর্শ চলছে।—যত সময় যায়

ততই চিন্তা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোন পন্থাই মনঃপুত হয় না। পার্ব্বতী কৃষ্ণকুঞ্জের প্রতিটি স্থানের সঙ্গে পরিচিত, সব জায়গা তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজেছে—। পার্ব্বতী হঠাৎ বলে—"ঠিক তাই"—। সঙ্গে সঙ্গে বুলুর একখানা হাত চেপে ধরে বলে,—"চল ছুটে চল।"

"কোথায়।"

"হরিদাস বাবাজীর উপাসনা ঘরে।"

পথের মাঝে বুলু দেখে কারা যেন ঐ দিকেই আসছে। দুজনে আত্মগোপন করে বসে থাকে। ললিতা বিশাখা চলে যায়। উদ্যান অতিক্রম করবার সময় পিছন থেকে একজন বলে ওঠে—"ছুটছ কেন ?"

উভয়ে থমকে দাঁড়ায় লুকোবার আর পথ নেই। লোচনদাস কাছে এসে দাঁড়ালেন। পার্ব্বতী লোচনদাসকে বহুবার দেখেছে, আশ্রম নিয়ে হরিদাস বাবাজীর দুই শিষ্যের কলহের কাহিনীও সে জানতো। নিরুপায় হয়ে লোচনদাসকে সে সব কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলো।

স্তম্ভিত লোচনদাস ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—"এতক্ষণ কিছু ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাইহোক আমি চল্লাম গুরুদেবের উপাসনা মন্দিরে, তোমরা পাপাত্মার অনুচরদের দিকে নজর রাখো। যদি কোনমতে বাইরে যেতে পারো, থানায় খবর দিও রাস্তার মোড়েই থানা।

* * *

শ্যামলী এখন প্রায় উন্মত্ত—যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে সে প্রস্তুত। শিকল খোলার শব্দের পর কক্ষে প্রবেশ করলো কৃষ্ণদাস—।

শ্যামলী উঠে দাঁড়ালো, তার দুই চোখে ক্রুদ্ধাবাঘিনীর জ্বালাময় দৃষ্টি—। কৃষ্ণদাস জীবনে রমণীর এমন তেজস্বিনী রূপ দেখেনি। সে

জানতো মাদকতার বিষে শ্যামলী অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তাই প্রথমে কৃষ্ণদাস একটু হকচকিয়ে উঠেছিল। অর্গল বন্ধ করে শ্যামলীর দিকে চেয়ে বল্লো—"এমন রণরঙ্গিনী বেশেতো অভিসার চলে না শ্রীমতি—শ্যামলী রোষে ফুলতে থাকে—। কৃষ্ণদাস বিনিয়ে বিনিয়ে বলে—"ছিঃ শ্রীমতি, এমন রুক্ষতা কি প্রেমিকার শোভা পায়! একে শ্রীবৃন্দাবন, তাতে গভীর রজনী—এযে অভিসরের প্রকৃষ্টক্ষণ গো—। রাগ করেছ বুঝি, কিন্তু রাগ করা উচিৎ সেই হতভাগা বাপের ওপর, কেমন ঠিক কি না! সেইতো তোমায় জীবনের মধুময় আনন্দ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। একলা থাকায় কি জীবনে কোন সুখ আছে নাকি ?"

শ্যামলী একভাবে নিশ্চল হয়ে—দাঁড়িয়ে থাকে—নাসাপথে—নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে প্রবাহিত হয় মরুভূমির তপ্তবায়ু! কৃষ্ণদাস বুঝ্তে পারে মিষ্টি কথায় একে ভুলানো অসম্ভব,—এ মেয়ে যেন অস্ত্র ধাতু দিয়ে গড়া। অনুনয় বিনয়, ভয় ব্যকুলতা অভিশাপ ক্রন্দন কিছুই যে করে না। ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি ক্ষুদ্রতর করে কঠিন কর্কশ স্বরে কৃষ্ণদাস বলে—"ভীরকুটিতে ভয় পাবার পাত্র আমি নই। মেয়েদের ন্যাকামিপণা আমার জানা আছে।—কৃষ্ণকুঞ্জ থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি তুমিও পাবেনা, তাই সাবধান করে দিচ্ছি।" কৃষ্ণদাস এক পা দুই পা করে এগিয়ে যায়, শ্যামলী ঠিক এক ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস মনে করে ওষুধ ধরেছে,—কিন্তু কাছে যেতেই শ্যামলীর চড়ে ভুল ভেঙ্গে যায়। শ্যামলী ততক্ষণে একটু দূরে সরে গেছে

"এই থাপ্পড় খেয়েই ভয় পাবো ভেবেছিস—না হারামজাদি!—

মধুর লোভ করলে অনেক সময় হুল ফোটে তা আমি জানি।" শিকল ঝনঝন করে ওঠে,—কৃষ্ণদাস দরজার দিকে ফিরে চায়।

"দরজা খোল, দরজা খোল, না হয় ভেঙ্গে ফেল্‌বো।"

"লোচনা, লোচনাশালা ব্যাগড়া দিতে এসেছে।—"শ্যামলী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

"বড় আনন্দ হচ্ছে—না? কিন্তু হাজার ঠেলাঠেলিতেও দরজা ভাঙ্গবেনা. শাল কাঠের দরজা ভাঙ্গবার সাধ্যি লোচনা শালার নেই।"

"খোল বল্‌ছি এখনও"—কৃষ্ণদাস একটা অতি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে বলে—"ভাঙ্গনা দেখি কেমন তোর মুরোদ।—" বাইরে একটা চাপা গোলমাল উঠ্‌লো—লোচনদাস চিৎকার করে বল্‌লেন—পাষণ্ডেরা আমায় বেঁধে ফেললে,—ভগবান—ভগবানকে ডাকো।

ভগবান! ভগবানের বাবা যে এখানে আছে,—সে খেয়াল নেই বুঝি! শ্যামলীর আনন্দ দ্বিগুন বিষাদে নেমে এলো!

তৈল নিঃশেষ হওয়ায় আলোটা দপ্‌ দপ্‌ করে ওঠে—। নির্ব্বানোন্মুখ আলোক শিখা প্রতিফলিত হয় চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তির নয়নে—।

. কৃষ্ণদাস খুব কাছে এসে পড়েছে, শ্যামলী নিমেষের মাঝে লাফ দিয়ে গ্রহণ করলো ধাতুময় দেবমূর্ত্তি—তারপর – সমস্ত শক্তি প্রয়োগে আঘাত হানলো কৃষ্ণদাসের মাথায়, আলোক নিভে গেল।

অন্ধকারের মাঝেও শ্যামলী ঘন ঘন আঘাত হেনে চলে, যেন সে পাগল হয়ে গেছে। বাইরে ভীষণ গোলমাল শুরু হোল।

বারান্দায় ক্যাম্প চেয়ারে শুয়ে অলোকা দিদিকে শোনায় গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনার কাহিনী। "জানো দিদি এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ কাণ্ডটা ঘটে গেল। প্রথমে ভাবলাম এখুনি বুঝি নিভে যাবে, ওমা আগুন আর নেভে না। কালীকে ডাকতে সে বোকার মত চীৎকার করে উঠ্‌লো।"

"কালী চীৎকার করেছিল বলেই রক্ষে! জানিস অলোকবাবুর হাত দুটোও বেশ ঝলসে গেছে।

তা'হবে! যখন আঁচলের আগুন নেভাচ্ছিলেন তখনিই পুড়েছে। আচ্ছা, কাল তোমরা কখন খেলে! আমিতো এক ঘুমে রাত কর্শা করে দিলাম।"

আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সুরুচি দেবী বল্‌লেন—কাল খাবার সময় দেখ, অলোকবাবুর হাত আর মুখের কাছে উঠ্‌তে চায়না, দুটো আঙ্গুলে কেমনধারা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাবে খাচ্ছেন!

"আহা! খুব পুড়েছিল বোধ হয়!"

কথাটা বলে ফেলেই অলোকা লজ্জিত হয়ে ওঠে, দিদির মুখের দিকে একবার সে অলক্ষ্যে তাকায়।

"হাতের অবস্থা দেখে শেষে নিজেই খাইয়ে দিলাম।"

"তোমার লজ্জা করলো না!

"লজ্জা কিসের আবার, সব সময় লজ্জা করলে কি চলে? কাল যদি অলোকবাবু লজ্জা করতেন তবে কি ঘট্‌তো বল্‌তো?" গত সন্ধ্যার ছিন্ন বস্ত্রাংশ আর ভস্ম তখনও উঠানে পড়ে রয়েছে। অলোকা কাল্পনিক ভয়ঙ্করতায় শিউরে ওঠে। মনে পড়ে কি ভীষণ অবস্থার মধ্যেই না সে পড়েছিল। ছিঃ ছিঃ—, জীবনে সে কোনদিন

ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, বিছানা পর্য্যন্ত কে তাকে বহন করলো? দেহে মাত্র ব্লাউজ ভিন্ন আরতো কিছুই ছিলনা। সারা দেহ মন যেন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে! ভ্রমণশেষে প্রবেশ করলেন ডাঃ রায়।

"একি! শূন্য যে খাটিয়া শূন্য যে ঘর। বাঃ দিব্যি আরাম কোরছ তো! আর আমি বেচারী ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে আসছি!" অলোকা মৃদুহাস্যে জবাব দেয়—"ছুটে আসছেন, বেলা আটটা বাজলো তাতেও ভ্রমণ অসমাপ্ত। আচ্ছা যখন রুগীর ভীড় জমবে তখন কি করবেন বলুন তো?"

"কল্পনায় চলে যাবো তুষারমণ্ডিত পব্বত চূড়ায়, অথবা শ্যামল শস্যপূর্ণ পল্লীগ্রামে, যেখানে—"জলকে চলেলো কার ঝিয়ারী"—।

অলোকা হেসে ফেলে—বলে,—"ডাক্তার না হয়ে কবি হওয়া উচিৎ ছিল আপনার!"

"ইচ্ছেতো তাই ছিল কিন্তু সব গুবলেট করে দিলে তোমার দিদিটি। জ্যাঠা মশাইকে ভজন শুনিয়ে হাত না করলে দেখতে কবি শ্রীবাসুদেব রায় কাব্যবিনোদের পাঁচালীতে দেশ ছেয়ে যেতো, দাশু রায়ের পরেই—বসুদেব রায়!"

"কবি হওয়া যখন ভাগ্যে নেই তখন আফশোষ করে কি লাভ বল? তার চেয়ে বরং গরম চায়ে চুমুক দিলে ভালো হয় না কি?"

"অগত্যা!"

কাপে চুমুক দিয়ে বসুদেব বাবু বললেন—"বুঝলে অলোকা! এখন আর মধুর সম্পর্ক নয়, আমি চিকিৎসক তুমি রোগী।"

অলোকা দিদির দিকে চেয়ে একটুখানি হাসলো। সুরুচি দেবী

জবাব দিলেন,—"রোগীর ব্যবস্থা অনেক আগেই আমি সেরে ফেলেছি, আমিও ডাক্তারের মেয়ে। কালীচরণ একখানা খাম নিয়ে এসে বলে,—"সাইকেল-ওয়ালা পিয়নে দিলে, এটাতে সই করে ফেরৎ দিতে হবে।"

"টেলিগ্রাম।"

অলোকা বলে,—"নিশ্চয়ই বাবার।"

"ঠিক তাই.—তবে আর একটা শুভ খবর।"

দুই বোনে চেয়ে থাকে। "মানে একলা নন সঙ্গে আসছেন—বিলাস বাবু।"

"অলোকা মুখ নত করে। "উঠতে হোলে ট্রেণের তো আর দেরী নেই।" বসুদেব বাবু চলে গেলেন।

"বারান্দায় থাকিস্‌না রোদ এসে পড়লো।"

অলোকা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে—

খুব ছোট বেলায় বিলাসকে সে দেখেছে বটে, কিন্তু একেবারেই তার মনে পড়েনা। টাকা পয়সা নাকি অনেক, দু'দুটো কলিয়ারীর মালিক। দিদি কিন্তু একটুও পছন্দ করেনা। কিছুদিন আগে দিদির সঙ্গে তো বাবার বেশ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। দিদির মতে টাকা পয়সা থাকাটা কিছু নয়, লেখাপড়াটাই আসল। বাপের মতে তিনি কথার নড়চড় করবেন না, বিলাস তাঁর বন্ধুপুত্র—ছেলেবেলাকার প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেনই অর্থাৎ বিলাসই অলোকার ভাবী স্বামী। বিলাসের নামের সঙ্গে অনেক কথা জড়ানো আছে। লোকটা নাকি ভয়ানক বদরাগী কিছুদিন আগে একটা মামলায় জেল খাটতে খাটতে বেঁচে গেছে, টাকার জোরে প্রমাণিত হোল

কুলী রমণীর ওপর বেত চালানোর জন্যেই মজুরেরা বিদ্রোহী হয়, কিন্তু ঘটনা নাকি অন্য রকম। পিতাকে সে যথেষ্ট ভক্তি করে, হয়তো সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী পরিমাণেই। বাবাও একদিন তার মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অলোকা বলেছিল—"তুমি যা বিবেচনা করবে তার ওপর আমায় কিছু বলবার নেই।" বাবা হয়তো বিলাসকে সঙ্গে এনেছেন দিদিকে দেখবার জন্যে, দিদির মুখ কিন্তু খুব ভার হয়ে উঠেছে। বিলাস এ পর্য্যন্ত একবারও আসেনি, কিন্তু বাবা তার কথামতই তাকে স্কুল ছাড়িয়েছেন। বিলাসের মতে—মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার কোন সার্থকতা নেই। দিদির আপত্তি বজায় থাকেনি, দাদাবাবু কিন্তু নির্ব্বিকার—বাপ মেয়ের দ্বন্দ্বের মাঝে তিনি কিছু বল্‌তে চান্ না।

কালীচরণের কথায় অলোকার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, "বুড়োবাবু আসছেন কিনা, তাই—ঘর দোর সাফ করছি"।

"ডাক্তার বাবু কোথায় ?"

"তিনি ইষ্টিশানে বুড়ো বাবুকে আনতে গেছেন।"

অলোক পড়লো মুস্‌কিলে—এমন সময় আসাটা তার ঠিক হয়নি। "আচ্ছা আমি পরে আসবো।" অলোক চলে যাবার পর মুহূর্ত্তে সুরুচি দেবী কালীকে বল্‌লেন—"অলোকবাবু কোথায় গেলেন কালী ?" "বসবারতো জারগা নেই—তাই আর কিছু বললাম না মা, রেলের বাড়ীর এই বড় দোষ দুখানা ভিন্ন ঘর থাকে না অথচ রাক্ষুসে বারান্দা দেখনা।" "বেশী দূর বোধ হয় জান নি, তুমি ডেকে আনো কালী।"

অলোক ফিরে আসতে বাধ্য হল।

"চলে যাচ্ছিলেন যে ?"

একেবারে পালাইনি, একটু পরেই আসতাম।” “হাত খুললেন কেন? ধুলো বালি লাগলে আপনাকেই ভুগ্‌তে হবে।” “কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে বেঁধে নেবো।” অলোক একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করে—‘খোকাবাবুর মাসীমা কেমন আছে?” ফোস্কা একটু হয়েছে, ভেতরে আসুন না।” “একটু ঘুরে আসছি, ততক্ষণে ওঁরা এসে পড়বেন!” ওঁদের জন্যে আপনার বাইরে বাইরে ঘুরে কি লাভ? কাজ তো কিছু নেই।” অলোক নিরীহ বাধ্য বালকের মত কক্ষে প্রবেশ করলো।

অলোকা তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে গেল, যদিও বাঁ দিকেই তার ক্ষত, তবুও উপায় নেই সামনের দিকে মুখ করেতো আর শুয়ে থাকা যায় না। অলোক টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসে মেঝের উপর থেকে টেলিগ্রাম খানা তুলে নিল। “দেখুন তো কোথা থেকে করেছেন, কলকাতা থেকে তো?” “হ্যাঁ,” পরক্ষণে অলোক প্রশ্ন করে,—“বিলাস, বাবু কে?” “বিলাস, বাবার এক বাল্যবন্ধুর ছেলে, আপনি বসুন আমি হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে এখুনি আস্‌ছি! অলোক নিঃশব্দে বসে বসে ভাবে,—এত অল্পদিনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা কি ঠিক হচ্ছে তার? আজকেও হয়তো সুরুচিদেবী নিজের হাতে খাইয়ে দিতে চাইবেন? কালকের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু আজ? আজ সে কিছুতেই রাজী হতে পারে না, কোন মতেই না। পরক্ষণে মনে হয়—আচ্ছা এত ঘন ঘন সে কেন এখানে আসছে?

অলোক নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে—ছিঃ, সে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, এটা ঠিক নয়—ঠিক নয়। দুর্ব্বলতার কেন্দ্রটুকু মনে হতেই—অলোক নিজেকে ধিক্কার দিলো—এমন তো সে কোন দিন ছিল না। মনে পড়ে রেল কলোনীর ঘনিষ্ঠতার মাঝে লুকিয়ে

থাকে কি জঘন্য ইতরামী, পরিণামে যার অপবাদের জের মুখে মুখে চলে যায় দেশ হতে দেশান্তরে। চার বৎসর সে এখানে আছে, কত সাবধানে কত হিসেব করে তাকে চলতে ফিরতে কথা কইতে হয়, কোন দিন একটু এদিক ওদিক হলেই সর্ব্বনাশ হতে কতক্ষণ। এখানকার লোকদের সে ভাল ভাবেই চেনে, অপবাদ রটাতে এদের মত ওস্তাদ বোধ হয় কোথাও নেই। হঠাৎ সে কেন এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো ?

টেলিগ্রাম খানা নিয়ে ভাবে,—বিলাস ! বিলাসকে সুরুচি দেবীর পিতা কি শুধু বন্ধুপুত্র হিসেবেই নিয়ে আসছেন ? কি আছে পূর্ণিয়ায়,—বাংলার মত ম্যালেরিয়া পূর্ণ জংলা জায়গা। তবে ? ঠিক এইই সম্ভব। বিলাস যদি তাকে দেখে অন্য কিছু মনে করে ? সুরুচি দেবীর পিতা কি মেজাজী লোক তারও ঠিক নেই।

অলোকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো. না দুর্ব্বলতাকে সে জয় করবে। ডাক্তার রায়ের আসবার সময় হয়ে এলো, আর সে বিলম্ব করতে পারে না। অলোক জানে না যে তার দেহের উপরিভাগ প্রতিবিম্বিত হয়েছে প্রাচীরে ঝুলানো বড় আয়না খানায়, আর তার প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছে একজন পরম নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে। সহসা অলোক উঠে দাঁড়ালো,—"দেখুন, এখুনি আমাকে চলে যেতে হবে, রমণী বাবুর বাসায় অনেক কাজ আছে, অথচ কথাটা একেবারেই ভুলে গেছি। আপনার দিদিকে বলে দেবেন ?"

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত বেগে মধুবনীর পথে অলোক অদৃশ্য হয়ে গেল। সুরুচিদেবী এসে অলোকাকে জিজ্ঞেস করলেন "কোথায় গেলেন অলোকবাবু ?" অলোকা, অলোকের কথাগুলোর

পুনরুক্তি করলো মাত্র। "একটুখানি আর বসতে বললনি কেন? অলোকা নিরুত্তর। একখানা টাঙ্গা এসে দাঁড়াতেই,—কালী বলে উঠলো—"দাদু এসে গেল মা!" সুরুচিদেবী দেখেন—গাড়ী থেকে নামলো মাত্র দু জন,—যাক্ বিলাস আসেনি!

৩১

পূজা অবকাশের পর রেলকলোনীর জমজমাট একেবারেই কমে গিয়েছে। নেপিয়ার ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে চলে গেছেন। অর্দ্ধেকের উপর কর্ম্মচারী বদলি হয়েছে বনমাংকিতে। বনমাংকিকে কেন্দ্র করে মুরলীগঞ্জ বেহারীগঞ্জের দিকে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে।

নেপিয়ারের স্থানে এসেছেন রায়বাহাদুর তেজনারায়ণ সিং। সিংহের প্রথম আঘাত প'তত হয়েছে রমণী বাবুর সংসারটির উপর। নয়নাদেবকে সপ্তাহ কালের মধ্যে কোয়ার্টার খালি করে দিতে হবে।

নেপিয়ার থাকলে হয়তো কিছু হবার আশাছিল কিন্তু সিংজী বে-আইনী কাজ করেন না, অতএব আবেদন নিষ্ফল। ঠিকাদার শ্রীকিষণ বাবু অনেক রকমে সাহায্য করতেন দুঃস্থ পরিবারটির, কিন্তু জন কয়েক বাঙালীবাবুর হীন মন্তব্যের জন্যে তিনি সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। নয়নাদেবী কন্যাদের নিয়ে পড়েছেন অকূল সমুদ্রে। বোম্বে থেকে কোন জবাব আসেনি, অলোক দ্বিজেন বাবু কেউ নেই।

মানুষের জীবনে যখন দুর্দ্দিন ঘনায় তখন সব আশ্রয় আশা-ভরসা ভোজ বাজির মত অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাত্রি গভীর.—শিশু কয়টি ঘুমে অচেতন। কেবল অভাগিনী জননীর চোখে ঘুম নেই—তিনি ভেবে চলেছেন নির্ম্মম অদৃষ্টের কথা। রেল কর্ম্মচারীদের উপর তাঁর কোন অভিযোগ থাকতে পারেনা. কেনই

বা থাকবে ? যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ সেই যখন একখানা পত্র দিলনা, তখন এদের কি দোষ। রমণী বাবুর এক ভাই কিষেনগঞ্জের মস্ত ব্যবসাদার,—লোকে বলে লাখপতি। নয়নাদেবী ভাবছেন সেখানেই যাই, বাড়ীতে দাসী রাখতে হয়তো, তিনি না হয় দাসী বৃত্তিই কর'বেন সেখানে। না—তা হয়না,—গোপেন হয়তো বাড়ীতে ঢুকতেই দেবেনা। লক্ষ্মীছাড়াদের আত্মীয় বলে স্বীকার করতে সম্মানে বাধে—যে লক্ষ্মীমন্তদের ? শোনিত বিবেক এবং ধর্ম্মের চেয়েও প্রবল সেখানে আত্মসম্মান। ধনীর আত্মীয় ধনী,—আত্মীয়তা চলে সমানে সমানে।

চার বৎসর পূর্ব্বে রমণী বাবু রোগ শয্যা হতে লিখেছিলেন—

"ভাই আমি তো চলিষ্ণু, যদি কিছু ভিক্ষা দাও একবার চিকিৎসা করাতে পারি।" উত্তর দিয়েছিল গোপেনের কর্ম্মচারী—মালিকের আদেশ মত লিখিতেছি, তিনি অপাত্রে ভিক্ষা দিতে অপারক।" মামা ! মামার দুয়ারেই কি যেতে হবে ? কেন যাবোনা ? আমার অবস্থার জন্যেতো তিনিই দায়ী ! বিনাপনে পঞ্চান্ন বৎসরের বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করতে যাঁর এতটুকু বাধেনি, তাকে জব্দ করা দরকার।

দশ বৎসর—দশবৎসর মাতুলের সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদান পর্য্যন্ত বন্ধ। বিবাহের পর নয়নাদেবী—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাতুলালয় ত্যাগ করেছিলেন,—বয়েস যতই হোক—যিনি অষ্টাদশী যুবতীর অনূঢ়া-কলঙ্কের মুক্তি দাতা, তিনি মহান নিশ্চয়ই।

সন্তানদের উপর ক্রোধ জন্মায়—মুখ থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নিদারুণ অভিশাপ—"তোরা কেন এলি আমাকে জ্বালাতে, রোজতো এত যায়, তোদের নেয়না কেন যমে ?" পরক্ষণে ক্রোধ নিভে যায়, মাতৃস্নেহ মুক্তার আকারে একটি দুটি ক'রে ফুটে ওঠে। ষাট্-ষাট্ !

যেমন করে হোক তোদের আমি মানুষ করবো, শুকিয়ে মরতে দেবনা—কিছুতেই না।” কিন্তু পথ কোথায় ? ভগবান ? তুমি কি শুধু ধনীর জন্যেই খুলে রেখেছ তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার ? দীনবন্ধু দয়াময় এ সব কি শুধু কথার কথা ! মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা—ভগবান ধনীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য কিংবা তার চেয়েও হীন, ক্রীতদাস। না হলে এমন আকুল আহ্বানে তাঁর সাড়া মেলেনা কেন ? দরিদ্রের প্র'ত তোমার এতটুকু করুনা নেই—তুমি নির্ম্মম তুমি নিষ্ঠুর—তুমিই মানুষকে এমন পাষান করে তুলেছ !

বিমানদা—এতদিন তাঁকে মনে পড়েনিতো ! বিমানদার কাছেই যাই ! এখন, এতগুলি সন্তানের জননীরূপে যেতেতো বাধা নেই। বিমানদার জন্যেই মামীমা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, সে মানুষ তারও প্রাণ আছে। মামীমার ভুল হয়তো সত্যে পরিনত হতে পারতো. কিন্তু হরিহর বাবু কি ত্যাগ করতে পারেন ? শিক্ষিত পুত্রের বিনিময়ে কয়েক হাজারের মায়া। রক্ত জল করে. লেখাপড়া শিখিয়ে, বিনাপণে কি গরীবের মেয়েকে গৃহে আনা যায় ?

মনে পড়ে—কুৎসা রটানোর পর বিমান তাকে বলেছিল—“লোকের কথায় আমি ভয় করি না, কিন্তু তুমি কি সত্যিই”– ? “তুমি একথা বলছ বিমানদা ! তোমাকে যে বড় ভাই ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেই পারিনা।”বিমান ক্ষমা চেয়ে চলে গেল।

সেদিন সমস্ত রাত্রি নয়নাদেবীর চোখে ঘুম আসেনি—হায় কি করল সে—সৌভাগ্য এসেছিল বিমানের রূপ ধরে আর সে তাকে প্রত্যাখ্যানে বিফল করে দিল। মাতুল বিনাপণে বিবাহকারীকে একটি আধলা দিয়েও কথার খেলাপ করেন নি। অতি পুরাতন চেলি আর

শাঁখাই ছিল বিবাহের যৌতুক। শাঁখা ভিন্ন বিবাহ হয় না, বিবস্ত্রা করতে বিবেকে বাধে তাই! ষ্টেসনে বিমান এসে দিয়েছিল আংটি বোতাম হার আর বালা। স্বামীর প্রতিবাদে বিমান বলেছিল—"বড় ভাইয়ের দান যদি গ্রহণ করতে না চান ফেলে দেবেন।" বিমানদা মাঝে মাঝে পত্র দিত, কিন্তু অনেকদিন বন্ধ আছে, না, সেখানেও সে যেতে পারে না, হয়তো বিমানদা বিপদে পড়বেন!

অসীম সমুদ্র বক্ষে কাণ্ডারী বিহীন নৌকার মত অবস্থা আজ নয়নাদেবীর। তরঙ্গাঘাতে নৌকা যেমন কখনও ভেসে উঠে পরক্ষণে ডুবে যায়, ঠিক তেমনিই—অসহায়া নারীর মনে পড়ে কত কথা সঞ্চার হয় আশার পরমুহূর্ত্তে দ্বিগুন নিরাশা নিয়ে—বাধা বিপত্তি এসে সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—তবু চিন্তার বিরাম নেই।

রজনীর শেষ পর্য্যায়,—অস্তাচলগামী খণ্ডিত শশধরের পাণ্ডুর আলোক পতিত হয়েছে কক্ষ মাঝে। সমস্ত রেল কলোনী সুপ্তিমগ্না নিদ্রাদেবী ও বঞ্চিত করেছেন চিরবঞ্চিতাকে। "আর ভাবতে পারিনা, যা হবার হোক, ভাগ্য ভিন্নতো পথ নেই।" ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে মাথাটা নুয়ে আসে। কাল সকালে সহরের দিকে যাবো, অনেক বাঙালীতো আছে, রাঁধুনী না হয় ঝি! বিস্তি বিস্তিতো খুব খাটতে পারে, খুব পরিশ্রমী মেয়ে, তারও কিছু একটা জুটে যাবে। ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নেওয়ার জন্য তো বড় লোকের বাড়ীতে বিস্তির সমবয়সীরা কাজ করে। জুটে যাবে—জুটে যাবে নিশ্চয়ই।—

—"রেলি ব্রাদার্স ভিন্ন কি অফিস নেই, নিশ্চয়ই জুটে যাবে, তুমি ভেবোনা।" "তিনমাস ধরে দরজায় দরজায় ধন্না দিলাম, কেউ কি চাইলে, ভাগ্যে ছিলেন যোশেফ সাহেব, তাই দুমুঠো খেতে পাই।

দেখ মনে করছি খৃশ্চান হব। ধর্ম্ম দিলে পাদ্রীর দয়ায় কাজ জুটবে কি বল? আপনি বাঁচলে বাপের নাম—কাল—কালই—।"

শশব্যস্তে নয়নাদেবী উঠে বসেন—কণ্ঠ শুষ্ক সর্ব্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত।

স্বপ্ন—? কিন্তু কি পরিষ্কার! —"তোমায় দোষ দিয়েছি বলে ক্ষমা কর। জানি পরলোকে গিয়েওতো তোমার শান্তি হয়নি? চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। অকস্মাৎ নয়নাদেবীর দুই চোখে জ্বলে ওঠে বিদ্বেষের তীব্র অনল, নৈরাশ্য ব্যথিত—হৃদয়ের প্রতিটি স্নায়ুকেন্দ্র শিরা উপশিরা হয়ে উঠলো আবেগ চঞ্চল।প্রতিশোধ.—সমাজের নির্ম্মমতার প্রতিশোধ। স্বামী পথনির্দ্দেশ করেছেন, আর দ্বিধা নয় সঙ্কোচ নয়, ধর্ম্মত্যাগই একমাত্র পথ। মনে পড়ে চার বৎসর পূর্ব্বেকার শিলিগুড়ির কথা, "তখন বাধা না দিলে ভালই হোত! বৈকালে এদিকে বেড়াতে আসেন পাদ্রী রবার্টসন, তাঁকেই জানাই সব। লোকে ধিক্কার দেবে,—বয়ে গেল! এক কথায় দশকথা শুনিয়ে দেবো—যে সমাজে রক্ষার ব্যবস্থা নেই তার টিটকারী দেবারও অধিকার নেই, পচে মরুক সনাতনী হিন্দুসমাজ আমি খৃশ্চান হবই।" হিন্দু হিন্দুর বিপদে দাঁত বের করে হাসতে পারে কিন্তু সাহায্য করতে পারে না। তা না হলে বাংলার হিন্দু সংখ্যালঘু হল কি করে? সংকল্প দৃঢ়তর হয়ে ওঠে, শরীরে আসে শক্তি, মনে জন্মায় দৃঢ়তা।

৩২

মুমূর্ষু মাতার স্নেহবিজড়িত মিনতি, ভ্রাতার অনুরোধ, অপূর্ব্বর আদেশ আবেদন—সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে. মানসী ছুটীর পরই চলে এসেছে। অপূর্ব্ব পড়েছে মুস্কিলে—মানসী কথা কয় কম—না, হ্যাঁ, আচ্ছা

ভিন্ন অন্য সব শব্দ যেন সে ভুলে গিয়েছে। কখন যে সে খায় আর কিইবা খায়, অপূর্ব্ব বুঝে উঠতে পারে না। এতদিনের মধ্যে মাত্র সেদিন মানসী দীর্ঘ একঠানা কথা বলেছে—

"হাওয়া খেয়েতো মানুষ বাঁচতে পারে না? খাই নিশ্চয়ই"। কাল সন্ধ্যায় অপূর্ব্বর চোখে না পড়লে হয়তো মানসী উনুনের আগুণেই পুড়ে মরতো, মাঝে মাঝে হয়তো সে অজ্ঞান হয়ে যায়, অপূর্ব্ব ভেবে পায়না কি করবে সে? ডাক্তারের নামে মানসী প্রতিবাদ জানায়, কলকাতায় বড় ডাক্তার এনেও কোন ফল হয়নি। মানসী পরিষ্কার বলে দিল "কিছুই আমার হয়নি শুধু শুধু কি পরীক্ষা করবেন বলুন?"

কাল রাত থেকে মানসী নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, যন্ত্রণা যে কোথায় আর তার রকমটাই বা কেমন ধারা সেটা বুঝা মুস্কিল। অপূর্ব্ব সমস্ত রাত্রি জেগে কাটিয়েছে, যদিও মানসী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরেই তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল। সকালের দিকে ডাক্তার রায় অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেছেন আজ, অপূর্ব্ব এখনো ফেরেনি—। মানসী শুয়ে শুয়ে ভাবে—যদি খুব ভীষণ একটা কিছু হয়ে থাকে, তবে বেশ হয়? বাঁচার ইচ্ছাআর তার নেই। পরক্ষণে মনে পড়ে—অপূর্ব্বর কি হবে? তার প্রতিজ্ঞাই বা কি করে সে রক্ষা করবে? অভিমান ক্ষুব্ধ হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে —চেষ্টার বিরাম সে তো কিছু করেনি, কিন্তু যা হবার নয়, তার সে কি করতে পারে? ভাগ্যের উপর মানুষের হাত কতটুকু? পরিষ্কার বুঝতে পারে—কি ভয়ঙ্কর রকম সে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, সময় সময় মাথার ভিতর কেমন দপ্ দপ্ করে ওঠে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তার নেই।

অনেক সময় হাজার চেষ্টাতেও হারিয়ে যাওয়া কথা কিছুতেই মনে করতে পারে না অথচ কি প্রখরই না ছিল তার স্মৃতিশক্তি। বেশ মোটা রকম ছুটো বোঝা নিয়ে অপূর্ব্ব গৃহে প্রবেশ করলো। ক্ষুদ্র টেবিলটার উপর ওষুধের শিশি আর ফল সাজাতে সাজাতে অপূর্ব্ব বলে,—"একটা লোক ঠিক করে এলাম, রান্না আর অন্য সব কাজ সেই করবে।" মানসী জবাব দিল না। "কম করে বার চারেক ফল আর দুধ খেতে হবে।" "ও আমার সহ্য হয় না।" "সহ্য হয়না বললে চলবেনা, অল্প মাত্রায় খেয়ে সহ্য করাতেই হবে।"

মানসী ধীরে ধীরে চাদরখানা শরীরে আবৃত করে পুনরায় শুয়ে পড়লো। অপূর্ব্ব জানে এইবার চক্ষুমুদ্রিত করে নিদ্রার ভান করবে মানসী। "ওষুধ আর একটু ফল খেয়ে ঘুমোও!" মানসী পাশ ফিরে শুলো। অপূর্ব্ব ওষুধের গ্লাস আর ফলের ডিসহাতে শয্যাপার্শে এসে দাঁড়ালো—"কতক্ষণ আর লাগবে, খেয়ে নাওনা?" "পরে খাবো।" অপূর্ব্ব নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসের বেলা হয়ে আসছে—অথচ এখনও স্নান হয়নি আহার না হয় নাই হোল! এক বর্ষিয়সী বিধবা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। "কি নাম তোমার,—নিতাইয়ের মা?" "হ্যাঁ বাবা!"

"দেখ কাজ বেশী কিছু নয়, সব সময় কাছে থাকা আর দু'বেলা রান্না। মোটকথা নিজের মত সব দেখতে হবে বুঝলে?"।

বিধবা সম্মতিসূচক ভাব দেখালো। "একটু পরেই দুধ আসবে, জ্বাল দিয়ে, ঠিক একটার সময় খেতে দিও।" মানসী ধীরে ধীরে

উঠে বস্‌লো, অপূর্ব্ব ওষুধের গ্লাস এগিয়ে দিতে মানসী বেশ সহজ স্বরে বলে, —"ওষুধ আমি খাবোনা, লোক রাখতেও দেব না।"

"কেন?" 'এমনি, কোন রোগতো হয়নি যে ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকবো।"

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করে বলে,—"ডাক্তারে কি বলেছেন জানো?" "না।"

"শুনবে?" "না!" "না শুনলেতো চলবেনা, আমারও বলা উচিৎ।" "বল?" "আগে ওষুধ খাও!" ওষুধ খেয়ে মানসী বলে,—"কি বলেছে—থাইসিস্?" "না।" "তবে?"

"বলছি ফল খাও!"

মানসী ফলের ডিসখানা কাছে টেনে নিল।

"নিতাইয়ের মা, কুঁজোর জলটা ফেলে টাটকা জল আনতো!"

নিতাইয়ের মা চলে যাওয়ার পর মানসী বলে,—"কই কি বলেছে বললে না?"

"ওষুধ আর ফল খেতে হবে, সেই সঙ্গে চাই বিশ্রাম। আমার জন্যে নয়—তোমার জন্যেও বলছিনা। আর একজন—আর একজনের"—!

মানসীর হাত থেকে চিনে মাটীর ডিসখানা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সুস্বাদু ফলের টুকরা হয়ে উঠলো বিস্বাদ।

"তুমি সন্তানের জননী!"—অপূর্ব্ব চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে মানসী চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে—অপূর্ব্ব কি তাকে পরিহাস করে গেল? কিন্তু, কিন্তু যদি সত্য কথাই বলে থাকে? না-না এ অসম্ভব! মাথায় বাতাস করছে কে? অপূর্ব্ব অফিসে গেছে, পরিষ্কার জুতার শব্দ তার কানে এসে বেজেছে।

চোখ চেয়ে দেখে নিতাইয়ের মা। "কি মা ?" "একটু জল দাও তো মাথাটা ধোবো।" "তুমি উঠোনা মা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" নিতাইয়ের মা সযত্নে সস্নেহে মাথা ধুইয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়ে মানসীকে শুইয়ে দিল।

"আচ্ছা নিতাইয়ের মা শরীর কি খুব খারাপ দেখাচ্ছে ?" "প্রথম কয়েক মাস এমনিই হয়, তার পর আবার শুধরে যায়!" মানসী লজ্জা বোধ করে,—এও সব বুঝতে পেরেছে ?

"কাগজেতে বাবু সব লিখে দিয়েছেন, তুমি একবার বুঝিয়ে দিলে আর কিছু অসুবিধে হবে না মা!" "কই দেখি কাগজ—" দীর্ঘ একটা ফিরিস্তি, ঘড়ি ধরে সময় নিরূপণ করে, ঔষধ আর পথ্যের ব্যবস্থা—।

পূর্ণিয়া কোর্ট থেকে বনমাংকি জংসন পর্য্যন্ত আজ থেকে ট্রেণ চলাচল সুরু হবে। উদ্বোধন উপলক্ষে সমস্ত কাজ কর্ম্ম তিনদিন বন্ধ, বেশীর ভাগ কর্ম্মচারী জড়ো হয়েছে—বনমাংকিতে। আশে-পাশের গ্রাম উজাড় করে গ্রাম্য নরনারী ভিড় করেছে লাইনের দুপাশে। প্ল্যাটফর্মে নবাগত ষ্টেশন মাষ্টার ছুটাছুটি করছেন—। স্পেশাল ট্রেণ আসবার সময় হল অথচ কি বিভ্রাটেই না তিনি পড়েছেন। কোটের বোতাম দুটো পাওয়া যাচ্ছে না, প্যান্টের উপর কালি লেগে অষ্ট্রেলিয়ার মানচিত্র ফুটে উঠেছে,-সবচেয়ে বিপদ হয়েছে মোজা নিয়ে। এক রংয়ের দুটি মোজা না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত দুই পায়ে কালো ও বাদামী চড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আসছেন তিনি। অলোক বহুরূপীর বেস দেখে হেসে ফেলে।

"হেসোনা ভায়া, বুইলে কিনা রামরঞ্জন সেন কোম্পাণীর পুরোনো কর্ম্মচারী, হুঁ হুঁ বাবা পয়েণ্টস ম্যান. থেকে ষ্টেসনমাষ্টার! বুইলে কিনা চারটি খানিক কথা নয়। ও বাপ অম্বরীশ, একবার ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি আমার চুড়োটা এনেদাও বাপধন্।"

অম্বরীশ অর্থাৎ টালি ক্লার্ক অমর নাথ ছুটলো টুপী আনতে।

"অন্তু মোজা হলে চলবে, এনে দেবো।"

"তাহলে বুইলে কিনা মন্দ হয় না, কি আর এমন বেমানান, বয়ে গেছে বদলাতে। বুড়ো বয়সে এ ক্লাস ষ্টেসনের চার্জ্জ দিলে তাও কি কম তেল খরচ হয়েছে,—বুইলে কিনা, অয়েল ফাই করতে করতে গেলাম।" রাম রঞ্জন বেশ জোরে হেসে উঠলেন। বুইলে কিনা অর্থাৎ বুঝলে কিনা শব্দটি সেন মশায়ের মুদ্রাদোষ। সময় সময় বুইলে কিনার মাত্রাধিক্যে নিজেই হেসে ফেলেন—বুইলে কিনা এটা একটা বুইলে কিনা।

লম্বা পুরু গোঁফ জোড়ায় মোচড় দিতে দিতে ছুটে আসে ওভারসিয়ার কুমুদ ঘোষ—মাষ্টার মশাই শাশিতে টেলিগ্রাফ করে দেখুন দেখি—কি ব্যাপার!

"ব্যাপার আবার কি, বুইলেন কিনা মন্দা প্রভুরা এখনও কাঠিহার থেকে রওনা হননি—বুইলেন কিনা, রওনা হলে টক্কাটরে এতক্ষণ নাস্তানাবুদ করে দিত।" অমর নাথকে শুধু হাতে ফিরতে দেখে ষ্টেসন মাষ্টার চটে উঠলেন—"কিগো টুপি পেলে না বুঝি।" "আজ্ঞে না, সব তো খুঁজলাম।"

"যত সব, বুইলে কিনা, যত সব আজ গুবি কাণ্ড কারখানা, যাই আমিই দেখি।"

প্ল্যাটফর্মের উপর ঠোঙ্গা আর কাগজের টুকরা দেখে কুমুদ ঘোষ চটে—উঠলেন "এ সব কে ফেলেছে! আঃ একটা দিন ও কি একটু পরিষ্কার রাখতে দেবে না, খুঁ-উখ্।" মেজাজ চটে উঠলেই কুমুদ ঘোষের গলা থেকে "খু উখ্" শব্দটা বেড়িয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে গোঁফ জোড়ায় চাড়া পড়ে।

"অলোক তুমি থাকলে প্ল্যাটফর্ম ইনচার্জ্জ—সমস্ত যেন ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করে। মুরগী ডিম কিছুই এলোনা এখনও, ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি!" হন্ হন্ করে কুমুদ ঘোষ চলে গেলেন। কুমুদ ঘোষ ভাগ্যবন্ত পুরুষ। এক বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং—পড়েই তিনি স্থাপত্যশিল্প সম্পুর্ণ আয়ত্বে এনে ফেলেছেন তাই আর পাঠ শেষ করার প্রয়োজন হয়নি। আসলে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রেল কর্ম্মচারী তাঁর বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি। ছাত্র জীবনের যোগাযোগ এখনও বহু পরিশ্রমে তিনি বজায় রেখেছেন। সাধারণের সামনে পদস্থ কর্মচারীর তিনি অতি আজ্ঞাবহ বিনীত বিনম্র কর্ম্মচারী—কিন্তু অন্তরালে চলে প্রাণ খোলা ঠাট্টা ইয়ার্কি। "তোরা যদি সব জেনে শুনে ফ্যাসাদ বাধাস্ তবে যাই কোথায় বল দেখি—?" মোট কথা কুমুদ ঘোষ চাকরী বজায় রাখেন শ্রেফ ভড়ং আর মুখের তোড়ে। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে গড়াই নদীর জরিপের কাজে গিয়ে তিনি পড়েছিলেন মহা বিপদে।

প্রথম প্রথম বেশ আরামেই দিন কাটছিল—অফিস ম্যানেজ করতে কুমুদ ঘোষ মহাপটু—জরিপের কাজ তো শেষ করে গেছেন ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত। হঠাৎ উপর ওয়ালা লিখে পাঠালেন খানিকটা জায়গা "রি-সার্ভে করে "রিপোর্ট" পাঠাও! কুমুদ ঘোষ শেষ

পর্য্যন্ত ছুটলেন সেনগুপ্তের কাছে—সেখান থেকে কাগজ পত্র ঠিক করে—কাগজের নিচে কায়দা দূরস্ত সই করে, রিপোর্ট পাঠালেন কলকাতার হেড অফিসে। প্রায় প্রত্যেক কনস্ট্রাকসনে কুমুদ ঘোষ আসেন শেষ সময়ে অর্থাৎ ফিনিসিং টাচ্ দিতে। সেনগুপ্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাজ উঠিয়ে বদলি হবেন কালুখালি—ভাটিয়াপাড়ায় কাজেই কুমুদ ঘোষ পূর্ণিমার ওভারসিয়ার অফিস যথারীতি ম্যানেজ করে যাবেন।

তোবড়ানো টুপিটা হাতে নিয়ে রামরঞ্জন সেন এসে উপস্থিত।

"না যায় প্রাণ কাকুতি সার," । খুব একচোট হেসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সকলকে বললেন - বুইলে কিনা না যায় প্রাণ কাকুতি সার— অর্থাৎ বুইলে কিনা প্রাণ বের হয় না, কেবল কাকুতিতেই সার, বুইলে কিনা, কি দুর্ভোগ—?

টুপিটা ছিল ঘুঁটের বস্তায়, বাপ অম্বরীশ পাবে কোথায় বলদিকি।"

সকলে হেসে উঠলো। "আঃ বেশ পাঁপড়ের গন্ধ বেড়িয়েছে ত, খাবে নাকি গো! প্ল্যাটফর্মের বাইরে যেন মেলা বসে গিয়েছে। পাঁপড় ডাল বুট ইত্যাদি তৈল পক্ক লালসাকর খাদ্যদ্রব্য খুব জোর বিক্রি চলছে। কখনও একটানা সুরে শোনা যাচ্ছে গু—লা—ব ছ—ড়ি, টুং টুং টুং। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে সেন মশাই বললেন—

"হবেত? না হয় আর একটা নাও।

একজন বলে—তেলে ভাজা খেয়ে পেট ছাড়বে যে?

"খাঁটি তেলে অসুখ করে? বল কি গো—? দেখি—দেখ পেটটা দেখি—।

বেচারী বিব্রত অবস্থায় বলে—"না না পেটে কিছু হয় নি।"

রামরঞ্জন ততক্ষণে জামা তুলে ফেলেছেন। "কিছু হয়নি কি গো। এযে আট মাস পোয়াতির অবস্থা। পেট জোড়া ছেলে নিয়ে কাজ করছ কি করে হে!"

খুণ এক চোট হাসির হল্লা উঠলো—। "বুইলে কিনা কিছু ভয় নেই, ইচ্ছেমত খাও দাও, কেবল সকালে রোজ আমার কাছে "সিয়োনো থাস—কিউ" পাঁচফোটা করে পনর দিনে—বুইলে কিনা? বাছাধন বাপ বাপ জপতে জপতে বুইলে কিনা যাকে বলে পগার পার, বুইলে কিনা বাপধন—বুইলে কিনা!" নিজেই আর একচোট হেসে উঠলেন।

মাষ্টার মশাই টেলিগ্রাফ এসেছে, রামরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন, অন্য সকলে পিছু পিছু চললো। পূর্ণিয়া জংসন থেকে স্পেশাল ট্রেণ রওয়ানা হয়েছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বে।

কুমুদ ঘোষ অপূর্ব্ব পোষাকে সজ্জিত একদল লোককে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে বসিয়ে রাখলেন। ট্রেণ আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা ঐক্যতানে অভ্যর্থনা জানাবে কোম্পাণীর মহাপ্রভুদের। সৎলোকে জানে ব্যাণ্ড পার্টির খরচা দিয়েছেন কুমুদ ঘোষ নিজের পকেট থেকে, কিন্তু কুলোকেরা আড়ালে বলে—ঠিকাদারের মোটা টাকা যাবে কুমুদ ঘোষের পেটে।

ঝক্ ঝক্ খচ্ খচ্ শব্দে ৬০৯ নং ইঞ্জিন খানা এসে দাঁড়ালো। ইঞ্জিন থেকে নামলেন ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত আর 'পি, ডাবলিউ, আই, বেরী। প্রভুদের শুভাগমনের পূর্ব্বে সমস্ত লাইনটুকু তাঁরা একবার ভাল করে দেখে নিলেন। দুজনের সাজ পোষাক একেবারে কেতাব দুরস্ত

বেরীর হাতে আজ বেত নেই কিন্তু সেনগুপ্তের হাতে নক্সার এক মস্ত বোঝা।

কুলীর মাথায় বিরাট ঝাঁকাভর্ত্তি মুরগী নিয়ে এলো ওয়ার্কমিস্ত্রী সত্যনারায়ণ সরকার। কুমুদ ঘোষ চটে লাল—হুঁঃ যদি একটু দায়িত্ব থাকে,—রামদার দরকার আছে নাকি?

"আগে ঘোমটা খুলে শ্রীবদন দেখাও, তারপর বুইলে কিনা দরকার অদরকারের কথা। দাও ঐ চারটের ট্যাং বেঁধে দাও।"

"চারটেই যে সেরা মাল!

"তা হোক ঐ চারটেই দাও ভায়া—বুইলে কিনা 'টি—এম' বেটাকে দিলে, বুইলে কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলং বুইলে কিনা মুরগী মেরেই।"

দূরে বিকট শব্দে বোমা ফাটলো। কুমুদ ঘোষ বলে উঠলেন "এই সব তৈয়ার হো যাও—এসে গিয়েছে—জিরানগঞ্জের পুল পেরিয়ে গাড়ী এসে পড়লো।"

ধীরে ধীরে দশখানা সেল্যুন কারের স্পেশ্যাল ট্রেণখানা এসে দাঁড়ালো—। ব্যাণ্ড ব্যাগ পাইপ ড্রামের আওয়াজ ছাপিয়ে জনতার চিৎকার উঠলো—

"তেজ নারয়ণজী কি জয়—"

৩৪

পূর্ণিয়া কোর্টের ভাঙ্গাহাট যেন একটু জমে উঠেছে।

গীতা—শ্যামলী ও বুলুর বিয়ে। যমুনাদেবী বৃন্দাবনেই মারা গেছেন। কৃষ্ণদাসের মামলায় সংবাদপত্রের মারফতে শ্যামলী বুলুর পরিচয় হয়েছে দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে। হয়তো এত শীঘ্র বুলুর

পাত্র জোগাড় করা সম্ভবপর হত না. কিন্তু সদ্য আগত য়্যাডিসনাল ইঞ্জিনিয়ার সুনির্ম্মল রায় উপযাচক হয়ে পানিপ্রার্থণা করেছেন বুলুর। শ্যামলীর সম্বন্ধ বহু পূর্ব্বেই স্থির হয়েছিল. পাত্র পাটনার উকিল। গীতার ভাবী স্বামী সুমিত্রার দেবর অনিমেশ। সুমিত্রাই ঘটকালী করেছে, দুই বোনে বেশ থাকবে এক সংসারে। অশ্বিণীবাবু স্থির করেছেন—বিবাহের পর পাওনা ছুটির দরখাস্ত করবেন, ছুটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মজীবনের ও অবসান। বিভূতি সিংহকে অবশ্য কিছুদিন থাকতেই হবে কিন্তু তিনিও বদলীর চেষ্টায় আছেন, সিংহের থাবা বাঁচিয়ে চলতে হলে বদলি ভিন্ন পথ নেই। এর মধ্যেই কথা রটেছে—বড়বাবুর কোয়ার্টারের ফার্ণিচার নিয়ে রীতিমত ব্যবসা করা চলে। তেজনারায়ণ সিং শশী সেনগুপ্তের হিসাব নিকাশের জন্য কড়া নোট দিয়েছেন সাবষ্টোরকিপারকে। বিবাহ উপলক্ষে একসঙ্গে বহু কর্ম্মচারীকে তিনি অবশ্যই ছুটি দিতেন না কিন্তু সুনির্ম্মল রায়ের বরযাত্রীদের আটকাবার সাহস শেষ পর্য্যন্ত কুলিয়ে ওঠেনি। অলোক দ্বিজেনবাবু ভোলানাথ সত্যনারায়ণ ছক্কু ইত্যাদি তিন ভাগ কর্ম্মচারীই চলে এসেছে পূর্ণিয়া কোর্টে।

পাটনার বরযাত্রী দলটিও বড় কম নয় ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় শ খানেক লোক এসেছে। রসৌন চৌকি ব্যাগপাইপ সকাল থেকে বেজে চলেছে। বাদ্যভাণ্ডে অনেকেরই আপত্তি ছিল কিন্তু ঠিকাদারের দল নাছোড় বান্দা। তারা যদি আমোদ করতে চায় তবে আপত্তি কিসের? একজন হয়তো দু'দিন বাদে নিশ্চয়ই কোনও কনস্ট্রাকশনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হবেনই। তুটি বিবাহ আসর অবশ্য হয়েছে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব একস্থানেই আয়োজনের পরিমাণও

যথেষ্ট, জমিদার কিংবা রাজ রাজরার পক্ষেও যা অসম্ভব, তাই ঘটে উঠেছে—তিনদিনের মধ্যে—ঠিকাদারেরা যে 'ময়'—'বিশ্বকর্ম্মার' বংশধর।

চীৎকার হাঁক ডাক গান বাজনায় পূর্ণিয়া কোর্টের সজীবতা দ্বিগুণমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ রঙ্গরস হাসি তামাসাও চলছে। কিছুক্ষণ আগে পাটনার এক ছোকরা বরযাত্রী খুব জব্দ হয়েছে—সব 'চা'—ই তার কাছে যেন সরবৎ, ঠাণ্ডাচায়ের অজুহাতে কম করে পাঁচবার সে পেয়ালা ফেরত দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিজেন বাবু ডিসের উপর পেয়ালা উল্টিয়ে নিজে গিয়ে হাজির। অসাবধানে পেয়ালা তুলতে গিয়ে বেচারীর জামা কাপড় গেল ভিজে, চললো একচোট বেশ ঠাট্টা ইয়ার্কি।

দিলীপ আজ খুব ব্যস্ত— কলকাতা বাসীদের নিয়ে সে পূর্ণিয়া চষে বেড়াচ্ছে। যদিও স্থান সম্বন্ধে মন্তব্যের বিরাম নেই, কলকাতা ওয়ালাদের চোখে সবই অকিঞ্চিৎকর—পূর্ণিয়া সিটি না ছাই, জমিদারের চিড়িয়াখানা - না হাতী—দুটো বাঘ থাকলেই "জ্যু" হলনাকি? কেবল নির্ম্মীয়মান আদালত বাড়ীটা তাদের একটু চোখে ধরেছে —হ্যাঁ তৈরী হলে মন্দ হবেনা। মুখে যাই বলুক ঠিকাদারের নূতন মোটরে চড়ার সখ যেন আর মিটতে চায় না।—এই জন্যেই তো আসা নইলে কলকাতা থেকে এই পচা সহরে কি দেখতে এসেছে—তারা।

সকাল থেকেই শ্যামলীর মন আজ ভাল নেই, বাড়ী ভর্ত্তি লোক কিন্তু সব যেন তার কাছে ফাঁকা। মায়ের ফটোর সামনে চোখের জল মুছে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, এমন করে মাকে তার কোন দিন মনে পড়েনি। মামীমারা কত বোঝায় শ্যামলী জবাব দেয়না। কুনুর

সৌভাগ্য সম্বন্ধে বড় মামীমা না কি আগেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, সেই জন্যেই তো সেই প্রফেসারের সঙ্গে বিয়েতে তাঁর মত ছিলনা।

বুলু আজ খুব গম্ভীর—সে ভাবছে তার স্নেহময় মেশোমশায়ের কি অবস্থা দাঁড়াবে তাদের দুবোনের অবর্ত্তমানে।

লোকজনের ভীড়ের মাঝে দিলীপ দুবার আজ গীতার সঙ্গে কথা বলেছে অনেক দিন পর। অনিমেশের চেহারা খুব সুন্দর—তবু দিলীপের মন্তব্যে গীতা আহত অভিমান ভরে চেয়ে থাকে। দিলীপ বলে "আচ্ছা আচ্ছা আর বলবনা ঠাট্টা বুঝতে পারিস না।"

অনেকে আলোচনা করছে বৃন্দাবনের ঘটনা নিয়ে—এমন বাহাদুর মেয়ে বাঙালীর ঘরে জন্মায় না—কৃষ্ণদাসের ফাঁসী হওয়া উচিৎ ছিল বেটা, ভণ্ড যে কত সংসার ছারেখারে দিয়েছে তার কি ইয়ত্তা আছে। বাস্তবিক লোচনদাসের মত সন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া ভাগ্যের কথা। অভাগিনী পার্ব্বতীর জন্যে অনেকে ধিক্কার দেয় তার জন্মদাতাকে, হতভাগিনীর আশ্রয় হয়নি তার পিতৃ গৃহে।

রাত্রি বারোটার আগে লগ্ন নেই, সন্ধ্যা থেকেই খাওয়া—দাওয়া চলছে—ছোট ছেলে মেয়ের দল খুব গোলমাল করে খাচ্ছে অন্য দিকে মেয়েদের জায়গা করা হয়েছে কিন্তু এত সকালে কেউ খেতে চায় না।

"হোলই বা শীতকাল, তা বলে সাত সকালে খাওয়া পোশায় না বাপু—" বিভূতি বাবু—বললেন—মেয়েরা যদি বসতে না চান. পাতা সব উঠিয়ে ফেলো অলোক।

তুমিই অলোক ?

অলোক ফিরে চায়, পিছনে দাঁড়িয়ে গেরুয়া পরিহিত এক প্রৌঢ়।

"বন্ধু আমার জামাই, এবার চিনেছ নিশ্চয়" অলোক নমস্কার

জানালো। বেঁচে থাকো বাবা সুখে থাকো। সেদিন ভাগ্যে তুমি ছিলে। আমার বড় মেয়ের মুখে তোমার নাম প্রায় শুনি, এ বাড়ীতেই এসেছে দেখা করবে না কি ?

"অলোক—অলোক! ভাঁড়ার ঘরের দিকে অলোক চলে গেল।

রানু আজ খুব সাজ গোজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ে বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়েদের সাজসজ্জার একটু ঘটা করে যাওয়াই উচিৎ, বিবাহ বাড়ী স্বয়ম্বর সভার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।—অবিবাহিত কোন যুবকের চোখে ভাল লাগাটা মা বাপ এবং কন্যার পক্ষে মোটেই দোষনীয় নয় যে, পানের ট্রে নিয়ে বিল্টু বলে "এই রাণু ওঘর থেকে পান এনে দাও তো, হ্যাঁ, চুন আনতে ভুলোনা যেন ? পান নেবার সময় বিল্টু আস্তে আস্তে কি বললো। রাণু চারিদিকে চেয়ে জবাব দেয়—বাসায় তালা দেওয়া যে! কোন একটা ছুতো করে মার কাছ থেকে নিয়ে নাও—বুঝলে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাবো যদি কেউ দেখে ফেলে! অত ভয় করলে চলেনা, এমন দিন আর পাবে না কি ? পানের ট্রে নিয়ে বিল্টু দিল ছুট।

দুই বিবাহ মণ্ডপের চার পাশে দানসামগ্রী ভিন্ন নানাপ্রকার উপহারে ছেয়ে গেছে,—যেন দোকান খোলা হয়েছে। শাঁখ বেজে উঠলো, আসরে উপস্থিত হলেন সুনির্ম্মল আর ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সুন্দর কিন্তু রঙ ভীষণ কালো রুক্ষ মুখের উপর চন্দনের রেখা কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।—শুভ্র খদ্দর ভূষিত সুনির্ম্মল রায়কে কোন মতেই বর বলে চেনা যায় না। অশ্বিনী বাবুর বাসায় খুব জোর হুলুধ্বনি উঠলো, বরযাত্রীরাই উলু দিচ্ছে—হুঁ: মেয়েদের বুকে কি আর জোর আছে যে শাঁখ বাজাবে না উলু দেবে! বনমাংক থেকে শেষ ডাউন ট্রেন খানা চলে গেল। দুই কন্যাকর্ত্তাই মনঃক্ষুণ্ণ এই

ট্রেনে আসবার কথা ছিল তেজ নারায়ণ সিং কুমুদ ঘোষ আর ভবেন বাবুর—কিন্তু কেউ এলো না।

নেপিয়ার ইস্তফা দেওয়ায় সুবিধা হয়েছে একমাত্র ভবেন বাবুর। তিন বৎসরের মধ্যে এষ্টাব্লিশমেণ্ট-ক্লার্কের কর্তামন্তব্যের একখানি টুকরাও হেড অফিস পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি। মহামান্য কোম্পানী বাহাদুরের এই এক নিষ্ঠ সেবকের সব পরিশ্রম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। জগতে এক শ্রেণীর জীব আছে যারা অপরের উন্নতিতে জ্বলে ওঠে, অনিষ্ট করার অপেক্ষায় চাতুরীর আশ্রয় নেয়—হিংসা বৃত্তির সফলতায় আনন্দের সীমা থাকেনা। ভবেন বাবু এই শ্রেণীর লোক, পরশ্রীকাতরতা আর অহেতুক বিদ্বেষ তাঁর প্রতি অনুপরমাণুতে সংক্রামিত হয়ে রয়েছে।

খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ পিঙ্গল চক্ষু বিশিষ্ট লোকটিকে প্রথম জীবনে অনেক স্থানেই অপদস্থ হতে হয়েছে, কয়েকবার বিদ্রোহী তরুণের কাছে উত্তম মধ্যম ও খেয়েছেন, কিন্তু স্বভাবের ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। সময় সময় উপযুক্ত কানপাতলা উপরওয়ালার সংস্পর্শে মনিকাঞ্চন যোগ প্রভাবে অপরের সর্ব্বনাশ করে গুছিয়ে নিয়েছেন স্বীয় স্বার্থটুকু। তেজ নারায়ণ সিং আসার পর তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। অল্পদিনের মধ্যে—জগু বাবু শশী বাবু আশু লাহিড়ী কালী শীল ইত্যাদি ভিড়ে গেলেন তাঁর দলে। জগু বাবুর অভিযোগ সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত, ওভারসিয়ার সেন গুপ্ত স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্ট পেল, দু—দুবার অথচ তাঁর বেলায় অষ্টরম্ভা। আশু লাহিড়ীর

শ্যালক তিন বৎসর ধরে ড্রইং অফিসে পচছে—বেতন বৃদ্ধির নাম গন্ধ নেই অথচ আউটডোর ওয়ার্কারদের মাইনে বাড়ছে প্রতিমাসে। ওয়ার্কমিস্ত্রি শিলদাস শতের কোটা ছাড়িয়ে গেল। অন্য সকলকে সহ্য করতে পারলেও ওভারশিয়ার সেনগুপ্ত আর দেবেন ফিটারকে ভবেন বাবু বরদাস্ত করতে পারেন না। একজন মিস্ত্রির বেতন দুশো টাকা, তাজ্জব ব্যাপার? নেপিয়ার বিলাত থেকে সদ্য এসেছিলেন পূর্নিয়ায়, তাই ইংরাজজাতির জাতিগত সমস্ত সদ্‌গুণ বজায় ছিল পুরামাত্রায়। প্রত্যেক অভিযোগ নিজে ভাল করে না বুঝে কোন ব্যবস্থা তিনি করতেন না, ফলে সমস্ত অভিযোগ পত্রের স্থান হোত ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে। তেজ নারায়ণ সিংহের কাছে সুবিধা অনেক,—সত্য মিথ্যার ধার তিনি ধারেন না, দোষের নাম গন্ধ পেলে সই করেই খালাস। বনমাংকিতেও ক্লাব খোলা হয়েছে, কিন্তু ব্যায় ভার বহন করতে হয় সভ্যদের। কোম্পানীর অর্থে লাইব্রেরীয়ান ইত্যাদির পাঠ উঠে গিয়েছে। সন্ধ্যারপর একে একে এসে জুটলেন জগুবাবু আশুবাবু নিবারণ ইত্যাদি ভবেন বাবুর বাসায়। আজ একটা খুব গোপনীয় অথচ গুরুতর রকমের পরামর্শ হবে। পূর্নিয়া কোর্টে এক কাপ চায়ের প্রত্যাশা পর্য্যন্ত কেউ করেনি ভবেনবাবুর কাছে, ক্লাবের চার আনা চাঁদা চেয়ে দ্বিজেন বাবুকে শুনতে হয়েছিল অনেক কথা। এখন কিন্তু সন্ধ্যা আসরে চা-জলখাবার রীতিমত সরবরাহ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর কালী শীল এসে জুটলো।

ভবেনদা জোগাড় করেছি, কিন্তু দেখো ফাঁশ হলেই বিপদ। পেয়েছ সেটা? হ্যাঁ পকেটে করেই এনেছি, বেটা ভীষণ ঘুঘু সব নোট বুকে নম্বর দিয়ে রাখে বুঝলে। কালী শীল পকেট থেকে একটা

নোটবুক বের করলো। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভবেনবাবু বলে উঠলেন—এই তো বারহারকোঠির প্ল্যাটফর্ম সেটআউটের ডেট্ দেখছি, মেজারমেণ্টটা দেখ তো ?

দেখেছি ওতে ঠিক আছে। তবে ? তবে কি, যা করতে হয় কর সামান্য পেনসিলের দাগ বৈত নয়।

দ্বারে মৃদু মৃদু আওয়াজ হতেই সকলে বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, ভবেন বাবু নোট বুক খানা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন।

কে ? খুলিয়ে না, হামি রামদইন। রামদইন রায় বাহাদুরের খাস ভৃত্য। সাহেব হাপনাকে বুলৈয়েছেন, এক্‌খনি যেতে হোবে।

"আচ্ছা এখুনি যাচ্ছি, দেখ ভায়ারা তোমরা এখানেই থাকো, কালী চলুক আমার সঙ্গে" "সাহেব বড়া দিদিমণিকে ভি বোলায়া।" "তাইতো কথাটা একেবারেই মনে ছিল না, আচ্ছা যাও, আমরা এখনি যাচ্ছি।" ভবেনবাবু ভিতরে গেলেন, অন্য সকলে অর্থপূর্ণভাবে পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করলেন। কালীপদ চাপা গলায় বললো—
"বুঝলে তো ? এ আমি আগেই জানি"। আশুলাহিড়ী হাসতে হাসতে রুমাল দিয়ে স্বীয় মুখখানা বেশ ভালো করে একবার মুছে নিলেন। ভবেনবাবুর গলা শুনা গেল—"বেশ দামী শাড়ীখানা পর আর দেখ কথাবার্তা বলতে লজ্জা পাসনা যেন। খুব ভালো লোক না হলে কেরানীকে আবার কে নেমন্তন্ন করে। প্রতিবাদের ভাষায় অন্য জনা বলেন—"অপিসের কাজের সময় মুনিবকে সন্তুষ্ট করলেই তো পারো? এসব আমি ভালো বুঝি না বাপু! সোমত্ত মেয়ে, যা নয় তাই!

"আঃ কি হোল তোমার, ও ঘরে সব রয়েছে না।

"বয়ে গেল, তুমি কিছু বাকী রেখেছ নাকি? আজই টি. এক্স. আর, এর স্ত্রী বলছিলেন কত কথা।" "কি? কি বলেছে শুনি?" "দেখ আমার কাছে গলাবাজি করে লোকের মুখ চাপা দেওয়া যায় না। ভবেনবাবুর স্বর নেমে এলো—তবে কি মালাকে আজ নিয়ে যাবো না? "আজ নিয়ে যাও, কিন্তু আর নয়। দেখবে চারদিকে এতেই কত কথা রটে গেছে। "কি রে ভাল শাড়ী পরলিনে? "না, সাজ গেছে দরকার নেই। তোমার মুনিব জানেন তুমি ছাপোষা কেরানী বুঝলে। আজকে এই শেষ বার পাঠাচ্ছি, এর পর আর নয়! আর শোন—রোজ রোজ এখানে তোমরা কি গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ কর বলতো? তোমার শুনে কি লাভ হবে শুনি?

লাভ কিছু না, কিন্তু তোমাকে আমি জানি তো? ভবেনবাবু রুখে উঠলেন কি জানো বল।

"জানি—লোকের ভালো তোমার সয় না। নিশ্চয়ই কারুর সর্ব্বনাশের জন্যে তোমরা দল বেঁধেছ, কিন্তু মনে রেখো সেইবার দিনাজপুরে আমার জন্যেই বেঁচেছিলে।"

"কি বিপদ! পাঁচজন লোকের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারবো না!

"কথা বলার জন্যে বাসায় এনে চা জল খাবার খাওয়ানোর পাত্র কিনা তুমি? যাক্ তর্ক করতে আমি চাই না। তবে এটা মনে রেখো অনেক অধর্ম্ম করেছ—অনেক নির্দ্দোষীর চোখের জল ফেলিয়েছ কিন্তু ভগবান আছেন,—সব সময় অবিচার তিনি সহ্য করেন না।"

গজ্ গজ্ করতে করতে স-কন্যা ভবেনবাবু বেরিয়ে এলেন।

আচ্ছা বিপদে পড়েছি, এমন সংসারের মাথায় মারি ঝাড়ু। দেখ ভায়ারা কাল থেকে আমার বাসায় আর এসো না। আমি নাকি তোমাদের নিয়ে পরামর্শ করি—কার সর্ব্বনাশ করবো, যত সব! কে? কে ওখানে? টর্চের আলো জ্বলে ওঠে—আমি—

"আমি কেহে? টর্চধারী স্বীয় মুখে আলো নিক্ষেপ করে বলে—চিনতে পেরেছেন? দ্বিজেনভায়া,—তা এ সময় এখানে যে? ভবেনবাবুর স্বরে উৎকণ্ঠার ভাব।

ঐ মেসে যাচ্ছি, কাল মিটিং কিনা। নোতুন বই ধরবে বুঝি? দ্বিজেন বাবু অগ্রসর হতে হতে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। ভবেনবাবু নিম্ন কণ্ঠে বললেন – লোকটা বড় চালাক আর বেজায় শয়তান। লাহিড়ীবাবু আজ একবার ক্লাবে গিয়ে নজর রাখবেন, বুঝলেন।

"তা আর বলতে, একটু কিছু হলেই সব পয়মাল।

আচ্ছা কিছু শুনতে পেয়েছে নাকি? কতক্ষণ এসেছিল কে জানে, যদি দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে? ঘরের মধ্যে কালসাপ নিয়ে বাস করলে কি মানুষ বাচতে পারে—চেঁচিয়ে গলাবাজি করে ধর্ম্ম দেখাচ্ছেন, ধর্ম্মের মাথায় মারি।—মালাকে নিয়ে ভবেনবাবু রায়বাহাদুরের বাংলোর মুখে অগ্রসর হলেন।

দুরন্ত শীত পড়েছে পূর্ণিয়ায়। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সূর্য্যদেব দর্শন দানে নারাজ। স্বল্পকাল কার্পণ্যমাখা আলোক পাতের পর অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে কণ্‌কণে উত্তর-বায়ু। কুয়াশায় ঢেকে যায় চারিধার। কতকগুলি কাজের চাপে অলোককে আসতে হয়েছে পূর্ণিয়া কোর্টে। এখানে আসবার তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বন-মাংকির নূতন পরিস্থিতির মাঝে আপত্তি জানাতেও সাহস হয়নি।

সামান্য কারণে অবাধ্যতার অজুহাতে অনেকের চাকরী গেছে। স্টোর-ইয়ার্ডের সাইডিং এ মাল পত্র, লোহা-লক্কর বোঝাই হচ্ছে। দরকারী গুলি চলে যাবে বনমাংকি—স্টোরে. অন্য সব ফেরৎ পাঠাতে হবে হালিসহরে।

অলোক ঠিক ডাক্তার রায়ের বাসার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বুলু—শ্যামলীর. বিবাহরাত্রে দৈবক্রমে হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা না হলে, ডাক্তার রায় জানতেও পারতেন না যে অলোক এসেছিল। ইচ্ছা করেই অলোক—ডাঃ রায় এবং সুরুচিদেবীর সঙ্গে দেখা করেনি। বনমাংকি থেকে পত্র দিয়ে কোন জবাব আসেনি। তার ফল, যখনই ডাক্তার রায়ের কথা মনে পড়ে, তখনই সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সামান্য কয়েক দিনের আলাপে, এতটা মাখামাখি দেখান তার উচিৎ হয়নি। বার বার চিঠির ভাষার কথা স্মরণ করে, নিজের কৈফিয়ৎ নিজেই দেয়—'এমন দোষনীয় কিছুতো সে লেখেনি. তবে কেন উত্তর এলোনা! নাঃ সে আর তাদের সামনে কিছুতেই যাবে না। ভদ্রতার খাতিরে, একখানা পোষ্টকার্ডে সামান্য একটি লাইন লিখতে যারা জানেনা, তাদের সঙ্গে দেখা করাটাও নিষ্প্রয়োজন। ছুদিন ধরে—অতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ চালাতে হচ্ছে,—যাতে কারুর দৃষ্টি পথে সে না পড়ে আর। নিজের জিদ বজায় রাখতে গিয়ে, রেলওয়ে মেসে না উঠে, থাকতে হয়েছে মধুবণীতে ঠিকাদার শ্রীকিষণ সিংহের বাসায়, অন্য সব বিষয়ে সেখানে মেসের চেয়ে সুবিধা প্রচুর, কিন্তু এই দুর্দান্ত শীতের সকালে এতটা পথ চলা মস্ত একটা বিড়ম্বনা বিশেষ।

"দাঁড়াও—দাঁড়াও—লক্ষিটি!"

অলোক চমকে ওঠে—। একটা মাল বোঝাই ট্রলী ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঠিক তার সামনে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ডাক্তার রায়ের শিশু পুত্র। অলোকা যত ডাকে, বালক তত এগিয়ে যায়। অলোক দূর থেকে মজা দেখে। অলোকা এক জায়গায় থামতে বাধ্য হয়, সামনে একদল কুলী—। অকস্মাৎ বালক চীৎকার করে কেঁদে ওঠে,—অলোক ছুটতে ছুটতে গিয়ে কোলে তুলে বলে—কেমন আর ছুটে পালাবে?" বালকের কান্না থেমে যায়, সে যেন অলোককে চিনতে পেরে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অলোকা নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে। হাফপ্যান্ট কোট তার উপর সোলার টুপিতে অলোককে চেনা মুস্কিল।

"নিন, বেশ করে ধরে নিয়ে যান।"

গলারস্বরে —অলোকা মুখের দিকে চেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নত করলো। অলোক কিছুটা পথ গিয়ে ডাকলো—"শুনুন—"অলোকা কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে দাঁড়ালো—। অলোক কাছে গিয়ে বলে —"আমি যে এখানে এসেছি একথা কাউকে বলবেন না।" অলোকা চলে গেল। যাক্ নিশ্চিন্ত, খুব বুদ্ধি করে কথাটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, না হলেই বিপদে পড়তে হোত। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দিয়ে দু'জন ভদ্রলোক চলে গেলেন। একজন দিলীপ, কিন্তু বন্দুকধারী অপরজন অলোকের অপরিচিত। দিলীপের হাতে কয়েকটা মৃত হাঁস। দু'জনেই ডাক্তার রায়ের বাসায় প্রবেশ করলো। বন্দুকধারী বোধ হয় সেই কোলিয়ারীর মালিক;—দিলীপও জুটেছে এখানে,—অলোক অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে—। "কি মশাই—আজ মেলায় যাবেন নাকি?" "আমাকে বলছেন?"

"আপনাকে নয়তো কি ঐ ট্রলীটাকে, খুব কাজে মগ্ন দেখছি যে—"

স্টেশন মাষ্টার অকারণে হেসে উঠলেন। "আপনি যাচ্ছেন নাকি?"

"আমার আর যাবার উপায় কই,—ক'টো ট্রেন পাশ না করিয়ে কি রেহাই আছে—। আচ্ছা যায়গায় এলাম মশাই,—এক পয়সার উপায় নেই, কেবল শালার টিকিট বিক্রি। মেয়েরা যাবে ডাক্তার বাবুদের সঙ্গে।" "আচ্ছা নমস্কার!—" "আহা, চললেন যে—" বলুন—!" অলোক দাঁড়ালো।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। আচ্ছা, আপনি কন্সট্রাকসনে কতদিন আছেন বলুনতো?"—প্রায় চার বৎসর।

"দিলীপ বাবুর মামা, সিংহমশায়ের সঙ্গে আলাপ আছে? মানে কি ধরণের লোক কিছু জানেন?"

"কেন বলুন তো?" মানে একটু দরকার আছে,—আচ্ছা খুলেই বলি, আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে দিলীপের সম্বন্ধে করলে যেমন হয়? শুনলাম মামাই অভিভাবক। 'হর্ণ' দিতে দিতে একখানা বাস এসে দাঁড়ালো ডাক্তার কোয়ার্টারের সামনে। "আচ্ছা, পরে কথাবার্ত্তা হবে, মেয়েদের তাড়া দিয়ে তৈরী করে দিই,—ওদের আবার সাজ করতে বেলা ফুরোয়।" মাষ্টার মশাই চটির চট্‌পট্‌ আওয়াজ তুলে এক প্রকার ছুটেই চললেন। অলোক আপন মনে হেসে ফেলে—দিলীপ ভাগ্যবান!—নিশ্চয়ই,—এমন অল্পদিনের মধ্যে পরকে আপনার করে নিতে কজন পারে? আবার ডাক্তার-বাসায় যাতায়াত সুরু হয়েছে! ডাক্তার-কোয়ার্টার থেকে একে একে সকলে বেরিয়ে পড়লো। মাষ্টার মশাই—চীৎকার করে বলেন—"একটু দাঁড়ান, পাঁচ মিনিট, এই এদের হয়ে গেল।"

অলোক প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চেয়ে থাকে।-ট্রলীর আওয়াজ, কে

আসছে এমন সময়—! "এই রোখ্‌কে—রোখকে।" কঁ্যাচ করে ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গে ট্রলীম্যান দুজন তড়াক্‌ করে - পিছনে নেমে গাড়ীটাকে রুখে ধরলো। "কি হে,—ওদিকে চেয়ে কি দেখছিলে?" অলোক হেসে জবাব দেয়—"কি আর দেখ্‌বো, রং বেরংয়ের জামা কাপড় আর কি,—" "দাঁড়িয়ে কেন চলে এসো না।" "তোমার সঙ্গে গিয়ে আবার তো এই ঠাণ্ডায় ফিরতে হবে।" "না ফিরলেও চলবে, বিবি নেই--"। "তা হোক্‌ অনেক কাজ আছে—।" এ, পি, ডাবলিউ, আই, হরবনস্‌লাল ট্রলী থেকে নেমে পড়লো—"কাজ আর কাজ, হাজার খেটে মর নাম পাবেনা ভেইয়া—এখানে ফাঁকি দিতে শেখো তবে বাঁচবে। চল, চল আর কাজ করে না, চা খেয়ে মেলায় বায়স্কোপ দেখ্‌বো—পাঞ্জাব মেল মে ডাকাইতি।—" অগত্যা কুলীদের কড়া আদেশ দিয়ে অলোক ট্রলীর মোড়ায় বসে পড়্‌লো। যদিও সে জানে তার অবর্ত্তমানে কুলীরা মোটেই কাজ করবে না, বাস খানা বেরিয়ে গেল। হরবনস্‌লাল কথার ফোয়ারা খুলে দিয়েছে অলোক কেবল শুনে যায়,—তার মনে তখন তোলপাড় করছে—নবাগত ভদ্রলোক,—দিলীপ—অলোকা।—কনকনে শীতের বাতাস ভেদ করে—ট্রলীখানা এগিয়ে চলেছে।

৩৭

বিহার প্রদেশের বিখ্যাত মেলাগুলির মধ্যে গোলাপবাগ অন্যতম মেলার স্থিতিকাল একমাস, কিন্তু ভাঙ্গা-মেলার জের্‌ চলে প্রায় পক্ষকাল ধ'রে। অনেকখানি স্থান জুড়ে মেলা বসে, দেশ দেশান্তরের পণ্যসামগ্রী এখানে এসে জোটে —হাতী ঘোড়া উট পর্য্যন্ত আমদানী হয়।

মাসাধিক কাল থানা, পোষ্ট অফিস, সবই স্থাপিত হয় মেলার অভ্যন্তরে। এবার অন্য বৎসরের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ পত্র এসেছে।—কর্ত্তপক্ষ বিশেষ তদ্বির করে একটি এয়ারোপ্লেন, নির্ব্বাক ছায়া ছবির কোম্পানী, আর কলকাতার পার্শি থিয়েটারকে আনিয়েছেন। অন্যান্য প্রমোদ উপকরণ আপনা থেকেই এসে জুটেছে। এই বৎসর গোলাপ বাগের অনতিদূরে নাগেশ্বর বাগ নামে একটি নূতন মেলার পত্তন হয়েছে।—নাগেশ্বর বাগ নূতন মেলা হলেও মন্দ জমেনি, কিন্তু গোলাপ বাগের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। অলোক একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরবনস্ লাল সিনেমা থিয়েটারের টিকিট না পেয়ে, একটু স্ফুর্ত্তির জন্যে 'জল পথের' আশ্রয় নিতে গেছে, তারপর হয়তো উপর ধাপেও উঠতে পারে।—একটা তাম্বুর সামনে খুব বাজনা বাজছে—সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠছে "গ্রেট কলকাত্তাকে খেল্—আফ্রিকাকো গেরিল্যা,—খাপসুরৎ যোয়াণী বিবিকো কসরৎ, আযাও—আযাও—আযাও।" তাম্বুর দরজার পাশে উঁচু মাচার উপর দাঁড়িয়ে দুটি যুবতী অশ্রাব্য ভাষায় গাইছে,—গানের শেষে বাজানার সঙ্গে সঙ্গে নাচ ধরছে—কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে। গেটের পাশে, দুজন পুরুষ তেল কালী মাখা মুখে ভূত সেজে হাঁকছে দো' আনা,—চার আনা,—আট আনা,—এক রূপেয়া। কখনও বা একসঙ্গে অনেকগুলি সিগারেট মুখে পুরিয়ে,—অদ্ভুত ভঙ্গীতে ধোঁয়া ছাড়ছে।—ঠং ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠ্লো পরক্ষণে বাঘের ডাকের মত একটা গর্জ্জন; সঙ্গে সঙ্গে দরজার কালো পর্দ্দা নেমে এলো—। "খেল সুরু হোগিয়া"—প্রবেশ পথে জনতার ঠেলাঠেলি।—নর্ত্তকী দুজন নাচ বন্ধ করে—গেট ওয়ালাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রং তামাসা- সুরু করে দিল।

কিছু দূর এগিয়ে আর একটা তাম্বু,—সামনে নানান্ রকম স্ত্রী পুরুষের ভীড়। তাম্বুর দরজায় বাংলায় লেখা—ভারতীয় পশু ও পক্ষীর মজাদার কেরামতি, না দেখিলে আপসোস হইবে—।

অলোকের পরিচিত এক ছোকরা বলে—"বেশ দেখাচ্ছে,—চলুন আর একবার দেখে আসি।—অলোক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে,—একটু বস্‌তে পেলে যেন সে বেঁচে যায়।

অলোক হু'টো টাকা দিয়ে বলে—"কিনুন।" "এক টাকার কি হবে, আট আনারই যথেষ্ট,—এই তো ভাঙ্গলো – আর একটু পরে ঢুকবো।" —"চা—গরম—চাই—গরম—চা –" ভ্রাম্যমান চা-খানা,– ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে পথ চলেছে—। মাটীর পাত্রে চা খেয়ে—হুজনে তাম্বুতে ঢুকে পড়লো—। প্রথমেই হনুমান দম্পতির ঘরকন্নার খেলা,—একজন গানের সুরে বলে চলেছে—"

"রাজমহলের আমলা মেথি মির্জ্জাপুরের চিরুণী—
এলো খোঁপা বেঁধে দেলো, বেঁধে দে ননদিনী—"

চুল বাঁধা থেকে আরম্ভ করে, মান অভিমান, প্রেম প্রণয়, কোন কিছুই বাদ দিলনা শাখা মৃগেরা।—পাখীর খেলা—সত্যিই চমৎকার—টিয়া হ'ল গাড়ীর চালক, হুটি পায়রা ঘোড়া হয়ে গাড়ী ছোটালো—অশ্বরূপী পারাবত ছার্ত্তক কদম হুইয়েই অভ্যস্ত। পাহাড়ে ময়না কুয়া থেকে বাল্‌তি করে জল তুল্‌লো। শেষ কালে হোল পাখীর লড়াই,—হুইপক্ষে অসংখ্য পাখীর কিচির্ মিচির্ খাম্‌চা'—খাম্‌চি—ঝটাপটি। তারপর কামান দাগা—।কামানের মুখে—জলন্ত পল্‌তে রেখে—একটু দূরে গিয়ে চোখ্ মুখ ঘুরিয়ে শব্দ করলো—কাকাতুয়াটা—সঙ্গে সঙ্গে হোল একটা বিকট আওয়াজ।

অলোককে এবার ফিরতে হবে মধুবনীতে—। পথ চল্‌তে চল্‌তে অলোক লক্ষ্য করে, সে ভুল ক্রমে—মেলার এক কদর্য্য স্থানে এসে পড়েছে—। এখানেও ভীড় কম নয়, কিন্তু চীৎকার হাঁক্ ডাক্ নেই—সবাই যেন চুপিচুপি মুখ ঢেকে চল্‌তেই অভ্যস্ত। পথের দু'পাশে—সারি সারি শিবির—নানা প্রকার আলোক মালায় সুসজ্জিত। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও অলোক ঘেমে উঠ্‌লো। পরিচিত কেউ দেখ্‌লে কি ভাব্‌বে! কেউ বিশ্বাস করবে না - যে ভুলক্রমে এসেছে সে। পিছনে না ফিরে বরাবর সোজা চলে যায় অলোক। মাঝে মাঝে কাণে এসে বাজে গানের স্বর। যাক্‌, বাঁচাগেল—ঐ'তো দূরে মোটর, এক্কার ভীড় দেখা যাচ্ছে। অলোক শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তি অনুভব করে,—এবার টমটমে সোজা মধুবনী—। মেলার শেষ প্রান্তে আমবাগানেও অসংখ্য আলো জ্বলছে। মাতালদের চীৎকারের বিরাম নেই—। ফুলুরি বেগুণির সঙ্গে 'কান্ট্রী মেড্' উদরসাৎ করে' এক এক জন লাখ-লাখ টাকাকে, থোড়াই পরোয়া করতে আরম্ভ করেছে। এখানে আশ্রয় নিয়েছে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বারাঙ্গনা দল—যাদের স্থান হয়নি মেলার নির্দ্দিষ্টস্থানে।

টম্‌টম্ ওয়ালারা অসম্ভব ভাড়া হাঁকে, অলোক এগিয়ে যায় —।

"আইয়ে না বাবুজী—।" অলোক থমকে দাঁড়ায়, আচ্ছা বেহায়াতো। একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। "পোশিন হোতা কি নেহি?" রমণী—অলোকের হাত চেপে ধরে হেসে উঠলো। দূর থেকে মোটরের আলো এসে পড়তেই,—হাত ছেড়ে দিয়ে সত্রাসে সে বলে ওঠে "বাবুজি—!"অলোক চিনতে পারে—পুনিয়ার স্ত্রী জানকী কে,—কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তার—এত অল্পদিনের মধ্যে এমন অধঃপতন!

ঠিক এমন সময়ে চলন্ত টম্‌টম্‌ থেকে একজন আরোহী উল্টে পড়ায় বেশ একটু গোলামাল বাধলো। অলোক গিয়ে দেখে দিলীপ হাত ধরে টানছে আর মাটীতে শুয়ে আছে সেই বন্দুক ধারী ভদ্রলোক। টম্‌টম্‌ ওয়ালার চীৎকারে ভীড় জমতে সুরু হোল। দিলীপ বলে—"দেখুন দেখি কি বিপদ, মানা করলাম অত খাবেন না, ঠাণ্ডা লেগেছে, বেশতো—একটু মেডিসিন ডোজে খান।—ও বিলাস বাবু উঠুন না মশাই।—" "ঠিক আছি বাব্‌ বা খুব ঠিক আছি!" টম্‌টম্‌ ওয়ালা গাল দিতে দিতে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। চারগুণভাড়ায় অপর একখানা টম্‌টম্‌ ঠিক করে, অলোক আর দিলীপ কোন রকমে বিলাসকে টেনে তুললো গাড়ীতে। দিলীপ বলে—"আপনিও" আসুন না। অলোক রাজী হয় না।—জানকী বলে—"হাম যাতাহ্যায় বাবুজি!" দিলীপ টম্‌টম্‌ থেকে—হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—"আচ্ছা, নমস্কার অলোক বাবু—।"

৩৮

কয়েকটি ঘটনায় ভবেন বাবুর প্রতাপ প্রতিপত্তি খুব বেড়ে উঠেছে,

সেদিন সকালে বনমাংকির প্ল্যাটফর্মে লাল পাগড়ির ছড়াছড়ি দেখে; লোকের কৌতূহলের বিরাম নেই। পূরণসিং কিন্তু নির্ব্বিকার,—সে জানে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার ফেরারী খুনী ধরমসিংয়ের সঙ্গে তার কোথাও এতটুকু সাদৃশ্য নেই! বারেকের জন্যে বাম হাতের আস্তিন তুলে একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল পূরণসিং। উল্কি ফুটিয়ে নাম লিখে কি কুকাজই না করেছিল সে। এখন হাজার চেষ্টাতেও তার আর চিহ্ন কেউ পাবেনা,। মস্ত টানা টানা ফুল লতাপাতা ফোটানো হয়েছে দু'হাতে।

ভবেনবাবু সাহেবী পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পূরণসিংকে ডেকে বললেন,—"তোমাদের সঙ্গে আজ লাইনে যাবো, চেয়ারে বসা আর পোষায় না—বাত ধরে গেল। পূরণ সিং ভবেনবাবুকে চিরদিন এড়িয়ে চলে, তবুও জবাব দিতে হয়—"তা বেশ চলুন না মন্দ লাগবেনা।" "এত পুলিশ কেন হে, কি ব্যাপার?"

ব্যালেষ্ট ট্রেণের ইঞ্জিন খানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে শব্দ করতেই—পূরণ সিং গার্ডভ্যানে উঠে পড়লো—। "আসুন ভবেনবাবু—।" ভবেনবাবুর সঙ্গে উঠলো আর এক ভদ্রলোক—। আউটার সিগন্যালের কাছে ব্যালেষ্ট ট্রেণখানা থেমে গেল—পূরণসিং দরজা থেকে ঝুলে পড়ে দেখে কি ব্যাপার। এখানেও কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। "হ্যালো ধরম সিং!" পূরণসিং চেয়ে দেখে ভবেনবাবুর সঙ্গী সেই নিরীহ ভদ্রলোকটি রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে—। ভবেনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন—"এঁ্যা পূরণসিংয়ের নাম ধরমসিং, বলেন কি মশাই।—" পূরণসিং নিশ্চল।

"এলাহাবাদের জোড়া খুনের আসামী হিসেবে—আমি আপনাকে বন্দী করলাম—।" পূরণসিং তার দুই হাত উঁচু করে ধরলো, হাতে পরলো হাতকড়ি।

ব্যালাষ্ট ট্রেণখানা পিছু হটে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। বনমাংকীর রেলকলোনীতে নামলো একটা বিশ্রী রকমের থমথমে ভাব।

প্রতুল সেন ওরফে ননী গাঙ্গুলী ধরা পড়েনি কিন্তু তাকে ধরবার জন্যেও ভবেনবাবু সমস্ত রকম ফাঁদই পেতেছিলেন। সকলের চোখে ধূলো দিয়ে এই বিপ্লবী যুবক, প্রায় তিন বৎসরকাল পূর্ণিয়া—মুরলী গঞ্জ 'কনসট্রাকসন' অফিসে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। স্বল্পভাষী

লোকটিকে শ্রদ্ধা করতো অফিস শুদ্ধ লোকে। নির্ভুল ইংরাজীর জন্যে নেপিয়ার একটু বেশী রকম স্নেহও করতেন—তাই বিনা আবেদনে বেতনের মাত্রা উঠেছিল বৃদ্ধির চরম শিখরে। কাজ না থাকলে চুপচাপ তিনি বই পড়ে যেতেন। তাঁর অসাক্ষাতে ভবেনবাবু একখানা বই খুলে দেখেন—হরফ্ ইংরাজী কিন্তু ভাষাটা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তেজনারায়ণসিং বইখানা দেখে চম্‌কে ওঠেন। পুস্তকখানি ভারত সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ। রাজতন্ত্র ধ্বংসের অনুকূলে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এখানি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তারপর যেদিন পাটনার টিকিধারী পালোয়ান—সমস্ত বাঙালী জাতটাকে ভীরু দুর্ব্বল অপবাদ দিয়ে সিংহনাদে গগন-পবন আলোড়িত করে তুলেছিল—যেদিন কুস্তিগীরের দম্ভোক্তিতে রায়বাহাদুর আনন্দ-উদ্ভাসিত নেত্রে উপস্থিত বঙ্গবাসী—কয়টির প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন—সেদিন এই স্বল্পভাষী ক্ষুদ্রকায় বাঙালীই রেখেছিল বাংলার সম্মান। প্রায় আড়াই মণ ওজনের টিকিওয়ালা চতুর্ভুজ চৌবে—অকস্মাৎ তড়িৎ স্পর্শে যেন মৃত্তিকাশায়ী হোল। তেজনারায়ণ সিংয়ের মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এই ক্ষুদ্র দেহে এত শক্তি! ননীবাবু চৌবেজীকে পুনরায় আহ্বান করলেন, কিন্তু তার তখন দাঁড়াবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নেই,—কুস্তিতো দূরের কথা। "ইয়ে জাপানী কসরৎ, ইস্‌মে এইস্যা হোতা হ্যায় বাবুজি।"

নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা সন্দেহের মাঝে নিযুক্ত হোল গুপ্তচর যারা ছায়ার মত অনুসরণ করে চল্‌লো ননীগাঙ্গুলীকে, কিন্তু কোন কিছুই জান্‌তে পারা গেল না।

সেদিন একমাত্র ভবেনবাবু আর রায়বাহাদুরের বাসা ভিন্ন সমগ্র রেল-

কলোনীর মেস, কোয়ার্টারে চল্‌লো অরন্ধনের পালা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোল এক বিপ্লবীর ছবি—যাঁর জীবন রক্ষার জন্য সমগ্র ভারত একযোগে আবেদন জানিয়েছিল বিদেশী সরকারের দরবারে।—স্থানীয় স্কুল বাজারে চল্‌লো পুরোমাত্রায় হরতাল। রেল অফিস কিন্তু যথারীতি বস্‌লো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটের দায়ে সকলেই চেয়ার দখল করে বসে থাকলো! কেবল ননী গাঙ্গুলীর আসনখানা শূন্যই পড়ে রইলো, তিনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ভবেনবাবু গুপ্তচর মুখে খবর পেলেন ননীগাঙ্গুলী ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে কি সব পোড়াচ্ছেন, হাজার চীৎকারেও তাঁকে ঘর থেকে বের করা গেল না। পুলিশ অফিসার মন্তব্য করলেন—"নিশ্চয়ই কোন আত্মগোপনকারী রাজদ্রোহী।"—পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে—বন্দী করার সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেল। দুপুর রাত্রে চারিদিক ঘেরাও করে, পুলিশ ইনসপেক্টার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন গৃহ শূন্য,—ননী গাঙ্গুলী—নেই! মধ্যরাত্রি থেকে পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দশ মাইল স্থানের প্রতিটি বাস-স্টেশন, ফেরীঘাট্ ইত্যাদিতে চল্‌লো পুলিশী জুলুম কিন্তু ফেরারী আসামীকে পাওয়া গেল না। রাত্রের অন্ধকারের সঙ্গে ননীগাঙ্গুলী যেন মিশে গিয়েছেন।

ভবেনবাবুর পরামর্শে, রায়বাহাদুরের সার্কুলারে—সামান্য কুলি থেকে সুপারভাইজার পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারীদের কুলজী কুষ্ঠি লেখাতে হয়েছে,—এন্‌কোয়ারীও হয়ে গেছে—।

এখন চক্রান্ত চল্‌ছে—ওভারসিয়ার সেনগুপ্তকে নিয়ে।—বেচারী প্রাণপাত পরিশ্রম দিয়ে—সমগ্র কনসট্রাকসনের তিনভাগ কাজ উঠিয়েছেন। নেপিয়ারের আমলে সুখ্যাতি সুনামের সঙ্গে সমানে

চলেছিল বেতন বৃদ্ধি। আজ বিপদ বেধেছে বারহারাকোঠীর প্ল্যাট ফর্ম্ম নিয়ে। হয়তো চাকরী যাবে, জেল ও অসম্ভব নয়। ঠিকাদারের বিল পাশ হওয়ার পর, দেখা গেল—'প্ল্যাটফর্ম্ম' অনেক নিচু,—রায় বাহাদুর 'মেজারমেণ্ট বুক' চেয়ে পাঠিয়েছেন।

অপমানিত বিক্ষুব্ধ মনে সেনগুপ্ত ফিরছেন বন মাংকি থেকে। সমস্ত দিন তাঁকে আজ, কেবল টিট্‌কারী সহ্য করতে হয়েছে, এমন কি কুমুদ ঘোষ পর্য্যন্ত গোঁফচাড়া দিয়ে,—ঘুষের ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। ঠিকাদারের কাছ থেকে পকেট ভারী করেই, তিনি নাকি ফাইনাল বিল পাশ করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—চারিদিকে জমাট অন্ধকার। ট্রলীর শব্দ বাতাসের গর্জ্জনের সঙ্গে মিশে কেমন ধারা গমগমে ভাবের সৃষ্টি করেছে। সেনগুপ্ত চুপচাপ বসে বসে ভাবছেন, সিগারেট নিভে গেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ সেনগুপ্ত দেখেন সামনে টিম্‌-টিম্ করে জ্বলছে ইঞ্জিনের আলো। চীৎকারে সচেতন করে চারজন ট্রলীম্যানের সঙ্গে সেনগুপ্ত লাফ দিয়ে পড়লেন। 'ট্রলীখানা' লাইট ইঞ্জিনের ধাক্কায় চুর্‌মার হয়ে গেল।

বনমাংকির প্ল্যাটফর্ম্মে সেনগুপ্ত ইঞ্জিন থেকে নামলেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষরূপে। এ কয়দিন তিনি ভাবনা চিন্তায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই অঘটন এনে দিল তাঁর সাহস ও ধৈর্য্য। হোক্ তদন্ত-তদারক তিনি প্রমাণ করবেন স্বীয় নির্দ্দোষিতা।

ট্রলী দুর্ঘটনা মুখে মুখে সারা কলোনীতে ছড়িয়ে পড়লো। কেউ বলে—"জেল অবধারিত তাই বেঁচে গেল,—" হিতকামী প্রতিবাদ জানায়—"নির্দ্দোষী তাই ভগবান বাঁচিয়েছেন, দেখো,—শেষ পর্য্যন্ত কিচ্ছু হবেনা।"

স্থনির্ম্মল রায় সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন—। "দেখুন মেয়েদের মত ভয়ে জড়সড় হলে চল্‌বেনা, সাহসে বুক বাঁধুন। কাগজপত্র সব আমাকে এনে দিন—। আমি বলছি কিচ্ছু হবেনা আপনার—।"

ভৌমিক, শিলদাস—ইত্যাদি প্রায় তিনভাগ কর্ম্মচারী ভিড়ে গেল স্থনির্ম্মল রায়ের দলে।—"সেনগুপ্তকে বাঁচাতেই—হবে,—না'হলে কারুর নিস্তার নেই—রায়বাহাত্নরের কলমের খোঁচা কার ঘাড়ে কখন পড়বে তার কি কোন ঠিক আছে।"

বনমাংকিতে তুটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোঁট পাকাচ্ছে, যেন তুই—যুযুৎস্থক সৈন্য শিবির!

৩৯

অপরাহ্ন।—অলোক ষ্টোরে বসে মালপত্রের ফর্দ্দ তৈরী করছে। ত্ব' তিন দিনের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। ডাক্তার-কোয়ার্টারের অনেক সংবাদই সে সংগ্রহ করেছে। বিলাসের সঙ্গে দিলীপের বেশ বন্ধুত্ব। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ডাক্তার রায়ের বাসায়, গানের আসর জমে। অলোক মনে মনে চটে যায়। 'দিলীপকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া,—ডাক্তার রায়ের,—মোটেই ঠিক হয়নি। দিলীপ যদি এখানে দাঁত বসাতে পারে তবে বেশ হয়!'

বস্নদেব রায়ের উপর তার বেশ শ্রদ্ধা জন্মেছিল। নাঃ, শ্রদ্ধা বজায় রাখা অসম্ভব! রেল-কলোনীর—অধিবাসীদের সঙ্গে ডাক্তারের কিছু মাত্র পার্থক্য নেই। শুষ্ক নমস্কারের সঙ্গে অকারণ একটু খানি হাসি দিয়েই, এরা ভদ্রতা বজায় রাখে।—আন্তরিকতার এতটুকু বালাই কি থাক্‌তে পারেনা? আশ্চর্য্য!

অলোকা নিশ্চয়ই তার কথা রেখেছে। না' হলে সুরুচিদেবী কি কালীচরণকে পাঠাতেন না! না,—এ তার অত্যন্ত অন্যায়,—সত্যি,—সুরুচিদেবীর উপর—তার ভক্তি শ্রদ্ধা, কোন দিনই সে হ্রাস হতে দেবেনা। আচ্ছা—অলোকা কি দিলীপের দৃষ্টি পথে—!

অলোক শঙ্কিত হয়ে ওঠে।—

অহেতুক এ আশঙ্কা কেন তার? অলোকা; অলোকা তার কে? অলোকাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে তার বয়ে গেছে। তার ভাবী স্বামী,—অভিভাবক, অভিভাবিকা,—এরা যদি অন্ধ হয়—তবে তার কি!—কি যায় আসে তার? কিছু না,—কিছু না। তবু ক্ষনিকের একটুখানি স্মৃতি অলোক মুছে ফেল্‌তে পারে না।

অন্য মনস্ক ভাবে দুই ভ্রুর মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু নখে ছিন্ন করে'—অলোক চিন্তিত হয়ে ওঠে—। ব্রণটা বিষিয়ে না যায়! দূর্ একটা ব্রণের ভয় করলে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যায় না। অলোক খাতাখানা টেনে নিল। ঘণ্টা খানিক পর—অলোক আর বসে থাকতে পারেনা মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা, একটু যেন শীত শীত ও করছে,—কপালটা বেশ ফুলে উঠছে-বাঁ-চোখটা ও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসছে! ষ্টোর কিপার জিজ্ঞাসা করলেন— এত ফুল্‌লো কি করে,—কিছু কামড়ালো নাকি?" "কিছু না, একটু 'আইডিন' লাগালেই ঠিক্ হয়ে যাবে।—"

আইডিনেও যন্ত্রনা কমেনা,—অলোক ষ্টোর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়্‌লো। জ্বর হোল নাকি—? পা যেন আর চলতে চায় না।

পথের মাঝেই তো ডাক্তার খানা, ডাক্তার রায়কে দেখানো উচিৎ। লজ্জা কিসের—! রোগীর চিকিৎসার জন্যেইতো ডাক্তার রাখা। দূর—যদি ডাক্তার দেখাতেই হয়, তবে বড় ডাক্তার, সিভিল সার্জ্জেনকেই সে দেখাবে।—বাঁ চোখটা একেবারে বন্ধ হয় গেল যে।—

"ভাগ্যিস মাঠের পথে নেমেছি, না হলে লোকে নিশ্চয়ই ভাবতো মদ খেয়ে টল্‌ছি।" ঠিকাদারের বাসার কাছ বরাবর এসে—অলোক যেন আরো দূর্ব্বল হয়ে পড়লো। বিছানায় শুতে পারলে হয়।—শ্রীকিষণ সিং—জিজ্ঞেস করলেন—"ভীমরুলে কেটেছে বুঝি?" "না ব্রণটা ছিঁড়ে গেছে—।" "দেখি দেখি—!"

অলোক চেয়ার খানায় বসে পড়লো। হাতের কাগজ পত্র সব কিছু মেঝেতে পড়ে গেল। "ডাক্তারকে খবর দি, কি বলুন, সেপ্‌টিক হতে পারে।" "একটুজল আনান তো—" অলোকের কথা বেশ জড়িয়ে আস্‌ছে। ঠিকাদার গায়ে হাত দিয়ে চম্‌কে উঠলেন—। "ইস্! এই অবস্থায় আপনি হেঁটে আস্‌ছেন? চলুন ঘরে চলুন।" শয্যার এত আরাম অলোক যেন জীবনে অনুভব করেনি। কিছু বল্‌তে আর ইচ্ছা হয় না—জিভ শুখিয়ে আস্‌ছে তবু—কতকগুলি কথা বল্‌তেই হয়—। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাঢ়তর নিদ্রায় অ্যলোক অচৈতন্য হয়ে গেল।

৪০

সন্ধ্যা হয়ে গেল অথচ ঠিকাদারের মোটরের দেখা নেই,—ডাক্তার রায়—ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কখন যাওয়া হবে পুনিয়া সিটিতে, কখনই বা পুজো দেখবেন তাঁরা। অলোকা মন্তব্য করে,—"শ্রীকিষণ বাবু ঠিক ভুলে গেছেন কিংবা গাড়ী এখনও ফেরেনি।"

"মধুবনী বাজার 'তো বেশী দূর নয়, সেখান থেকে গাড়ী নিলেই চলবে,—পরের ওপর নির্ভর করে বসে থেকে কি লাভ?"—হরপ্রসাদ বাবুর কথায় সকলে বেরিয়ে পড়্‌লো। "যাবার পথে ঠিকাদারের বাসায় খোঁজ নিলেই চল্‌বে। শীতের সাতটা মানে বেশ রাত!"

শ্রীকিষণ সিংয়ের বাসার কাছ বরাবর যেতেই দেখা গেল — মোটর খানা ভিতরে এসে ঢুক্‌লো। "এই তো—গাড়ী এলো এতক্ষণে ; আচ্ছা,—তোমারা দাঁড়াও আমি একবার দেখি—" ডাক্তার রায় ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই দেখা হোল ঠিকাদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দের সঙ্গে—। "নমস্কার ডাক্তার বাবু! সব মনে আছে আমার, কিন্তু কি কর্‌বো বলুন—বিপদে পড়ে সব নষ্ট হয়ে গেল।" বসুদেব বাবু প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই রামানন্দ বলে উঠ্‌লো—। "আর একটু দেরি করুননা,—ভাড়াটা ডাক্তার বাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেই আপনাদের নিয়ে যাবে।" ডাক্তার রায় অবাক্। আজ সকালেও তিনি ঠিকাদারের বাসা ঘুরে গিয়েছেন—রোগীতো বেশ সুস্থই ছিল, অথচ তাঁকে—একবার খবর পর্য্যন্ত না দিয়ে অন্য চিকিৎসক আনানো হোল। ডাক্তার নিজেকে বেশ অপমানিত বোধ করলেন, অথচ হঠাৎ চলে যাওয়াও যায় না, যদিও বাইরে শীতের মধ্যে—অন্ধকারে, সকলে অপেক্ষা করছে।— রামানন্দের পিছনে ডাক্তার রায় বারান্দার দিকে অগ্রসর হলেন!

সিঁড়িতে পা দিতেই বেরিয়ে এলেন শ্রীকিষণ সিং। অভ্যর্থনার পর ঠিকাদার বল্‌লেন—"কথার খেলাপ হয়ে গেল, কিন্তু কি করবো উপায় ছিলনা ডাক্তার বাবু!" "হঠাৎ কি হোল বলুন তো!" ডাক্তারের স্বর—বেশ গম্ভীর। "আসুন না, ডাক্তার সাহেবের মুখেই সব শুনবেন। "ডাক্তারসাহেব, ইনিই আমাদের নোতুন এস, এ, এস— ডাঃ রায়।" অভিবাদন বিনিময়ের পর ডাঃ চৌধুরী বল্‌লেন—"চলুন না,—আপনিও দেখুন, ডাঃ বোস ও আস্‌ছেন, তারপর তিনজন মিলে 'কনসাল্ট' করা যাবে।"

আলোকের মুখের অবস্থা তখন এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছে—যাতে বসুদেব রায় মোটেই চিনতে পারলেন না। শ্রীকিষণ সিং বললেন "চিনতে পারলেন না ? আর চেনবার কি জো আছে—"

ডাঃ রায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ঠিকাদারের দিকে। "অলোক বাবু।—এবার ভাল করে দেখুন !

"অলোক বাবু ! কবে এসেছেন ?"

"তা প্রায় দিন দশ।" বসুদেব বাবু অলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—অলোক প্রায় দশদিন এখানে আছে অথচ তাদের সঙ্গে একবারও দেখা করেনি।

ডাঃ চৌধুরী বললেন।—"ডাঃ বোস না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিৎ কি বলুন ? "আমার শ্বশুর মশাই এখানেই আছেন, প্র্যাকটিশ অনেকদিন ছেড়ে দিলেও এক কালে খুব নামকরা সার্জেন ছিলেন।—"ঠিকাদার সোৎসাহে—বলে উঠলেন—"তাহলে তাকেও আনতে পাঠাই কি বলুন ডাঃ সাহেব।" "তিনি বাইরেই অপেক্ষা করছেন—মেয়েদের নিয়ে !"

"মেয়েদের এতক্ষণ ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন !" ঠিকাদারের স্বরে—বিস্ময় মিশ্রিত ভৎসনা। "ছিঃ এ বড় অন্যায় আপনার।" শ্রীকিষণ সিং ব্যস্তভাবে সিঁড়ি থেকে নেমে পড়লেন, পিছনে লণ্ঠন হাতে ভৃত্য ছুটলো।

কর জোড়ে সকলের উদ্দেশ্যে ঠিকাদার বললেন—"আমার কোন দোষ নেই,—আমি এই মাত্র জানলাম আপনারা এখানে আছেন। দয়া করে ভেতরে আসুন। আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই, কিন্তু আপনি আমাদের ডাক্তার বাবুর শ্বশুরমশাই—নিজেও ডাক্তার,—অলোক

বাবুকে একবার আপনি ও দেখুন!" হরপ্রসাদ জামাতার দিকে চাইলেন—

"অলোক, মানে সেই ছেলেটি!"

"হ্যাঁ।"

হরপ্রসাদ বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন—সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে গেছে। "ইরিসিপ্লাসে" ওধুষের চেয়ে শুশ্রূষার প্রয়োজনই অধিক!

সুরুচিদেবী অলোকের বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন—শরীর খুব উত্তপ্ত। অলোকা—রোগীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে—উঃ কি বিশ্রী হয়ে গেছে মুখখানা—চেন্‌বার জো নেই একেবারে!

সুরুচিদেবী নিম্ন কণ্ঠে বল্‌লেন—"খুব জ্বর।"

দিদির কথায় অলোকার চমক ভাঙ্গলো,—সঙ্গে সঙ্গে সে—দিদির দিকে ফিরে চাইলো—।

ডাঃ রায়ের কথায় ঠিকাদার প্রতিবাদ জানালেন—"মাফ্‌ করবেন, অলোক বাবু আমার অতিথি তাতে অসুস্থ,—এ অবস্থায়—আমি কোথাও যেতে দিতে পারি না।"

হরপ্রসাদ বাবু বললেন—"আপনার কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু দেখছেন তো নার্সিংই এখন সবচেয়ে বেশী দরকার! অলোক আমাদেরও অপরিচিত নয়।"

"সব জানি বাবু সাহেব—পূজোর সময়কার ঘটনা অলোক বাবুর মুখেই শুনেছি।" "সবই যখন জানেন, তখন আপত্তির কি থাকতে পারে বলুন? আপনার কি মত ডাঃ চৌধুরী?"

"হ্যাঁ ডাক্তার বাড়ীতে নার্সিংএর গাফিলতি হবে না, আর এই সামান্য পথ—মোটরে কত সময়ই বা লাগবে।" শ্রীকিষেন সিং—গাঢ় স্বরে উত্তর দিলেন—"কোন আপত্তিই থাকতো না, যদি অলোকবাবু আমাকে না বলতেন,—তিনি বলেছেন অসুবিধে হলে যেন হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু অন্য কোথাও নয়। অলোকবাবুর জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাকে তাঁর কথা মতই। কাজ করতে হবে—।" হরপ্রসাদ রুক্ষস্বরে বলে ওঠেন—"এটা আপনার জেদের কথা, ঠিকাদার সাহেব!"

ধীর সংযত কণ্ঠে ঠিকাদার উত্তর দিলেন"—না বাবুসাহেব—এ হচ্ছে আমার জাতের ধর্ম্ম! রাজপুত শক্তি হারিয়েছে সত্যি, কিন্তু কথার খেলাপী আজও করেনি। জানি—অলোকবাবু আপনাদের উপকারী বন্ধু, কিন্তু উপায় নেই বাবুসাহেব,—। আমার ওপর ভরসা করেই তিনি এতদূর ছুটে এসেছেন। তাঁর সে বিশ্বাস আমি ভাঙ্গতে পারব না—আপনারা আমায় মাফ করবেন।"

"বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন!"

"রাগ করবেন না বাবু সাহেব, দয়া করে আপনারা চিকিৎসার ভার নিন, আমি হাত জোড় করে আপনাদের মিনতি জানাচ্ছি—।"

শেষ পর্য্যন্ত হরপ্রসাদ বাবু ঠিকাদারের বাসায় থেকে গেলেন— অন্যান্য সকলে বাসায় ফিরলো। এত রাত্রে মন্দিরে যাওয়া নিষ্ফল, বিলাস হয়তো এতক্ষণ এসে গিয়েছে।—পূজার নির্ম্মাল্য সকালে আনালেও চলবে।

৪৯

দীর্ঘ পত্রখানা বারবার পাঠ করে, দিলীপ একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাল্‌লো।—"পুড়িয়ে ফেলাই উচিৎ ?" জলন্ত শলাকা নিভে গেল।

না, পুড়িয়ে কি হবে,—বরং রেখে দিলে—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আজ সে বড় লোকের স্ত্রী—অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, আর দিলীপ ? সামান্য চল্লিশ টাকার চাকর।—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পেট ভরাতে গেলে—দেহ ঢাকেনা, দেহ ঢাকতে গেলে, ভদ্রতা বজায় থাকে না। প্রতি মাসে ঋণের মাত্রা বাড়ছে—অথচ পরিশোধের পথ নেই—।

দিলীপের মনে হিংসা জাগে—মেয়েদের ভাগ্য পুরুষদের চেয়ে অনেক ভালো। একটু বয়েস না হতেই বাড়ীশুদ্ধ লোকের টনক নড়ে—ব্যবস্থাও হয়ে যায়। আর ছেলেদের বেলায়—কারুর কোন হুঁসই থাকেনা। কত বয়েস হোল তার—প্রায় পঁচিশ, আর গীতা ? এইতো কিছুদিন আগেও সে ফ্রক পরতো। অথচ সে আজ—সর্ব্ব সুখ... ঐশ্বর্য্যশালিনী। হিংসায় দিলীপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো—।

সব দিকেই তার অভাব কেন ? পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে ? দাদারা না গ্রহণ না বর্জ্জন আরম্ভ করেছেন। দিলীপের কোন ব্যাপারেই তাঁরা নেই, না ভালো না মন্দ। চার গণ্ডা পয়সার দরকার হলে, হয় বৌদিদিদের কাছে হাত পাততে হবে নয়তো বাজার খরচ বাঁচিয়ে পকেটে রাখা চাই।—জুতো জামা কাপড় ছিঁড়ে গেলেও কেউ একবার চেয়েদেখেনা। বৌদি'দের পরিহাসের সঙ্গে খোঁচার মাত্রা বেশ বুঝতে পারে সে,—তবু হাসি মুখে সব সহ্য করে যায়—মধ্যবিত্ত ঘরের স্কুল কলেজ ত্যাগী, বেকার যুবকদের অবস্থা, কোন অংশে

বয়স্থা কুমারীদের চেয়ে উন্নত নয়। মেয়েদের জন্যে বাড়ীর লোকে সময় সময় কত ভাবে কিন্তু ছেলেরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিতই থাকে—।

পত্রখানা আবার চোখের সামনে ধরলো দিলীপ,—এর অর্থ কি.—বিয়ের পর সব মেয়েইতো অতীত ভুলে যায়—পূরানো কথা তখন তাদের মনে আনা মহাপাপ। কিন্তু গীতা এসব কি লিখেছে—। সুমিত্রা-তো আচ্ছা পাজী! এখানকার কথা অনিমেশকে জানিয়ে কি লাভ হোল তার? তারকবাবুর সঙ্গে সুমিত্রাও কম ঢং করেনি একদিন।—বেহায়ার মত মাসী বুড়ীকে পর্য্যন্ত বলেছিল "যে জাতই হোক তারকদাকে বিয়ে করবোই"।—বেশ করে গুছিয়ে একখানা চিঠি দিলে, আচ্ছা জব্দ হয় সুমিত্রা। অনিমেশ দেখতে তো বেশ, কথাবার্ত্তায় অতি ভদ্র, কিন্তু এমন নীচ তার অন্তঃকরণ—? গীতাটাও আচ্ছা বোকা—সব কথা কি কখনও খুলে কাউকে বলতে আছে? ঠিক বিয়ের দিন তো কত করে তাকে সাবধান করে দেওয়া হোল। যাকৃগে—মরুকৃগে গীতা, বোকাদের নাকানি চোবানি খাওয়াই উচিৎ! চিঠিখানা বাক্সে তুলে রেখে দিলীপ চুপ করে বসে থাকে, কিন্তু চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই—একটার পর একটা কথা তার সমস্ত চিত্তকে তোলপার করে তোলে—। "হ্যালো দিলীপ বাবু!"

দিলীপ একটু হেসে অভ্যর্থনা জানালো, "আসুন!"

"মুখভার, কি এত ভাবছিলেন!" "কিছুই না।"

"না আবার, প্রিয়ার কথা বুঝি!" দিলীপ চুপ করে থাকে। নাঃ পালাতে হোল দেখছি. ওখানে যার দিকে চাই তারই মুখ গম্ভীর এখানে ও আপনার মুখ ভার, আমার শালা এখানে আসাই ভুল হয়েছে।" দিলীপ জিজ্ঞাসা করলো—"কেন ওখানে আবার কি হোল?"

"কি আর হবে, সেই ছোঁড়াটার নাকি খুব বাড়াবাড়ি অসুখ,—তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। যার জন্যে এলাম তার কোন হদিসই করতে পারছিনা। চলে যাওয়াই ভালো, কি বলুন ?"

দিলীপ বলে—আচ্ছা—আপনার কলিয়ারীতে আমার একটা কিছু করে দেবেন।" "কলিয়ারীতে কাজ করবেন আপনি ?"

"কেন, কোন বাধা আছে নাকি !" "না, তা নেই তবে ?—কলিয়ারীরচাকরী আপনার মতন—

দিলীপ হেসে উঠলো—"আমার মতন—টতন বিনয় বচন রাখুন, মোট কথা একটা চাক্‌রী আমার চাই—। এখানকার মেয়াদ'তো শেষ হয়ে এলো।" বেশ গল্পের আকারে দিলীপ বলে গেল অনেক কথা—খানিকটা সত্যি কিন্তু বেশীর ভাগই মিথ্যা।

"ও—তাই বলুন। মুখ দেখলেই—সব বুঝ্‌তে পারি বুঝ্‌লেন ? কিন্তু মুস্কিল কি হয়েছে জানেন—আমার কলিয়ারী রাখাই মুস্কিল। ত্রিশ হাজার টাকা দিতে না পারলে—বেটা মগনরাম আমাকে ঘাড়ধরে দূর করে দেবে—টাকার জন্যেই এতদূর এসেছি, না হলে ঐ ছুঁড়ীটাকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে—।"

"হর প্রসাদ বাবুকে বলেছেন সব ?

"নাঃ আপনি দেখছি রাঙামুলো, বুদ্ধিশুদ্ধি কিস্সু নেই—। আরে মশাই—এ সব শুনলে, কেউ আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না'কি ? ডাক্তার শালা,—অর্থাৎ আমার হবু ভায়রাতো আমাকে দেখ্‌তেই পারে না।

এখন এসব ফাঁক হলেই সব দিক দিয়ে চিচিং ফাঁক। বিয়ে করে একবার টাকাটা হাতাতে পারলে হয়—। "না'হলে,আপনার মত বন্ধুকে চাকরী দিতে কি আর বাধা ছিল ?"

"আচ্ছা পরে সামলে উঠলে আমার কথা মনে থাকবে তো?"

"পরের কথা—পরে দেখা যাবে, এখন প্রিয়ার ভাবনা ঝেড়ে ফেলে উঠুন তো?"

"কোথায় যাবেন এই ঠাওায়—?"

"সিটিতে চলুন না?"

"এত রাত্রে?"

"মোটেতো আটটা, সবে সন্ধ্যে,—উঠুন গাড়ীতে যাবো, গাড়ীতেই ফিরবো।" দিলীপ ইতস্ততঃ করে,—পূর্ণিয়া সিটির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে জন কয়েক বাইজী। অল্পবয়সী পরীবাণু পড়েছে বিলাসের চোখে—। সেদিন দামী হীরার আংটিটা বিলাসের হাত থেকে চলেগেছে বাণু-বেগমের আঙ্গুলে। ঘন ঘন যাওয়া ঠিক নয়, বিলাসের ভয় না থাকতে পারে কিন্তু তার সব দিক ভেবে কাজ করা উচিৎ।

বিলাস জিজ্ঞাসা করে, "কি হোল মশাই এখন ও কি ভবিষ্যৎ সংসারের কথা ভাবছেন না কি?"

"আজ আর যায় না কি বলুন!"

"আপনি না গেলেও আমাকে যেতে হবে"! বিরক্ত-ভরে বিলাস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"আচ্ছা চলুন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবনা, মাত্র দু'খানা গান শুনেই চলে আসতে হবে।" বিলাস—হেসে ওঠে "সেদিন যেমন দু'খানা শুনেই উঠেছিলেন—তেমনি তো?" "না,—আজ সত্যি দেরি করা চলবেনা—"

"আচ্ছা আচ্ছা, বীরত্ব দেখা যাবে পরীর সামনে। এই জীবনে অনেক মেয়ে মানুষ দেখেছি মশাই,—কিন্তু সত্যি বলছি দিলীপ বাবু—এমন ভালো আমার কাউকে লাগেনি। চোখ ঘুরিয়ে যখন হেসে হেসে কথা বলে, তখন নিজেকে সামলে রাখা দায় হয়ে ওঠে।—"

"কিন্তু আজ কিছু খেতে পাবেন না।"

"নিরম্বু উপবাস! ও আমার সইবে না, ফুর্ত্তি করতে গিয়ে—পরমহংস সাজা আমার পোষায়না। তবে হ্যাঁ,—মাত্রা ঠিক আজ বজায় রাখ্‌বো।" বেশ পরিবর্ত্তন করে দিলীপ মাথায় চিরুনি বসাতে লাগ্‌লো, বিলাস হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে—"আপনি দেখছি মেয়েদেরও বাড়া,— বাপ্‌স কোয়ার্টার ঘণ্টা খতম করে দিলেন যে—।"

"চলুন এবার—।"

দিলীপের দিকে চেয়ে বিলাস বলে—"দেখুন একটা কথা বলছি, রাগ করবেন না যেন—দিলীপ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—।

"চেহারা তো আপনার আমার চেয়ে অনেক ভালো, কিন্তু মশাই পরী আমাকে এত খাতির করে কেন বলুন তো?

দিলীপ জবাব দিল—"বকের রং কত ফরশা কিন্তু মানুষে কোকিল-কেই'তো ভালবাসে? বিলাস খুব এক চোট হেসে নিয়ে শালখানা বেশ কায়দা দুরস্ত ভাবে জড়িয়ে নিলো। ঘরে তালা দিতেই বিলাস ব্যস্তভাবে বলে উঠলো—"দাঁড়ান দাঁড়ান।" "কি হোল আবার,—।"

"আপনার কাছে ভাঙ্গানী কিছু আছে তো?"—"কত?"

"যা হয়,—চল্লিশ পঞ্চাশ,—পরী মুখ ফুটে'তো চায় না কোন দিন, কিন্তু একেবারে শুধু হাতে যাওয়া কি ঠিক? দিলীপের মুখখানা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল,—এ মাসটা তার বেশ টানাটানীতে চালাতে হচ্ছে।

সোয়েটার আর জুতো কিনতে অনেক টাকা খরচা হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় নেই মানমর্য্যাদা বলে একটা জিনিষ আছে'তো? প্রকাশ্যে বল্‌লো—"অত টাকা নেই মশাই, খুব জোর কুড়ি-পঁচিশ।" "যা আছে তাই নিন, কালই দিয়ে দেব।"

টর্চের আলো ফেলতে ফেল্‌তে বিলাস পথ চলে, বাক্যস্রোতের বিরাম নেই। "লক্ষ্ণৌ—কলকাতা—কাশী, সব জায়গাই চাখ্‌তে তার বাকী নেই, কিন্তু পরীবানু সত্যিই পরী—" ইত্যাদি।

দিলীপ নিঃশব্দে চলেছে, তার মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছে পঁচিশ টাকার কথাটা,—এ কয়দিন চল্‌বে কি করে!—"নেই"—বল্‌লেই ভাল হোত। কিন্তু মুখ ফুটে চাইলে যখন, তখন—? নাঃ,—এবার থেকে সে বড় লোকদের কাছে আর ঘেঁসবেই না। বড় লোকেরা খরচ করে বিশ দিন,—কিন্তু তাদের মত লোকের একদিনকার—ঠ্যালাটাই যে প্রাণান্ত কর। "আঃ একটু পা চালিয়ে আসুন না মশাই, শীতে জমে গেলেন না কি?"—দিলীপ তাড়া তাড়ি এগিয়ে গেল।

৪২

মুস্কিলে পড়েছে অলোকা। গত রাত্রি থেকে বাসার সকলে চলে গেছে ঠিকাদারের বাংলোয়।—এ রোগে তিন দিনের দিনটাই নাকি খুব মারাত্মক। অলোকা কাউকে কিছু বলতে না পারলেও তার মন পড়ে আছে সেখানে। সমস্ত রাত্রি সে কেবল ভেবেছে—প্ল্যাটফর্মে দেখা হওয়ার কথা যদি দিদিকে বলে দিত, তবে হয়তো—রোগটাএত বাড়তে পারতোনা। অনেকক্ষণ বাতাস লাগার ফলেই সমস্ত শরীর বিষিয়ে উঠেছে।

জামাইবাবু ও দিদির ব্যবহারে, মন বিরক্তিতে ভরে যায়। চিঠির জবাব না দেওয়াতেই—নিশ্চয় ভদ্রলোক অন্য কিছু ভেবেই আর দেখা করেননি। সমস্ত রাত্রি এক প্রকার বিনিদ্রভাবেই তার কেটে গেছে। প্রথমে বিলাস এলো অনেক রাত্রে। সে এক বীভৎস কাণ্ড!

দোষের মধ্যে কালী জিজ্ঞেস করেছিল—"কোথায় ছিলেন বাবু এত রাত পর্য্যন্ত" ।—তারফলে ভদ্রলোকের মুখ থেকে যে সব ভাষা প্রকাশিত হোল, তাতে অলোকার প্রতিবাদের সাহস পর্য্যন্ত হ'লনা। বেলা বেশ হয়েছে, কিন্তু কেউ ফিরছে না কেন ?

অলোকা ভাবে কোথায় ভদ্রলোকের বাড়ী,—কোথায় থাকেন আত্মীয় স্বজন ? আজ সে যেমন করে হোক একবার যাবেই সেখানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা জাগে কেন ? রোগীকে দেখতে যাওয়া কি অন্যায় আব্দার, অসঙ্গত আচরণ ? তথাপি শঙ্কোচ দূরীভূত হয় না।

না না—বাবা কখনও সন্দেহ করতে পারেননা তাকে,—এমন বাবা দুনিয়ায় কারুর নেই, একা ধারে বাবা আর মা। অলোকা আশ্বস্ত হোল। আচ্ছা, কাল সমস্ত রাত্রি সে কেন অত ভাবছিল ? এমন ভাবে ভগবানকে সে তো কখনও ডাকে নি ? বিলাসের গর্জ্জনে অলোকার চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

অলোকা জানে ভবিষ্যতে বিলাসের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ দাঁড়াবে তথাপি মনকে কিছুতেই বশে আনতে পারে না, বিদ্রোহী মন প্রতি দৃষ্টিপাতের সঙ্গে—বয়ে আনে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। মেলায় খোকাকে কোলে নেবার অজুহাতে, কি বিশ্রী ভাবে তার অঙ্গ স্পর্শ করেছিল, অসভ্যের একশেষ এই লোকটা— !

কালী জিজ্ঞাসা করে,—"কি হোল বাবু !"

কর্কশ কণ্ঠে বিলাস বলে—"তোর চোদ্দ পুরুষ কি কখনও চা খেয়েছে যে চায়ের মর্ম্ম বুঝ্‌বি ? একি চা না ঘোড়ার— ।"

"কাল কড়া করতে বলেছিলেন যে !"

"ফের মুখের ওপর কথা, আমার বাড়ী হলে জুতিয়ে বুঝিয়ে দিতাম।"

"শুধু শুধু গাল দেন কেন বাবু— ?"

"ফের জবাব—বেটা হারামজাদা কোথাকার ? চিনিস্না আমাকে—?"

অলোকার ডাকে কালী মুখ ভার করে চলে গেল, পরক্ষণে প্রবেশ করলো অলোকা।

"থাক্—ও চা খাবেন না, এখুনি করে দিচ্ছি।" গমনোদ্যত অলোকার পানে চেয়ে বিলাস বলে—"চললে যে—" ?

অলোকা ফিরে দাঁড়ালো — বলুন ?

"বল্‌বো আবার কি হাতী ঘোড়া, তোমার তো দেখা পাওয়াই ভার—খুব কাজের মেয়ে হয়েছ না ? দাঁড়িয়ে কেন চেয়ারটায় বস না।"

পরক্ষণে ব্যঙ্গভরে বিলাস বলে—"ও তোমার সময় নেই বুঝি—সেবা ধর্ম্মে যেতে হবে তো ?" অলোকা চেয়ারে বসে পড়ে, বিলাস সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বলে, "আট বছর আগে ছিলে-তো একটা ফড়িং, এখন তবু গায়ে মাংস লেগেছে— ।"

বিলাস নিজের কথায়, নিজেই হো হো করে হেসে উঠ্‌লো।

"কিছু বলবেন ?"

ভ্রূ কুঁচ্‌কে বিলাস বলে—"এত তাড়া কিসের, রুগীর কাছ থেকে আসবার সময়তো, সময়ের জ্ঞান থাকেনা।" অলোকা চুপ করে বসে থাকে।

"একটা কাজের কথা বল্‌বো ?"

"বলুন ?"

"কেন এসেছি জানো ?"

"না !"

"কি মনে হয় ?" অলোকা মাথা নিচু করে মৃত্তিকার দিকে চেয়ে থাকে। "তোমার চাঁদ মুখ দেখ্‌তে আসিনি নিশ্চয়ই"— !

অলোকা বিলাসের দিকে চেয়ে বলে—"কেন এসেছেন তাই বলুন !"

"ওঃ বড্ড যে রেগে উঠেছ দেখ্‌ছি -। তা রাগই কর আর যাই কর, আমি ভিন্ন তোমার গতি নেই। তুমি আমার বাগদত্তা। বাগদত্তা মানে বোঝোতো ?—মানে বিয়ে না হলেও তুমি আমার স্ত্রীর সামিল, বুঝলে গো ?"

"এই কথা বলবার জন্যে এসেছেন ?"

"আহা, উঠছ কেন ? বস বস, কাজের কথা কি বিনা ভণিতায় বলা চলে। হ্যাঁ দেখ— ?" অলোকা ফিরে চাইলো।

"বাঃ দেখ্‌তে তুমি নেহাইৎ মন্দ নও, কবি হলে মুখের ঘাম দেখেই একটা কবিতা লিখে ফেল্‌তাম।"

অলোকা আঁচলে ঘাম মুছে ফেলে।

"শুনেছি তোমার বাবার অনেক টাকা, কিন্তু কত দৌড় জানো কিছু ?"

"না।"

"এঃ তুমি তো দেখছি একটা আস্ত ইডিয়ট্‌। এ-সব না জানলে তোমার বোনাইবাবুর গ্রাস থেকে কিছু ফিরে পাবে নাকি ?"

অলোকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"এসব কথা বাবাকে বল্‌বেন !"

"কেন তোমাকে বল্‌লে ভাগবৎ অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি ?"

"আমি কি বলবো !"

অলোকার বিরক্তিতে বিলাসের ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি, ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে—।

"কলিয়ারীতে এমন বেয়াদপী কেউ করলে চাব্‌কে শায়েস্তা করে দিতাম !"

অলোকা দৃপ্তভঙ্গিমায় সংযত কণ্ঠে বলে—"তা হয়তো দিতেন, কিন্তু এটা আপনার কলিয়ারী নয় ?"

বিলাস বিব্রত বোধ করে, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক হয়নি। পরক্ষণে কাঠফাটা হাসিতে ঘরখানা কাঁপিয়ে তুলে জবাব দেয়—"এঃ তুমি সেই ছেলেমানুষই আছ, ঠাট্টা বোঝনা, একটুতেই—চটে উঠছ—রসিকতা, রসিকতা গো ?"

গলার স্বর নেমে যায় বিলাসের—"কোথায় থাকতে হবে জানো তো ? চারিদিকে কেবল কয়লা, লোকজন যারা তারাও এক একটা জ্যান্ত কয়লা, বুঝলে ? তার মধ্যে থাক্‌তে হবে তোমাকে আমাকে, দু'জনে যদি—একটু রসিকতা না করি, তবে বাঁচবো কি করে বল দেখি ?"

"আপনার কথা শেষ হয়েছে তো ?"

বিলাস চটে ওঠে—"এত পালাবার ঘটা কেন বলতো ? বলি মহারাণীর অবর্ত্তমানে রাজ্য-পাঠ উল্টে যাচ্ছে নাকি ?"

"বাবা আসছেন, যা বলবার তাঁকে বলাই ভালো।"

বাইরে মোটরের দরজাটা খট্ করে বন্ধ হয়ে গেল।

৪৩

সেন গুপ্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে শেষ পর্য্যন্ত টেকেনি। বারহার কোঠির কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন সেন গুপ্ত ছিলেন 'জিয়ানগঞ্জ কোশির' ব্রিজ নিয়ে ব্যস্ত। 'ফাইনাল মেজারমেন্ট' অবশ্য তিনিই করেছেন—কিন্তু নক্সা আর 'বরোপিট' অনুযায়ী তা ঠিকই ছিল। কাজেই— ছয় মাসের পর তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না।

সুনির্ম্মল রায়ের দল মামলায় জয়লাভ করে খুব—ধুমধামের সঙ্গে কালী পূজো করলেন, তিনদিন ধরে চললো মহোৎসব আর যাত্রা। ভবেন বাবু নিরীহ ভাল মানুষের মত আমোদে যোগ দিলেন। সেন গুপ্তকে জনান্তিকে ডেকে বললেন—'জানো ভায়া, তুমিই যে দোষী এটা সব্বাই বিশ্বাস করলেও আমি কিন্তু করিনি'। সেন গুপ্ত আজ এক কথায় বহু দিনের সঞ্চিত অপমানের শোধ নিলেন—সামান্য একটি কথায়। ভবেন বাবু হেসে উত্তর দিলেন—'মালাকে বড় সাহেব যে মেয়ের মতন দেখেন, তাই কলকাতার মিউজিয়াম মনুমেন্ট সব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন'। কথায় কথায় অনেকে এসে জুটে গেল—সকলের মুখে 'মালার' কথা।

'মালা'র কথা এতটা প্রচার হয়ে পড়তো না, যদি ভবেন বাবু ফেরবার সময় তাকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। সব চেয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন ভবেন বাবুর স্ত্রী। স্বামী স্ত্রীর কলহ এক কান থেকে দশ কানে গিয়ে— নানাপ্রকার শাখা প্রশাখায় এক কিম্ভূত-কিমাকার অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিছু দিনের মধ্যে এ আলোচনা স্রোতও রুদ্ধ হয়ে যেতো—যেমন সচরাচর হয়ে থাকে—কিন্তু এক মাস পর হঠাৎ সকন্যা ভবেন বাবুর রাঁচী গমনে গবেষণার মাত্রা আবার চরমে উঠলো। ভবেনবাবু ফিরে এলেন কিন্তু মালা থাকলো তার মাতুলালয়ে।

আর একটি কারণে মুস্কিলে পড়েছেন ভবেন বাবু।—বাসায় ঠাঁসা আছে নূতন নূতন টেবিল চেয়ার আলমারী,—রেলের কাঠ এবং ছুতোরে বিনা খরচায় সব কিছুই তৈরী হয়েছে - তাঁর বহু দিনের সখ মিটেছে,—কিন্তু এর জন্যেই এখন তাঁর রাত্রে ঘুম নেই।

সেগুণ কাঠের হিসেব দিতে গিয়ে বিপাকে পড়ে 'সাবষ্টোর কিপার' সব বেফাঁস করে দিয়েছেন। সুপারভাইজার 'আশুবল' এতদিন ছিলেন ভবেন বাবুর অন্তরঙ্গ, আজ তিনিও যোগ দিয়েছেন সুনির্ম্মল রায়ের দলে। কয়েকটি ছিন্ন তাম্বু দিয়ে হিসেব মিটিয়ে—আনকোরা নূতন কয়েকটিকে ভবেন বাবু সযত্নে লুকিয়ে ফেলেছিলেন—কিন্তু তাও বুঝি সামলানো যায় না।

"নির্ব্বোধ গর্ভস্রাবটাই—তাঁর সব চেয়ে বড় শত্রু। এমন হতভাগা ছেলে থাকার চেয়ে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া ঢের ভালো।" সে দিন ভবেন বাবুর অবর্ত্তমানে গোবিন্দ নন্দন সব কথা কাকে বলে দিয়েছে।—

আজ সন্ধ্যায়—তেজ নারায়ণ সিংহের দরবার থেকে ফিরে—ভবেন বাবু শুয়ে পড়লেন। সুনির্ম্মল রায় কলকাতায় লিখেছেন—"প্রত্যেক রেল কর্ম্মচারীর কোয়ার্টার সার্চ করলে, শাল সেগুণের হিসাব ঠিক মত পাওয়া যাবে।" সময় বুঝে শ্রীকিষেন সিং পর্য্যন্ত শত্রুতা সাধছে, চেকের বদলে নগদ টাকাই ছিল ভালো,—এখন ব্যাঙ্কে খোঁজ খবর নিলেই সর্ব্বনাশ।"

কার কাছে পরামর্শ নেবেন ভবেন বাবু! বিপদের দিনে স্ত্রীর পরামর্শ নেওয়া সমীচীন? কিন্তু তাঁর স্ত্রী এ সব জানতে পারলে—সকলের আগে—সেই হয়তো ঢাক ঢোল বাজিয়ে সমস্ত প্রচার করে

দেবে। "কপাল গুণে সবই এমন হয়, সামান্য লিটারেট খালাসী ছকুকে পর্য্যন্ত আজ ভয় করে চলতে হচ্ছে"।—

তাড়াতাড়ি বড় লোক হবার চেষ্টা না করলে, কিংবা এক সঙ্গে এতগুলি লোককে শত্রু করে না তুললে—অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে হাজার হাজার টাকা তিনি লুটতে পারতেন, কেউ গুনাক্ষরে টের পর্য্যন্ত পেতনা। "এখন কি করা যায়? রায় সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইলে কি চলে না? নাঃ, মালার ব্যাপারে সুনির্ম্মল রায় ভীষণ চটে আছেন। এক রোখা লোকের কাছে ক্ষমা প্রত্যাশা করা বৃথা। কোন রকমে এই তালটা সামলাতে পারলে হয়,—এর পর থেকে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।"

চিরদিনের স্বভাব কি বদলানো যায়! লালমণিহাটে রেল-ইয়ার্ডের সুপুরী নারকেল নিয়ে কি বিশ্রী ব্যাপারটাই না ঘটেছিল। সামান্য একটা চৌকিদারকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই চোর সাব্যস্ত হলেন, তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেড়িয়ে পড়লো মণ তিনেক সুপুরী আর প্রায় শ-পাঁচেক নারকেল।. এখানে কেঁচো খুঁড়তে আবার কি ওঠে কে জানে!

"ভবেনবাবু"! "কে"? "আমি শশী"। "কি খবর হে"? ঘরে চলুন বলছি। ফিশ ফিশ শব্দে শশীবাবু বললেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে মশাই,—লোচনরাম ভকত, বাসওয়ালা শিউশরণ সব জুটেছে রায়-সাহেবের অফিসে"।

ভবেনবাবু সংবাদ শুনে প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেন—কিন্তু পরক্ষণে বলে উঠলেন—"এরা আমাদের বিরুদ্ধে যাবে কেন? রায়বাহাদুর ওদের কত সুবিধে দিয়েছেন বলুন তো"?

শশীবাবু—কঠোর সত্য প্রকাশ করে উত্তর দিলেন "আরে মশাই—

শত্রুতা করতে গেলে লোকে অত ভাবে নাকি ? আমরা বাঙালী হয়ে বাঙালীর সর্ব্বনাশ করছি না ? এখন কি করা যায় ভাবুন, বড়সাহেব সব শুনে কপালে দুচোখ তুলে বললেন "ভবেনকো বোলাও" । তাইতো ছুটে আসছি" ।

"আচ্ছা কি করে জানলেন সব" ?

"অভয় দপ্তরী সব শুনেছে, সেই ফাঁক পেয়ে সব বলে গেল" ।

"কি বললে বলুন তো" ?

"সব সে বুঝতে পারেনি—তবে আপনার কখানা চিঠি নাকি রায়-সাহেব পড়তে পড়তে বলছিলেন—এটা খুব কাজে লাগবে" । ভবেনবাবু আর্ত্তনাদ করে উঠলেন ।

"এঃ - কথাটা একেবারেই মনে আসেনি, আর কি করেই বা জানবো যে এক করতে গিয়ে আর এক ঘটে বসবে" । "কি চিঠি দিয়েছিলেন, মনে আছে" ? "ঐ কেরাসিনের দাম সম্বন্ধে আর কি ! রায়বাহাদুর তাড়া দিলেন—সাত তাড়াতাড়ি চিঠি দিলাম । অথচ ষাট টিন কেরাসিনের একটি পাই পর্য্যন্ত আমি পাইনি" । "একবার চলুন - বড়সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ দরকার" ।

"ও বেটা আবার কি পরামর্শ দেবে ? শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঝুলিয়ে কেটে না যায়" । "আমি যাই বুঝলেন, বাসার দরজা খোলা আছে—ভাবছি রায়সাহেব না আমাকেও জড়িয়ে ফেলে" । ভবেনবাবু শশীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—কিছু ঘটলে আপনিও বাদ যাবেন না" ? "তার মানে" ? "মানে, মরতে হলে সবাই এক সঙ্গে মরবো, আপনিও যে আমাদের দলের—ভুলে যাবেন না" । শশীবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে । "যাক এখন অত ভয় করবেন না । আচ্ছা এক কাজ করতে

পারেন, আর একবার দেখুন—রায় সাহেবের অফিসে কে কে আছে ?"
"যদি কেউ দেখে ফেলে ?"

ভবেনবাবু চটে উঠলেন—"ইয়া বড় গোঁফ রেখেছেন কেন ? কামিয়ে ফেলে শাড়ী ধরুন"! আচ্ছা আচ্ছা—আমি যাচ্ছি"। "দেখুন—এখানে আসবেন না—বড় সাহেবের ওখানে যাবেন"।

ভবেনবাবুকে দেখে—রায়বাহাত্বর ধমক দিয়ে বললেন—কি ফ্যাঁসাদ" বাধিয়েছেন, এত কাঁচা লোক আপনি"।

ভবেনবাবু নীরবে ভর্ৎসনা সহ্য করলেন—সত্যই এসব ব্যাপারে চিঠি পত্র লেখা অত্যন্ত অন্যায়। "আজ রাত্রের মধ্যে যা হয় কিছু করুন, না হলে আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হবে। 'রায়' আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি করতে ও ছাড়বে না। তখন নিজেকে সামলাবো না আপনাদের দেখবো" ? শশীবাবু চোরের মত নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করে বললেন—"অফিসে কেউ নেই, কেবল চৌকিদার খুসিলাল পাহাড়া দিচ্ছে"।

ভবেনবাবুর ক্ষুদ্র চক্ষু তুটি যেন জ্বলে উঠলো, আসন ত্যাগ করে তিনি বলে উঠলেন—"কোন ভাবনা নেই স্যার,—সব ঠিক করে দিচ্ছি—কিছু টাকা দেন"!

"কত টাকা ?" 'শ-তুয়েক'। 'কি হবে ?' "পরে শুনবেন, এখন আর সময় নেই।"

রায় বাহাতুরের বাংলো থেকে ভবেনবাবু বাসায় ফিরলেন। "কাপড়ের পুটুলি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?"

ভবেন বাবু স্ত্রীর পানে চেয়ে—বিকৃত-কণ্ঠে জবাব দিলেন—'গলায় দড়ি দিতে ? আচ্ছা কাল সাপিনী হারামজাদী জুঠেছে আমার!' "হ্যাঁ—তাই দাও, এ ভিন্ন তোমার পথ নেই।"—ভবেন বাবু বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

৪৪

সুরুচি দেবীর অনুরোধ এড়াতে না পেরে—অলোককে আসতে হয়েছে ডাক্তার রায়ের বাসায়। শ্রীকিষেণসিং থেকে আরম্ভ করে সুরুচি দেবী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে তাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়েছে। অলোক নিজেও জানে তার শরীর খুবই দুর্ব্বল,—তবু সে বনমাংকিতে ফিরতে চায়।

অলোক লক্ষ্য করেছে —বিলাস তার এখানে থাকাটা পছন্দ করেনা। প্রথম দিনের সামান্য পরিচয় ক্ষণেই তার স্বরূপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। যদিও সুরুচি দেবী— বেশ কড়া রকম জবাব দিয়েছিলেন —, "ডাক্তার বাড়ী বলেই অলোক বাবু আসেননি - ওঁর সঙ্গে রক্তের চেয়েও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে যে'? এ কয়দিন বিলাস তার দিকে ফিরেও চায়নি— রাত্রে দিলীপের বাসায় শোবার ব্যবস্থা ও করেছে।

দুপুর বেলা, অলোক বিছানায় শুয়ে ভাবছে নিজের কথা। "এখানে থাকা আর কোন মতেই উচিত নয় — কাল নয়তো পরশুই সে চলে যাবে।" সামান্য একটা শব্দে চেয়ে দেখে, 'অলোকা' দুধের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে—। ডাক্তার কোয়ার্টারে আসার পর—এই প্রথম অলোক তাকে দেখতে পেল।

অলোক বলে—'দিদিকে একবার ডেকে দেবেন?' অলোকা টি-পয়ের উপর গ্লাস রেখে চলে গেল। অলোক দুধের গ্লাসে হাত দিয়ে—কি ভেবে—পুনরায় রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লো। 'দুধ খেলেন না? খেয়ে ফেলুন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' 'খাচ্ছি'—, একটু খানি ম্লান হাসি হেসে অলোক জবাব দিল। 'আগে খেয়ে নিন পরে কথা শুনবো, কি বলবেন তা জানি?' গ্লাসটা রেখে অলোক জিজ্ঞাসা করে—'কি বলবো বলুন তো?'। 'বনমাংকি যাবেন—এই

কথা তো ?' অলোক নিঃশব্দে হাসে।

'বাবার কাছে চেঞ্জে যাবার কথা বলেছিলেন না ?'। 'যাবার দরকার হয়তো হবে না—বনমাংকীর জল হাওয়া খুব ভালো।' 'বেশতো—দিন কয়েক প'রেই সেখানে যাবেন।' ক্ষণকাল পরে সুরুচি দেবী প্রশ্ন করলেন—'একটা সত্যি কথা বলবেন ?' অলোক চাইলো সুরুচি দেবীর দিকে। 'এখানে কি আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

"না—অসুবিধা তো কিছু নেই।" 'তবে ?' অলোক নিরুত্তর।

'আমাকে পর ভেবে লজ্জা করবেন না—বলুন না কি বলবেন ?' স্বরে কেমন যেন একটুখানি স্নেহের আভাষ।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে—অলোক ধীরে ধীরে বলে—'ছোট্টবাড়ী আপনাদেরই কত অসুবিধে—তার মধ্যে আমি এসে জুটলাম—বিলাস-বাবুকে অন্য জায়গায় যেতে হোল—এটাতো ঠিক নয়।"

"বিলাস বাবু, বাবার বন্ধুপুত্র কিন্তু আপনিও আমাদের পর নন, অবশ্য—আমাদের আত্মীয়তাকে, যদি আপনি মেনে নেন 'তবেই ?' অলোক বলে' 'আমি যদি সত্যিই আপনাদের তেমন কিছু ভাবতাম—তবে এখানে মোটেই আসতাম না। তবে বিলাস বাবু—' অলোকের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই সুরুচি দেবী—প্রশ্ন করলেন— 'বিলাস বাবু কি বলেছেন ?'। 'বলেন নি কিছুই—। তবু আমার জন্যে বাইরে থাকতে হচ্ছে তো ?'

সুরুচি দেবী ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন—'ভাগ্যের ওপর মানুষের হাত নেই—কিন্তু বিলাসের জন্যে আপনি মোটেই চিন্তিত হবেন না, সেদিনকার ব্যবহার বাবাকে আমি জানিয়েছি। তা ছাড়া—এমন

কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছে—যাতে বাবার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে।' অলোকের মনে পড়ে—গোলাপ বাগের সেই দিনকার কথা।

দুপুরের ট্রেন খানা চলে গেল।—

"বাবা আসছেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকুন"।

"ওরে কালী, দড়িদড়া জোগাড় কর বাপু। অলোকা জিজ্ঞাসা করে "কেন বাবা"? "এই যে পরোয়ানা এসেছে রে? বসুর পিসীমা লিখেছেন—তিন মাসের বাড়ী ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু লোকা ভাবের জন্যে চলে যেতে হবে ;—যদি কোন ব্যবস্থা না হয়। যাই একবার তোদের নিয়ে রাজগীরে। তোদের সেখানে রেখে কাশী যাবো, অমনি গয়া পাটনা সব এক যাত্রায় সেরে নেবো"।

কক্ষে প্রবেশ করতেই অলোক শয্যা ত্যাগ করে উঠে বসলো। "আহা উঠছ কেন, আমি তো বসতেই এলাম"। সুরুচি দেবী বলেন—"অলোক বাবুর শরীর সেরে গেছে বাবা—কালই বনমাংকি যাচ্ছেন"। "সে কি? তাই হয় নাকি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে, দেখবে মাস খানেকেই কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছ"।

সুরুচি দেবী কৌতুক-ছলে বললেন—"অলোক বাবুর চাকরীর ভয় আছে তো"। "চাকরীর আবার ভয় কিসের, জানো? দেশ দেখার জন্যে কম্‌ করে দু-বার চাকরী ছেড়ে পালিয়েছি"? সুরুচি দেবী প্রশ্ন করলেন।—"কি বলছেন, এখুনি বলুন? কেমন— রাজী তো"? হরপ্রসাদ বাবু বলে উঠলেন—"চেঞ্জে যাবার কথা তো ছিলই, বেশ এক সঙ্গে থাকা যাবে"। অলোক চুপ করে থাকে। "তবে হ্যাঁ, যদি দেশে যেতে চাও—আমাদের বলবার কিছু নেই।—অসুখের সময় ভাবলাম তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করি—কিন্তু কেউ কোন খোঁজ দিতে পারলনা"।

"দাদু বাইরে একজন জমাদার এসেছে"।—হরপ্রসাদ বাবু কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। "আচ্ছা এবার বলুন তো—যাবার কি ইচ্ছে নেই"? অলোক জবাব দেয়,—"আগে কোথাও যাবার ইচ্ছে অবশ্য ছিলনা, কিন্তু আপনার কথা আমি রাখবো"।

"যাক বাঁচ গেল। আর একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না? বাড়ী থেকে কি ঝগড়া করে এসেছেন? "না তো"। "তবে বাড়ীর কথা উঠলেই আপনি এত গম্ভীর হন কেন"? "সে অনেক কথা বলবো একদিন"।

চিন্তিত মুখে হরপ্রসাদ বাবু প্রবেশ করলেন—"ছেলেটাকে এনে শেষে—বিপদে না পড়তে হয়"। "কি বাবা"? "আর মা—এই বিলাস—"। "বিলাস বাবুর কি হয়েছে"? "কোথায় গান শুনতে গিয়ে—মারামারী না মাতলামী কি সব করেছে—তাই থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে, যাই এখন থানায়"!

বিলাস বাবুর সম্বন্ধে দু খানা চিঠিও এসেছে—কিন্তু তোমাকে দিইনি"। "কি চিঠি"?—"অনেক কথা আছে—সত্যি মিথ্যে জানি না আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগেনা তার চালচলন"। হরপ্রসাদ বাবু সখেদে বললেন—"ছোকরা শেষ পর্য্যন্ত একটা বাঁদর তৈরী হোল"? "আলোকাকে কি বলেছে জানো! 'কি'?

"এই তোমার টাকার দৌড় কত, আর মধ্যে থেকে আমরা না হাতিয়ে নিই—এই সব আর কি"? "এতদিন কিছু বলিস নিতো"?

বললে তুমি যদি অন্য রকম ভাবো, তা ছাড়া সেদিন রাত্রে বিলাস নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছিল"। হরপ্রসাদবাবুর মুখে চোখে ক্রোধের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো—

বনমাংকির রেলকলোনীতে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। ষ্টেসন মাষ্টার রাম রঞ্জন সেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় অবিশ্রান্ত বকে চলেছেন। "বুইলে কি না ভায়া—ধর্ম্ম—এখনো আছে"। অপর একজন প্রতিবাদ করে ওঠে—"কিন্তু এতে তেজ নারায়ণ সিংয়ের কি এসে গেল"?

"আমি বলছি—দেখে নিয়ো—বেটা লাঠিও ঠিক জব্দ হবে। বুইলে কি না অধর্ম্মের ফল ভোগ করতেই হবে। বুইলে কি না ভায়ারা—আমি অনেক ঘুরেছি অনেক জল খেয়েছি, তারপর - বুইলে কি না? ঠকে ঠকে আর ঠেকে—অনেক শিখেছি"।

কি আশ্চর্য্য বলুন তো, যে কাগজ পোড়ানর জন্যে ভবেন বাবু ঘরে—ঢুকলেন সে সব ঠিক থাকলো, মধ্যে থেকে ভদ্র লোক মারা পরলেন"!

"হতেই হবে, বুইলে কিনা—আমি রামরঞ্জন সেন—খাঁটি "প্র্যাকটিক্যাল ম্যান।" বুইলে কিনা? আমি যা বলি—বুইলে কিনা একেবারে খাঁটি কথা। ওপরে যে একজন আছেন—তাঁর কাছে বুইলে কিনা—কোঁককাঁক ও চলেনা—তারপর গিয়ে—গোঁক-গাঁকও অচল—কেমন কিনা"?

অন্যান্য সকলে হেয়ালী বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। রাম রঞ্জন বাবু এক কথায় চুট্‌কী গল্পের জাহাজ, প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে এমন একটি বচন ছাড়বেন যাতে—পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।

"গোঁক গাঁক—কোঁক কাঁক শোননি বুঝি? গাছ ষষ্ঠীরপূজো হচ্ছে বুইলে কিনা—গ্রামের মেয়েরা সব ষষ্ঠীতলায় জড়ো হয়েছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ বলতে মাত্র দুভাই, যাকে বলে আকাট মুখ্যু—বুইলে কিনা ষণ্ড আর অমর্ক আর কি? এখন পূজোর জন্যে টাটকা গাওয়া ঘি

এসেছে অনেক, বুইলে কিনা গন্ধে চারধার ভুর ভুর করছে—। বুইলে কিনা—বড় ভাই বলে উঠলো—ঘৃতং চুরি ঘৃতং চুরি। অর্থাৎ বুইলে কিনা? ছোট ভায়া ঘৃত চুরি কর? ছোট ভাই পড়লো বিপদে—বুইলে কিনা ঘি রাখবে কিসে, ছোট ঠাকুর সুর করে বলে—রাখি কিসে—? বুইলে কিনা গুনধর দাদা অমনি বলে—নূতন ভাণ্ডে—নূতন ভাণ্ডে। ছোটভাই তখন মেয়েদের আড়াল করে একটা ভাঁড়ে ঘি ঢেলেই চীৎকার করে উঠলো—চুষে চুষে। অর্থাৎ সর্ব্বনাশ হল দাদা—ভাঁড় যে ঘি চুষে নিচ্ছে। বুইলে কিনা—মেয়েরা তখন চাইতে আরম্ভ করেছে—ছোট ঠাকুর কি সব মন্তর পড়ছে। তখন বড় ভাই তাড়াতাড়ি মেয়েদের হাতে ফুল দিয়ে—বুইলে কিনা মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করে দিলে—নাও বল—ওঁ গোঁক গাঁক গনেশায় নমঃ ওঁ কোঁক কাঁক কার্ত্তিকায় নমঃ, বুইলে ভায়ারা।"

সকলে হেসে উঠলো। "তাই বলছি—ওপর ওয়ালার কাছে বুইলে কিনা? গোঁক গাঁক—কোঁক কাঁক কিছুই চলেনা। অবিনাশ বলে "পুলিশ বোধ হয় লাস নিয়ে যাবে।" হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতে রাম-রঞ্জন চীৎকার করে উঠলেন—"হ্যালো সারসি—সেভেন আপ রাইট টাইম"—সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে লাইন ক্লিয়ার ট্যাবলেট খানা বেড়িয়ে এল। অন্যান্য সকলে চললো এস, ডি, ও অফিসের সামনে।

নেপালী চৌকিদারের মুখে সংবাদ পেয়ে সুনির্ম্মল রায় অফিসে এসে দেখেন ভিতর থেকে অফিস বন্ধ। দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, কেরোসিনের দুটো নূতন টিন একেবারে খালি, চারিদিকে কাপড় আর কাগজ পোড়া ছাই—মধ্যে ভবেনবাবুর মৃত দেহ,—। ডাক্তার জানালেন—শ্বাসরোধ হয়েই মৃত্যু ঘটেছে—।

কি আশ্চর্য্য ! যে কাগজপত্র গুলি নষ্ট করবার আশায় ভবেনবাবু প্রাণ হারালেন সেগুলি কিন্তু ঠিকই আছে—। ভবেনবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—"অনেক রাত্রে কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়েছিলেন উনি।" অপর্ণাদেবীর স্বাভাবিক কথাবার্ত্তায় সকলে অবাক হয়ে গেল।

সুনির্ম্মল রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় খবর দিতে হবে বলুন।"

অপর্ণাদেবী বললেন, "থাকবার মধ্যে তো আছে—এক জামাই,—তাকে খবর দিয়েই বা কি লাভ"— ? সুনির্ম্মল রায় অপরাধীর মত লজ্জিত ভাবে বললেন—কয়েক মাস ধরেই এখানে রীতিমত দলাদলি চলছে,—তবে শেষ পর্য্যন্ত ভবেনবাবু—"।

অপর্ণা দেবী সহজ স্বরেই উত্তর দিলেন—'নিজের পাপের ফল উনি ভোগ করে গেলেন, কতবার বলেছি ওগো পরের সর্ব্বনাশ করতে যেয়ো না, নিজে তো গেলেন আবার ওদিকে এক সর্ব্বনাশ বেধেছে—আপনি তো সবই জানেন।'

ভবেনবাবু যাদের নিয়ে দল বেধেছিলেন—তাদের আজ দেখা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। পুলিশ এসে লাশ ছেড়ে দিয়ে গেল, ভবেন-বাবু শত্রুপক্ষের স্কন্ধে চেপেই শ্মশানে চললেন।

৪৬

রাজগীর। প্রাচীন ভারতের রাজগৃহ—আর্য্যাবর্ত্তের "ব্যাবিলন"—যার প্রতিটি অণু পরমাণুতে মিশে আছে পুরাণ—ইতিহাসের কতকথা। পঞ্চশৈল পরিবেষ্টিত—জনপরিত্যক্ত অরণ্য-বহুল স্থানের মধ্যে রয়েছে—কত বিস্মৃত যুগের ভগ্নাবশেষ—সোনা ভাণ্ডার,—গৃধ্র কূট,—রণভূমি সপ্তপর্ণী।

নির্জ্জন নিস্তব্ধ ভূমি—কত পুরাতন স্মৃতিকে টেনে আনে চোখের সামনে। এই সেই পূণ্যস্থান যেখানে ভগবান তথাগত জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন—এখানেই নৃপশ্রেষ্ঠ অশোক—প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তপস্যা করতেন। প্রাচীন রাজধানী বাতাসের সঙ্গে—কানে কানে যেন বলে—কি দেখছ নূতন যুগের আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত অমানুষের দল? আমার বুকের মাঝে, শৌর্য্য-বীর্য্য জ্ঞান-গরিমা প্রেম-প্রত্যাখ্যান উত্থান-পতনের কত লক্ষ লক্ষ কাহিনী মিশে আছে—তা কি কল্পনা করতে পার? খুঁজে দেখ—কত আছে ইতিহাসের উপাদান—যাতে তোমরা পাবে আত্মচেতনা আনন্দের উষ্ণধারা,—মুক্ত কণ্ঠে সমগ্র জগতকে বলতে পারবে—আমরা কত প্রাচীন—কত গৌরবময় জাতির সন্তান।

আর্য্য-অনার্য্যের স্মৃতি পূত ঐ বিরাট ধ্বংসাবশেষ নিমেষে নব্যসভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরকে ভুলিয়ে দিয়ে—সেই প্রাচীন অতীতকে কতরূপে কত স্নেহে আপনার কোরে তুলে। সমস্ত চিত্ত ব্যথায় হাহাকারে কেঁদে উঠে—অন্তস্তল হতে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঝরে পড়ে আঁখি জল।

রাজগৃহ মরে গেছে,—কিন্তু রাজগীর জীবিত। ছোট্ট একটি গ্রাম, সামান্য কয়েক শত লোকের বাস। হয়তো এই স্মৃতিটুকুও লুপ্ত হয়ে যেতো—যদিনা প্রবাহিত হোত পাহাড়ের স্নেহধারা উষ্ণ নির্ঝরিণী রূপে।

লাইট রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক সামনেই নবনির্ম্মিত একটি ছোট্ট বাংলোয় অলোকরা এসে উঠেছে। পক্ষকালের মধ্যে অলোকের

শারীরিক গ্লানি দুর্ব্বলতা দূরীভূত হয়েছে। ডাঃ রায়ের পিসীমা অলোককে যথেষ্ট স্নেহ করেন, সে যে তাঁদের কেউ নয় —নূতন আলাপী বোঝবার কোন উপায় নেই। পিসীমার কথা বার্ত্তায় মনে হয়—অলোকের সঙ্গে যেন তাঁর বহুদিনের পরিচয়, তিনি যেন তাকে শিশু কাল থেকে মানুষ করে তুলেছেন।

একটি কাজের জন্যে—পিসীমার কাছে অলোক খুব বেশী আপনার হয়ে পড়েছে—। প্রায় মাসাধিক কাল তিনি এসেছেন রাজগীরে কিন্তু আসলে যার জন্যে আসা —সেই কুণ্ডস্নানই তাঁর ঘটে ওঠেনি একদিন ও।

বুড়ো মানুষকে কে নিয়ে যাবে অতদূরে—সিঁড়ি ভেঙ্গে নামানো ওঠানো কম হাঙ্গামা নয়। অলোক অনেক কষ্টে একটা ডুলি ঠিক করেছে—। পিসীমার মুখে অলোকের সুখ্যাতি ধরে না—“পেটের ছেলেও এমন হয় না বাপু!”

শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রি। কুণ্ডের স্নানার্থী দল চলেছে কলরব করে। অলোকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে,—কথা আছে খুব সকালে সেও যাবে মেয়েদের নিয়ে কুণ্ড স্নানে। ‘শুনুন’ অলোক চোখে মেলে দেখে—সামনে অলোকা। বিস্ময়—বিমূঢ়ের মত অলোক উঠে বসলো। সে বুঝতে পারে না—ঊষার এই আলো অন্ধকারের মধ্যে—অলোকা তার ঘরে কেন?

অনুচ্চ কণ্ঠে অলোকা পুনরায় বলে—‘একটু দাঁড়ান।’ অলোক বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—কি বলুন তো!

‘একটু দাঁড়ান।’ অলোক বাধ্য হয়ে শয্যা ত্যাগ করতেই অলোকা ধীরে ধীরে তার পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানালো। ‘কি

ব্যাপার বলুন তো!' অলোকা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল—পরক্ষণে প্রবেশ করলেন — সুরুচি দেবী।

অলোকের সমস্ত অন্তর শিউরে ওঠে —'কি মনে করলেন ইনি?' 'কি হোল আপনার!' কি উত্তর দেবে অলোক! সে যেন তখন নিজের সমস্ত সত্বা হারিয়ে ফেলে কেবল প্রতীক্ষা করছে একটি রূঢ় সম্ভাষণের—যার ফলে তার এতদিনের সযত্ন রক্ষিত সুনাম সুখ্যাতি নিমেষে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে—মাত্র একটি কথায় সুরুচি দেবীর।

সুরুচি দেবী প্রশ্ন করলেন —'প্রণাম পেয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন তো?' অলোকের চোখের সামনে থেকে একটা কাল আবরণ যেন খসে পড়লো। এ সমস্ত তবে সুরুচি দেবীর পরিকল্পনা — অলোক আশ্বস্ত হোল।

'আমার বোন কি খুবই কুৎসিৎ!'

অলোক অবাক হয়ে যায় অদ্ভুদ প্রশ্নে—'কেন?'

'তা-নাহলে আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

আশীর্ব্বাদ হয়তো করিনি তখন, কিন্তু এখন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি আপনার বোন সুখী হোন। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ এ সব কি ব্যাপার বলুন তো।'

সুরুচি দেবী হেসে উঠলেন—"খুব ভয় খেয়েছেন না?

'ভয়ের কি আছে? বোন আমার খুব শান্ত।'

অলোক ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে ধীরে ধীরে বলে—'কিন্তু এ সব ছেলে মানুষী করে কি লাভ?' —'ছেলে মানুষী!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সুরুচি দেবী। 'আমার মনে হয় ঠিক তাই।' 'কেন? অলোকাকে আপনি স্নেহ করেন না?' 'স্নেহ—তা বোধ হয় যথেষ্টই করি,—কিন্তু তাই বলে বেশী কিছু

ভাববার দুঃসাহস আমার নেই।' 'আপনি কি আমাদের আত্মীয়তা পছন্দ করেন না?

অলোক বলে—'ঘটনাচক্রে আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয়—কিন্তু এই টুকুই তো যথেষ্ট নয়।'

'কিন্তু যদি আপনাকে নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তাহলেও কি আপত্তি আছে। আমি জানি বাবার অমত হবেনা, তিনি তো আপনাকেও খুব স্নেহ করেন।' অলোক চুপ করে থাকে—এমন অভ.বনীয় অবস্থায় সে কখনও পড়েনি।

'বলুন, আমি কি এতদিন আপনাকে ভুল বুঝে এসেছি?'

'স্বজাতী—মাত্র এই পরিচয়ে—যদি আপনাদের না বাধে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এর বেশী—কোন জবাব আমি দেবনা।' 'আমিও এই টুকুই তো জানতে চেয়েছি শুধু আপনার মত আছে কি না?'

'কিন্তু – আপনার বাবা – ?'

'বাবা? বাবার মত আমি জানি, অলোকাকে আমার হাতেই তিনি সঁপে দিয়েছেন'। ক্ষণকাল নীরবতার পর সুরুচি দেবী বললেন।

'এরপর আর তো কিছু আপত্তি নেই?'

'আছে।—সেই বিজয়া দশমীর দিন থেকে। সেদিন ইচ্ছা থাকলেও জানাইনি আজ—শিব চতুর্দ্দশীর শেষ রাত্রে প্রণাম পেলাম—ঠিক তার পরে আপনি এসে দাঁড়ালেন—দাঁড়ান?'

অবনত অলোকের মাথায় হস্ত স্পর্শ করে সুরুচি দেবী বললেন—

'আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভাই—তোমরা সুখী হবে। জানো অলোক? প্রথম দিন তোমাকে দেখে—সত্যি বলছি, তোমাকে

আমার খুব আপনার বলেই মনে হয়েছিল। ভগবান জানেন আমার সে কামনা কত আন্তরিক।'

নবোদিত সূর্য্যকিরণ সম্পাতে—সুরুচি দেবীকে দেখাচ্ছে অপূর্ব্ব মহিমাময়ী—।

৪৭

বনমাংকির দ্বিপ্রাহরিক স্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল—দেবেন-ফিটারের চীৎকারে —'বেটা জানোয়ার, বেটা শয়তান, বেটা একটা ছুঁচো, বেটাকে খুন করলেও রাগ যাবে না। তোরও মুখ ভেঙ্গে দেব হারামজাদী, আবার কান্না হচ্ছে?'

আশ পাশের কোয়ার্টার থেকে ছোট বড় মেয়ের দল স্থানে স্থানে ভীড় করে জটলা পাকাচ্ছে। কারুর মুখে হাসি কেউবা মন্তব্য প্রকাশ করছে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে। যে যাই বলুক আর করুক সকলের দৃষ্টি কিন্তু একই স্থানে নিবদ্ধ। পশুপতি পেণ্টার আর দেবেনের কন্যা কেতকীকে এরা যেন পূর্ব্বে কখনও দেখেনি।

দেবেনের উগ্রমূর্ত্তি উগ্রতর হয়ে উঠলো. 'এখানে তাম্‌সা হচ্ছে বুঝি? সব হাঁ করে কি দেখছো, খুব মজা হচ্ছে না? যাও—যাও সব বলছি।' দেবেনের ভৎর্সনায় কেউ কান দিতে চায় না, পশুপতির পাশে কেতকী—অতএব ব্যাপারটা বেশ মুখ রোচক, সবটুকু না জেনে কি যাওয়া যায়?

দেবেনের তর্জ্জন গর্জ্জন অকস্মাৎ থেমে যায়। 'কি করছেন মশাই? কেলেঙ্কারী বাধাবেন নাকি?' দেবেন সবিস্ময়ে বলে 'কেলেঙ্কারী?'—'কেলেঙ্কারীর বাকী কোন খানটায় শুনি?' ইতিমধ্যে—ভীড়টা অনেক

কাছে এসে পড়েছে—সকলে সাগ্রহে শুনতে চায়—ভিতরকার ব্যাপারটুকু।

দ্বিজেন বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—'যাও, যাও সব এখান থেকে' জনতা একটু দূরে সরে গেল মাত্র।

দেবেন বলে—'ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের লোক আমি নই বুঝলেন? এই হারামজাদী আর ঐ ব্যাটা জানোয়ারের যত সব নষ্টামী।' পরক্ষণে কেতকীর চুলের মুঠি ধরে এক বিরাশি সিক্কার কিল তুললো দেবেন। দ্বিজেন বাবু প্রহারোদ্যত হাতখানা ধরে বললেন—'আপনার মাথা খারাপ হোল নাকি?' 'মাথা খারাপের কিছু বাকী রেখেছে নাকি ঐ সর্ব্বনাশী? জানেন মশাই—সেই সাত সকালে সেদ্ধপোড়া খেয়ে বেরিয়ে যাই ফিরিতো রাতে। আজ দুপুরে হঠাৎ এসে পড়তেই ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। বাক্সের চাবী থাকে ঐ হারামজাদীর কাছে,—গিন্নি বললেন পণ্ডর সাবু নিয়ে গিয়েছে এখুনি আসবে। দেরী দেখে খোঁজ করতে এসে দেখি এই ব্যাপার।'

দেবেন পুনরায় গর্জ্জন করে উঠলো—'চোখে আঙ্গুল দিয়ে কান্না বন্ধ করে দেবো একেবারে—।' 'যাক আর চেঁচাবেন না, যাও কেতু তুমি বাসায় যাও।' অপরাধী কেতকী স্থান ত্যাগের উপক্রম করতেই দেবেন চটে ওঠে,—'বলি চল্‌লি যে? আমি ভদ্রলোক নই মশাই যে চাপাচাপির তোয়াক্কা করবো। দাঁড়া সর্ব্বনাশী দাঁড়া চুপ করে—।' কেতকী দাঁড়িয়ে পড়লো।

'একটা নিষ্পত্তি চাই, নাহলে ওকে আমি ঘরে নেবনা।' দ্বিজেন বাবু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তার মানে?' 'মানে—খুব সোজা—বুঝলেন তো।'

মায়ের আগমনে কেতকী কেঁদে উঠলো। কেতকীর মা বিপদ দেখে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন দ্বিজেন বাবুর কাছে, স্বামীর মেজাজ তিনি বেশ জানেন, -তাই একটু আভাসে কিছুটা প্রকাশ করেছিলেন দূতের মুখে।

কন্যার কাছ বরাবর যেতেই দেবেন বাধা দিল—'খবরদার ওদিকে যাবেনা বলছি?' দ্বিজেন বাবু বেশ রাগের সঙ্গে বললেন— বাসায় গিয়ে কেলেঙ্কারী করলেই তো পারেন, চারিদিকে ভীড় জমিয়ে কি করছেন বলুন তো! দ্বিজেন বাবুর কথার ফল এবার ফল্‌লো, দেবেনর গলার স্বর একেবারে খাদে নেমে পড়লো।

'বেশ আপনিই বিচার করে দিন, আমার আর বলবার কি আছে'— দেবেন মাটিতে বসে পড়লো। 'বসলেন কেন - বাসায় চলুন না? দেবেন বলে 'যে দিকে দু চোখ যায় চলে যাবো—গিন্নিই তার সোনার সংসার সাজিয়ে আমোদ ভোগ করুক আমার বয়ে গেছে।' —'কি হয়েছে বলবেন তো?' 'কি আর বলবো বলুন, এই পশুপতি বেটা, সত্যি সত্যি একটা পশু। দেশ থেকে এনে চাকরী করে দিলাম—হাজার হোক দেশের ছেলে হাত পুড়িয়ে খাবে,— তাই গিন্নির কথায় বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। আর ওর কি না এই ব্যাভার মশাই?' দ্বিজেন বাবু বলেন 'বেশতো পশুপতি যদি অন্যায় কিছু করে থাকে তাব প্রতিকার ও আছে,—আপনি এত ভাবছেন কেন?' 'প্রতিকার আর ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু—আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে! বিধবা মেয়ে পর পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় বসে গল্প করছে নিজের চোখে দেখেছি।' কেতকী বিধবা! বিস্মিত কণ্ঠে দ্বিজেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। ধরা গলায় দেবেন জবাব

দেয়—'হ্যাঁ মা ওকে গৌরীদান করেছিলেন—মা জননী ছিলেন আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তিনি থাকলে আজ ?'—দেবেন ফুঁপিয়ে ওঠে। সোমত্ত মেয়ের জন্যেই পশুকে বাসায় রাখিনি'—পরক্ষণে দেবেন গর্জ্জন করে উঠলো—'বেটা ছোটলোক আবার লেখা পড়া জানে, অমন লেখাপড়ার মাথায় মারি জুতো।'

অসুস্থ পশুপতি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি—নীরবে সহ্য করেছে সমস্ত লাঞ্ছনা অপমান। দ্বিজেন বাবুর উপস্থিতি তে সাহস সঞ্চয় করে সে বলে 'মীমাংসা আমিও চাই দেবেন কাকা, কেতুর যদি তোমার ওখানে স্থান না হয় আমার কাছেই থাকবে সে'—দেবেন তড়াক করে উঠে পড়লো—'তার মানেটা কিরে হতভাগা, জিভ্ টেনে বের করে তবে আমার নিস্তার'—

দ্বিজেন বাবু দেবেনকে চেপে ধরলেন, 'পাগল হলেন নাকি ?' 'বেটার সাহস দেখে পাগল হওয়াই উচিৎ। জানেন—মা ঐ সর্ব্বনাশীকে মন্ত্র দিয়ে গেছেন, আর আমার সেই মেয়ে কি না ?'—তাহলে কি করতে চান বলুন, মেয়েকে বাড়ীতে স্থান দেবেন না, আবার যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তাতেও আপত্তি।' 'বিয়ে কি করে হবে, ও বেটা যে জাতে কায়েত।' দ্বিজেন বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—জাতের বিচার দেখতে গেলে চলবে না, মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটা কিছু করতে হবে তো'। নিরাশ ভাবে দেবেন উত্তর দেয়—'আপনারা পাঁচজন আছেন—যা হয় করুন, আমার মাথার ঠিক নেই, কাজ কর্ম্ম সব মাটী হোল—ইঞ্জিন টিনজিন সব খুলে, এক ফ্যাসাদে পড়লাম।' 'সেই ভাল, আমরা পাঁচ জনে যা ভাল বুঝবো আপনি তাতে আপত্তি তুলতো পারবেন না।

পশুপতি তুমি সন্ধ্যের পর আমাদের মেসে যাবে বুঝলে, জাতের বাহাদুরি নিয়ে বসে থাকলে চলবেনা।

পশুপতি সুবোধ বালকের মত সঙ্গে সঙ্গে বলে—আজ্ঞে না। দ্বিজেন বাবু দেবেন ফিটারের হাত ধরে এগিয়ে চললেন পিছনে চললো মা ও মেয়ে। পশুপতির রোগ পাণ্ডুর মুখে—হাসির রেখা ফুটে ওঠে—সে আজ মস্তবড় আস্তিক। 'ভালই হোল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই'—কেতকীকে প্রার্থনা করবার সৎসাহস হয়তো তার কোন দিনই হোত না ঐ বিষম বদরাগী দেবেন কাকার সামনে।—

কেতকীর দিকে পশুপতি চেয়ে থাকে,—দ্বিজেন বাবুর কথায় সে যেন একটা নূতন পথের সন্ধান পেয়েছে, মনের মধ্যে—সংশয়—আনন্দের দ্বন্দ্ব বেধেছে তার।

৪৮

বেশ গরম পড়েছে রাজগীরে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাত বৃদ্ধি হয়েছে মশা আর মাছির। পিসীমার মন টানছে বাড়ীর দিকে সুরুচি দেবী পুর্নিয়ার ফিরতে ব্যগ্র। দিন কয়েক ধরে রাজগীরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হয়েছে, আজ অলোক এসেছে সুরুচি দেবী আর অলোকাকে নিয়ে নালন্দা দর্শনে।

নালন্দা—ভারতের আদিম বিশ্ববিদ্যালয়। যার সুবিশাল হর্ম্ম্য-রাজী দূর থেকে দর্শকের মন আকৃষ্ট করে তুলতো, যেখানে সমগ্র এশিয়ার পাঠার্থী জ্ঞানার্জ্জনের আশায় ছুটে আসতো—সে নালন্দা আজ ধ্বংশ স্তূপে পরিনত। বুদ্ধের চরণরেণু পুত, নালন্দা, গুপ্ত বংশ থেকে

পাল বংশ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল. নালন্দার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক কথা।

সম্রাট কুমার গুপ্তের ভিত্তি স্থাপনের পর সঙ্ঘারাম মন্দিরে ক্রমশঃ গড়ে উঠতে লাগলো নালন্দা। তারপর স্কন্ধ গুপ্তের সাথে সাথে গুপ্ত রাজশ্রী বিমলিন হয়ে গেল. হুন রাজ মিহির কুলের বর্ব্বর সেনাদল বিধ্বস্ত করে দিল জ্ঞান-নগরী নালন্দাকে। মৌখরীরাজ পূর্ণবর্ম্মা—পুনরায় হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনলেন, শিলাদিত্য—নালন্দাকে সমগ্র এশিয়ার চক্ষে বরনীয় করে তুললেন। হর্ষের তিরোধানের পর সমগ্র ভারত ডুবে গেল অন্ধকারে, সেই তিমিরে নালন্দাকে আর কিছুদিন দেখা গেলনা। বঙ্গদেশে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্টার পর —ধর্ম্মপাল দেবের রাজত্ব কালে আবার নালন্দা পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

তারপর—সেন—পাল রাজবংশের আত্ম কলহের অবকাশে—মুশলমান আক্রমণে—বিধ্বস্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল জগৎ বিখ্যাত নালন্দা। অসংখ্য জ্ঞানার্থীর কল-কোলাহল মুখারিত নালন্দা আজ কেবল ভগ্ন স্তূপ আজ নালন্দায় —ধর্ম্ম—দর্শন —ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা—তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা চলেনা. আজ আর নালন্দার প্রবেশদ্বারে—দ্বার পালের কূটপ্রশ্নে প্রবেশার্থীকে বিচলিত হতে হয়না। নালন্দা শুধু আজ ধ্বংশের প্রতীক।

পরিশ্রান্তা সুরুচি দেবী নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অলোক-অলোকাকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছে তিন নম্বর স্তূপের উপরে। অলোকাও শ্রান্ত—বিন্দু বিন্দু ঘামের সঙ্গে গণ্ডের রক্তিম-আভায় অলোকাকে দেখাচ্ছে সুন্দর। অলোকাকে বিশ্রাম দানের আশায় অলোক একটু

দূরে দাঁড়িয়ে নিসর্গ-লক্ষ্মীর অপরূপ রূপের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে রাজগীর পাহাড় যেন মেঘের সঙ্গে মিশে গেছে,—শষ্যক্ষেত্রের শ্যামলিমার অপূর্ব্ব মাধুরীতে মন যেন ভরে যায়, উদার উন্মুক্ত বায়ু—বয়ে চলেছে উন্মত্ত নর্ত্তণে।

শিবরাত্রির পর থেকে অলোক একটি কথাও বলেনি অলোকার সঙ্গে। আজ তার মনে একটা কৌতুহল জেগেছে, অলোকার নিজস্ব মতামত তার জানা উচিৎ। যদিও সে বেশ জানে বাঙালী মেয়েরা এ বিষয়ে লজ্জায় মুয়ে পড়ে অথবা ছোট্ট একটি শব্দ 'জানিনা' তাদের জবাব, তবুও অলোক জিজ্ঞাসা করবে—।

কাছে এসে অলোক বলে- একটা কথা 'জিজ্ঞেস করছি উত্তর দেবেন তো ?' অলোকা নিরুত্তর।

'সেদিন আপনার দিদি একটা কথা বলেছেন জানেন নিশ্চয় ?'। আপনার নিজের মতামতটাও জানা দরকার—কি বলুন ?" অলোকা একবার মাত্র অলোকের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। "কই বললেন না ?" "কি বলবো বলুন ?" "যা জিজ্ঞেস করলাম।" "আপনার দিক থেকে বাধা থাকলে হবেনা এইটুকুই জানি।" "আমার কথার তো এ উত্তর নয়।" অলোকা হেসে ফেলে, "এর বেশী আমি কি বলব বলুন।" পর ক্ষণে অলোকা প্রশ্ন করে,—আপনার কাছ থেকে আমিও একটা কথা জানতে চাই ? অলোক বিস্মিত হয়ে যায়, বাঃ অলোকা তো বেশ সপ্রতিভ। 'সেদিন প্ল্যাটফর্ম্মে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু দিদিকে বলতে মানা করেছিলেন কেন ?' 'এমনি।' 'আপনি ভীষণ রাগী, আপনার চিঠির উত্তর পান নি তাই।' অলোক হেসে ফেলে। 'আপনার কথা তো আমি রেখেছি—

আমার একটা অনুরোধ রাখুন। অলোক সাগ্রহে চেয়ে থাকে, কি কথা বলবে অলোকা। 'এখান থেকে গিয়ে পূর্ণিয়া কোর্টে যখন আসবেন—তখন দিদির সঙ্গে দেখা করবেন?' অলোক বলে আচ্ছা—।

'আর একটা কথা' আমার এ কথা কাউকে বলবেন না।' অলোক সম্মত হোল। 'চলুন এবার যাই।'

অলোক আজ তৃপ্ত—তার সন্দেহের কুয়াশা অলোকার সামান্য কথায় নিমেষে কেটে গেছে।— অলোকার প্রকৃত মূর্ত্তি আজ তার চোখের সামনে স্বচ্ছরূপে ফুটে উঠেছে—আজ আর অলোকা প্রহেলিকা নয়—সন্দেহ নয়—কল্পনা নয়, অলোকের মানসী—রক্তমাংসে গড়া মানবী আকারে।

৪৯

সকাল থেকে রেল কলোনী চঞ্চল মুখর, চীৎকার হাসি দৌড় ঝাঁপ সেই সঙ্গে রং আবীর মায় গোবর জল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে উৎসবের উপকরণরূপে। রোগা লম্বা বটব্যাল কে সং সাজানো হয়েছে, তিনি চলেছেন আগে পিছনে প্রায় জন পঞ্চাশেক প্রৌঢ়। পোষাক চেহারা দেখলে মনে হয় না যে এরাই গম্ভীর মুখে ধীর মস্তিষ্কে অফিস পরিচালনা করেন। অনেকেরই দেহ থেকে গোলাপজল আতরকে ছাপিয়ে বেরিয়ে আসছে তীব্র উৎকট একটা গন্ধ। আমোদের উপকরণ-রূপে সোমরসের পরিবর্ত্তে সুরা। স্যামুয়েল—মল্লিক ভুঁড়ির উপর কুঁচি দিয়ে শাড়ী পরিধান করে গান ধরেছেন—"আজ হোলী খেলবো শ্যাম তোমার সনে"—। গানের সঙ্গে নাচের ব্যবস্থাও আছে—কিন্তু

তরলাগ্নি প্রকোপে বেতালের মাত্রা আধিক্য ঘটে চলেছে—হাসির রোলের বিরাম নেই।

ঠিকাদার পাড়ায় ঢোল করতাল হাত তালির সঙ্গে উঠছে উৎকট চীৎকার ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা—ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা—ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা গুরুজী লেচ্চলেজা লেচ্চলেজা লেচ্চলেজা ফাওয়া। সমস্ত স্থান আবীরে মাখামাখি। প্রত্যেকের নূতন জামা কাপড় বহু বর্ণে চিত্রিত। মানুষ চেনা মুস্কিল প্রত্যেকের মুখ ও মাথায় কম করে আধপো আবীরের প্রলেপ। লাড্ডুমল টেওমল ব্রিজলাল বিন্ধ্যেশ্বরী সবাই—লালে লাল।

'এক্স-ই-এন' আফিসের মেসে খুব হল্লা হচ্ছে—। বিকাশ কিছুতেই রং মাখতে রাজী নয়, দরজায় খিল এঁটে বসে আছে, জনকয়েক মেস—বিহারী ঘরের চাল ছিদ্র করে ঢাললো বালতি বালতি গোবর জল। বিকাশকে শেষ পর্যান্ত দরজা খুলতে হল, নাহলে দেহ বাঁচাতে গিয়ে ঘরের আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে যায়। আজকের দিনে বেয়াদপির শাস্তি স্বরূপে বেচারীকে সম্পুর্ণ নগ্ন দেহে উঠানে দাঁড়াতে হয়েছে,—বালতি বালতি গোবর জল পড়ছে সর্ব্বাঙ্গে। শেষ পুর্য্যন্ত বিকাশ লাগালো লম্বা ছুট—পিছু নিল অনেকে।

'টি-এক্স-আর' অখিলপতি সকাল থেকে ধন্না দিয়েছে গার্ড্ হেমন্ত বাবুর বাসায়, বৌদি অর্থাৎ বন্ধুপত্নীকে রঙ না মাখিয়ে সে নড়বেনা। নিরুপায় বন্ধুগৃহিনীকে অগত্যা সামনে আসতে হোল। ঘন ঘন পিচকারী বর্ষণে—অনুপমার শ্বেত বস্ত্র রাঙা হয়ে গেল তবুও—অখিলপতি নিরস্ত হয় না। অনুপমা অনুনয় করে—"এবার ছেড়ে দিন!" 'দিচ্ছি কিন্তু একটু আবীর।' অভ্রমিশ্রিত আবার নিয়ে এগিয়ে গেল অখিল-পতি। অনুপমা আঁটসাট সিক্তবস্ত্র জোর করে আকর্ষণ করতে

খানিকটা ছিন্ন হয়ে গেল। অকস্মাৎ সঙ্কুচিতা লজ্জাশীলা অনুপমা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ফোঁশ করে ওঠে—"ছোটলোক" ! বেহায়া অখিলপতি হাসতে হাসতে চলে যায়।

এমন আনন্দের দিনে বেচারী বিল্টুর বুকে দুরু দুরু কম্পন সুরু হয়েছে। সে না পারছে হাসতে—না পারে বন্ধুদের সঙ্গে মিশ্‌তে, আফশোষে আত্মধিক্কারে—তার মুখ আজ বিবর্ণ। কেবলই মনে পড়ে অতটা ভাল হয়নি—। পূর্ণিয়াকোর্ট থেকে বিল্টু—বেশ নাবালকটি সেজে রাণুদের বাসায় যাতায়াত করতো। মাসীমা অর্থাৎ রাণুর মা বেশ সুখ্যাতিও করতেন, "খাসা ছেলে, ও না থাকলে হাটবাজারের কি হোত ! উনি তো কাজ নিয়েই ব্যস্ত।" সেই রাণুর মা কিনা—আজ বিল্টুকে পরিষ্কার বলেছেন 'তুমি আর আমাদের বাসায় এসোনা বাছা।'

বিল্টুর কানে যেন স্পষ্ট বাজে রাণুর মায়ের কথা—

বহায়া বুড়োধারী মেয়ের বেহায়াপনা ভাংচি, আগুন উনি একবার ! নাঃ অমন করে রং মাখাতে যাওয়া ঠিক হয়নি, বাবার কানে গেলে পিটের চামড়া আর আস্ত থাকবেনা।

দেবেন ফিটার আজ খুব ব্যস্ত. একলা মানুষ বাড়ীবাড়ী ঘুরে বেড়াছে "যাবেন বুঝলেন কেতুর বিয়ে—?

দেবেনকে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিজেন বাবুর বিচার মানতে হয়েছে।—প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চায়না, মায়ের গৌরীদান করা কন্যাকে কি করে সে পরের হাতে দেবে। অন্যদিকে কেলেঙ্কারীকে ঠেকানো মুস্কিল অনেকেই আত্মীয়তা মাখানো আবদারে দেবেনকে অপমান করতে ও ছাড়েনি। কখনও দেবেন রেগেছে কখনও বা হাসি মুখেই উত্তর দিয়েছে।—এদিকে আবার সুনির্ম্মল রায় পর্য্যন্ত কেতু আর

পশুপতির দিকে—অতএব দেবেনের নিজস্ব মতামতকে বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে।—দুদিন আগে সরল বেচারী অনেক কথা আপনা থেকেই প্রকাশ করেছে,—তার চোখে ধুলো দিয়ে গিন্নীরই এ সব কারসাজি, না হলে মেয়ের এত সাহস হতো না কখনও। পশুপতি নাকি খুব ভাল হাত দেখতে পারে,—গণক সেজেইতো যত কেলেঙ্কারী,—এত সব কাণ্ডকারখানা।—দেখা যাক, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—ছেলে হলে বুঝবো বেটা কত বড় গণৎকার।

আইবুড়ো মেয়েদের জটলা চলছে "ওমা, দেখলি ভাই ওর পেটে—পেটে কি ছিল।" অনেকের পেটে অনেক কিছুই আছে কিন্তু প্রত্যেকেই চাপা দিয়ে চলে, প্রকাশ পেলেই দু চোখ কপালে উঠে যায়—বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না।

গীতা ও এসেছে, তার গয়না বেশ ভূষায় অনেকের মনে হিংসা হয়। গীতা কথা কয় কম, কেউ কেউ বলে—বড়লোকের বউ কিনা তাই, এত দেমাক। অনেকে আবার মুখ টিপে হাসে—যারা জানে দিলীপ ঘটিত ব্যাপার। দিলীপ ও এসে জুটেছে, পূর্ব্বের মতই আবার অবাধে মিশছে। সুমিত্রার সাবধান বাণী শান্তি দেবীর সন্দেহ সব দিলীপ ভেঙ্গে দিয়েছে—প্রাণপণ পরিচর্য্যায়—। শান্তিদেবী কতবার বলেছেন—পেটের ছেলেও এমন সেবা করতো না কখনও। সত্যিই—দশটি রাত্রি দিলীপ বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছে মামীমার অসুখের সময়,—গীতা কিন্তু অনেক সময় ঘুমিয়ে পরেছে—। গীতার সীমন্তে সিন্দুর দুহাতে রাঙা শাঁখা-অনিমেষ রূপবান বিদ্বান অনেক টাকার মালিক—অতএব সন্দেহ মহাপাপ।

ষ্টেসনে চলছে কয়েকজন ছোকরাবাবুর মালপো ভক্ষণ। রামরঞ্জন যেন পেটেণ্ট করা ভাঙ্গা গলায় বলেন' 'আস্তে-আস্তে, মৃদুমন্দ গতিতে বুইলে কিনা ধীরে ধীরে খাও বাপধনেরা, বুইলে কিনা গোগ্রাসে গিললে বসে থাকতে হবে।' খাদ্যবস্তু নিঃশেষ হয়ে যায়—রামরঞ্জন চেঁচামেচি সুরু করেন—'বাপ গঙ্গারাম ও রামফড়িং—আঃ কি বলে ইয়ে, বুইলে কিনা—নাম মনে না থাকাটা বুইলে কিনা একটা মস্ত বড় বুইলে কিনা?' রামরঞ্জন হেসে উঠলেন। ঠাকুর রামানন্দ খাবার নিয়ে এগিয়ে আসে,—মাষ্টার মশাই চীৎকার করে ওঠেন—'গজেন্দ্র-গমনে না এসে একটু শ্রীপদ চালনা কর বাপধন, বুইলে কিনা সবই বরাত, যত সব ঢিমে তেতালা জোটে আমার ভাগ্যে—। গিন্নীর রোজই অসুখ—ওষুধ দিয়ে দিয়ে বুইলে কিনা?—হদ্দ হয়ে গেলাম, তারপর বুইলে কিনা—বাক্যি যন্ত্রণার বিরাম নেই, না যায় প্রাণ কাকুতি সার। ঠাকুর চাকরও সেই রকম—! বুইলে কিনা—কপালে লিখিতং ঝাঁ্যাটা কোন শালা কিং করিষ্যতি।'

সহকারী ইঞ্জিনিয়ার স্থনির্ম্মল রায়ের বাংলোয় ঠিকাদারেরা অপেক্ষা করছেন,—শুভ্র খদ্দর পরিহিত রায়সাহেব বেরিয়ে এসে যুক্ত করে নমস্কার করে দাঁড়ালেন—একে একে চললো আবার দান, সন্ধ্যায় আবার সকলকে আসতে হবে এখানে—রায়সাহেবের নিমন্ত্রণে। পথের মাঝে শ্রীকিষেণ সিং বলেন—'আশ্চর্য্য মানুষ এই ছোটসাহেব, একসঙ্গে কত গল্প করতে করতে অফিস পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অফিসের চেয়ারে বসেই মানুষটি গেল একেবারে বদলে!' অপর একজন বলে 'নূতন কিনা?' বৃদ্ধ ঠিকাদার মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলেন 'তা কিছু বোঝা মুস্কিল—হয়তো এই রায়সাহেবই একদিন দুর্দ্দান্ত

বদমেজাজী আর ঘুঁষখোর হ'য়ে উঠবেন, তখনকার দিনে এই সহজ সরল মানুষটিকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবেনা। চাকরী বড় খারাপ জিনিষ মানুষকে একেবারে অমানুষ করে তোলে।'

কুলীপাড়ায় চলছে হল্লা,—চামারিয়া নেশার ঝোঁকে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছে বৈজু পত্নীর ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চামারিয়ার ইয়ার-বন্ধু মুন্নালাল ছেদীলাল যোগ দিয়েছে বৈজুনাথের সঙ্গে। চামারিয়ার পক্ষেও জুটেছে অনেকে। তর্কযুদ্ধে উভয় পক্ষই "লেকিন" আর "মগর" শব্দ দুটো খুব ঘন ঘন ব্যবহার করছে—জ্ঞানের কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। কুলী রমণীরাও কোমর বেঁধেছে। পুরুষ-দের চেয়ে কলহে তারা কিছু কম যায় না। নাকের রূপার খাঁচাটা দুলিয়ে হাত নেড়ে বিকৃত স্বরে অভিনব সম্ভাষণ চালিয়েছে বৈজু পত্নী। চামারিয়ার স্ত্রী ও ক্রমাগত পা ঠুকে চলেছে, আঘাত যেন ঠিক পড়ছে বৈজুনাথের মাথায়, মুখের বিকৃত ভঙ্গীতে মুখখানা ভীষণ কদাকার হয়ে উঠেছে। তালরসের কলসী—মদের শূন্য বোতল—পাতার ঠোঙ্গা—মাটির পাত্র আর তৈলপক্ক খাদ্যদ্রব্য চারিদিকে ছড়ানো। সত্যই কুলী-পাড়া বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে।

৫০

বারহারা কোঠিতে আলোক বদলি হয়েছে—। অন্যসময় এমন নির্জ্জন স্থানে সে কিছুতেই থাকতে চাইত না কিংবা পারতোনা, এখন একা থাকাটাই সে পছন্দ করে। সব সময় তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে কত কথা কত স্মৃতি, আপন মনে সে তাই ভেবে চলে। অনেক সময় নিজেই হেসে ফেলে, একি হোল তার? সে তো এমন ছিলনা।

মনে পড়ে, একবার জোর করে তাকে সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল বোর্ডিংএর ছেলেরা। নেশার ঘোরে সমস্ত রাত সে একদৃষ্টে কেবল ঘড়িটার দিকে চেয়ে ভেবেছিল, দেওয়ালের চোখ গজালো কি করে? হাজার চেষ্টাতেও ঘড়িটাকে সে আবিষ্কার করতে পারেনি। এতদিন পরে সেই নেশায় তাকে পেল নাকি? কাজ কর্ম্ম অবসর—সব সময় হৃদয় তন্ত্রীতে বাজে এক ছন্দ এক সুর—অনাগত কোন অমৃতের আশায়—নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্ক মন এমন পুলক উন্মুখ? নিখিল ভুবন কি—তার সঙ্গে মদির মায়ায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছে—না হলে পুষ্পের উতলা গন্ধে—বাতাসের মৃদুল গানে—নূতন ছন্দে তার অন্তর নেচে ওঠে কেন? অলোকা—অলোকা কি তার কল্পলতার কাম্য ফুল?

ষ্টেসন থেকে গ্রামও বাজার বেশ একটু দূরে—। বাজারে আছেন দু'জন বাঙালী ডাক্তার, সম্পর্কে মাতুল আর ভাগিনেয়, কিন্তু বর্ত্তমানে অহি নকুলের পর্য্যায়ে এসে গিয়েছে।— মাতুল মহাশয় পুলিন ডাক্তারের নামে চটে ওঠেন, "ও আবার চিকিৎসার কি জানে আমার বোতল সাফ করে—আর ঘর ঝাঁট দিয়ে তো এত বড় হোল—।" পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে অলোকের বেশ আলাপ জমেছে, পুলিন চক্রবর্ত্তীর ডাক্তার খানায় এ্যালোপ্যাথিক—হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক সেই সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ওষুধের অভাব নেই,—ধন্বন্তরী পুলিন আয়ু রক্ষার কোন ত্রুটীই রাখেন না। সন্ধ্যার পর অলোক একাকী ভেবে চলেছে—এখানকার কাজ শেষ হতে প্রায় বৎসর খানেক, তারপর হয়তো অন্য কোথাও বদলি কিংবা চাকরী খতম। যদি চাকরী যায় তখন কি করবে সে? এত বড় দায়িত্ব বহন করার পূর্ব্বে সব কিছু ভেবে দেখা উচিৎ? সমস্ত চিন্তাকে ছিন্ন করে একখানি

মুখের নিমীলিত চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে একখানি মুখ। কাণে বাজে একজনের কথা—"বেশ থাকবো. চাকরীর চেয়ে ব্যবসা ঢের ভালো, একটা ভালো যায়গা দেখে কিছু করলেই চলবে।" অলোক উঠে বসলো। মন যখন দুঃসাহসে ভরে উঠে, তখন পথের দুর্গমতাকে মোটেই আর ভয় হয় না।

ঠিক কথা, একটা কিছু করলেই চলবে। স্বাস্থ্য আছে সাহস আছে, অভাব কিসের ?, বালিসের তলা থেকে একখানা চিঠি বের করে অলোক পড়তে লাগলো। চিঠির শেষের দিকে—লাল কালির-ক্ষুদ্র রেখাটির প্রতি অলোক চেয়ে থাকে। চিঠিখানি সুরুচি দেবীর কিন্তু ঐ লাল দাগটুকু অলোকার আঁকা। দু'জনে যুক্তি-পরামর্শে স্থির করেছে—চিঠি পত্রের বালাই তাদের থাকবেনা কিন্তু সামান্য সূক্ষ্ম রেখায় চলবে তাদের আলাপ।—অলোকের মন আনন্দে ভরপুর, বাঃ অলোকার সবই তো বেশ মনে থাকে—সে কিন্তু নিজেই ভুল করে বসে আছে। চিঠিতে তো কোন অভিজ্ঞান সে পাঠায়নি ? মনে মনে অলোক হেসে ওঠে – ভালই হয়েছে দেখা হলে এটাই হবে তাদের কথাবার্ত্তার ভূমিকা। কতকগুলো জিনিষ পাঠাবার কথা ছিল অথচ একটাও পাঠানো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ তৈরী হয়ে যায়,—'এই বনবাদাড়ে কি কিছু পাওয়া যায় নাকি।'

'আসুন, আসুন'! কক্ষে প্রবেশ করলেন পুলিন ডাক্তার আর দুজন বিহারী ভদ্রলোক। পুলিন ডাক্তার সঙ্গী দু'জনের পরিচয় দিলেন—'ইনি এখানকার জমিদার—বাবু ভোলারাম ভকত, বেশ ভালো বাংলা জানেন বাড়ীতে অনেক বাংলা বই আছে—দরকার হলে নিতেপারেন। আর ইনি হচ্ছেন রঘুনাথ মিশির, এখানকার সব চেয়ে বড় মার্চ্চেন্ট। এঁরই গোলায়

পোষ্ট অফিস বুঝলেন।" অভিবাদনের পালা শেষ হয়ে গেল। ঘরে একখানি ক্যাম্পখাট ভিন্ন বসবার আসন নেই। অলোক খাট দেখিয়ে বলে 'বসুন আপনারা'।—ভোলারাম ভকত উত্তর দিলেন—"না বসবো অন্য দিন, আজ খালি আলাপ করতে এলাম। তা আপনার ভয় ডর করে না? "কিসের ভূতের?" রঘুনাথ হেসে ওঠে—"টিওকল বাল্যাতো ওহি বাস্তে ভাগ্ লো"।—ভোলরাম বিদায় বেলায় বলেন—"দেখুন মোশায় আমাদের দেশে এসেছেন যা যখন দরকার অদরকার হয় জানাবেন। কিছু লজ্জ-অজ্জা করবেন না. কি বলেন ডাক্তার বাবু!" পুলিন ডাক্তার সায় দিল—"সে তো নিশ্চয়ই।"

আগন্তুকদের বিদায় দিয়ে অলোক বেণী সিংকে জিজ্ঞাসা করে 'রান্নার কত দেরি।' বেণীর এক ঘেয়ে ডাল রুটী, ভাত ডাল আর ভাজী, তার ভালো লাগেনা। নিজের রুচি পরিবর্ত্তনে অলোক আশ্চর্য্য বোধ করে। খাদ্য সম্বন্ধে এত বাচ্ বিচার সে শিখলো কি করে? আহার্য্যের তারতম্য স্বাদ আস্বাদন সম্বন্ধে কোন বিচারই তো সে করেনি কোন দিন। মেসের অন্য সকলে যখন ঠাকুরের উপর তম্বি চালাচ্ছে,—"অখাদ্য কি মানুষে খায়," সে তখন ভোজন পর্ব্ব প্রায় সমাধা করে ফেলেছে। সুরুচি দেবীর রান্নাই কি, তার এই অধোগতির কারণ?

আশ্চর্য্য এই বাংলাদেশের মায়ের জাত, এরা নিমেষের দৃষ্টি-পাতেই বুঝে নেয়, কোনটা কার প্রিয়। ধোঁকার ডালনা যে-সে খুব ভালবাসে সুরুচি দেবী সেটা বেশ ধরে ফেলেছেন। সত্যিই মায়ের মৃত্যুর পর এমন স্নেহ যত্ন মমতায় বহুকাল তার আহার জোটেনি। দূর থেকে—ট্রলীর আওয়াজ ভেসে আসে। কে আসছে

এমন সময় ? ওভারসিয়ার গাঙ্গুলীর কথায় অলোক চমকে ওঠে—। “পূর্ণিয়া কোর্টের ডাক্তার এখানে বদলি হয়ে আসছেন কাল।” ভাগ্যে অন্ধকার ! না হলে তার মুখচোখের ভাবটা ধরা পড়ে যেতো গাঙ্গুলীর কাছে। অলোক কথাটা আবার জেনে নিল, ‘ওপেন লাইনের’ ডাক্তার পূর্ণিয়া কোর্টে এসেছে—তাই, ডাক্তার রায়...।” ট্রলীর শব্দ মিলিয়ে গেল। নাঃ গাঙ্গুলী ঠাট্টা’ করতে পারে না ভীষণ রাশভারী লোক—। অলোক মনে মনে হাসে—হঠাৎ অলোকা তাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাবে। নিজেও সে কম খুসী হয় নি। বেণী সিং খাবার নিয়ে আসে। অলোক বলে কাল সকালে সমস্ত কুলীদের লাগিয়ে ঘর দোর সাফ্ করতে হবে—ডাক্তার বাবু আসছেন।

বেণী সিং আনন্দ প্রকাশ করে বলে—‘যাক ভগবানের দয়ায় এতদিনে ভদ্র আদমীর মুখ দেখা যাবে।’ কেবল কুলী কামিনদের আর তার ভাল লাগেনা।

অনেক রাত পর্য্যন্ত অলোকের ঘুম আসে না। সত্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তো ছিল না। এ সমস্ত সেই- অদৃশ্য শক্তির কারসাজী, না হলে ডাক্তার রায় মুরলীগঞ্জের দিকে বদলি হতেও পারতেন তো ? অলোক ঘুমিয়ে পড়লো।

৫১

শুষ্ক পাংশুমুখে ঘর্ম্মাক্ত বিভূতি সিংহ বাসায় ফিরলেন। শান্তি-দেবীর চোখ ছুটো—রক্তজবার মত লাল। স্বামীর মুখের পানে চেয়ে তাঁর ছ'চোখ বেয়ে নামলো জলধারা। বিভূতি বাবু সিগারেট ধরিয়ে বার কয়েক টান দিয়ে ফেলে দিলেন,—‘যাই কতক গুলো

টেলিগ্রাম করে আসি'। শান্তিদেবী ভাঙ্গা গলায় নিষেধ করলেন—'না থাক, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কি লাভ? এই চিঠিখানা পড়ে দেখ।'

পাঠশেষে চসমা খুলে বিভূতি বাবু ভাবতে লাগলেন—অনিমেষ অমন সুন্দর সুপুরুষ তবু সে মানুষ নয় এর অর্থ কি? আবার চসমা পরে গীতার চিঠিখানার শেষ দিকে তিনি চোখ বুলোলেন—"কেবল শাসন আর সন্দেহে মানুষ বাঁচতে পারে না তাই...।" একেবারে শেষে গীতা লিখেছে—"মনে করো গীতা মরে গেছে—।" সত্যিই গীতা আজ মৃত, তাঁর আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যা গীতা মৃত বৈকি!

বিভূতি বাবুর মনে ওঠে চিন্তার তরঙ্গ—একটার পর একটা। কাল সমস্ত দিন ধরে গীতা কত সব রান্না করেছে,—জিনিষ পত্র সমস্ত নিজের টাকায় আনিয়েছিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কত যত্ন করে পা টিপে দিয়েছে—। তখন সন্দেহ করা উচিৎ ছিল, হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন কেন? মনে পড়ে কাল রাত্রে গীতা তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে প্রণাম করেছিল, হয়তো হতভাগী সেই সময় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

কলকাতা থেকে এসে সব সময় মুখ ভার করে থাকতো—তিনি মনে করতেন অন্য কিছু। সমস্ত কিছু ঐ পাজী নচ্ছার দিলীপেরই পরামর্শের ফল, সেই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল। মা বাপ মরা ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে কত চেষ্টাই না তিনি করেছেন। হতভাগা শেষে তাঁর মুখে কালী দিয়ে 'সিনেমা কোম্পানীতে' ঢুকে পড়লো।

অনিমেষ দু'একদিনের মধ্যে আসবে লিখেছে কি করবেন তিনি? খুব কড়া কড়া কথা তাকে শোনাতে হবে,—একশো-বার শোনাতে হবে, তাঁর বংশের এই এত বড় কলঙ্কের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী তো সেই।

—স্ত্রীর উপরও ক্রোধের মাত্রা কিছু মাত্র কম নয় বিভূতি বাবুর। তিনি পুরুষ মানুষ কতক্ষণ আর গৃহে থাকেন, গিন্নির এসব বোঝা উচিৎ ছিল। দিলীপের সুখ্যাতিতে তো পঞ্চমুখ এখন হোল তো? আর কি করেই বা বুঝবেন তিনি,—পাষণ্ড অসুখের সময় তো—পরিশ্রম আর রাত্রি জাগরণের কিছু কসুর করেনি, সব কিছুর মূলে ছিল এই অভিসন্ধি—? পাজী 'রাস্কেল' কোথাকার।

চোখে পড়লো—কার্পেটের উপর আঁকা গোপাল মূর্ত্তির নীচে লেখা দুটি অক্ষর—'গীতা'। বিভূতিবাবু ছবিটাকে নামিয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললেন। গীতার কোন স্মৃতি তিনি রাখবেন না। চেয়ে দেখেন, কেউ যেন ষড়যন্ত্র করে গীতার স্মৃতিচিহ্ন গুলি সাজিয়ে রেখেছে। —আলনায় জামা কাপড়, আলমারীতে স্তরে স্তরে সাজানো খেলনা—, চারদিকের দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের ফটো! ধীরে ধীরে বিভূতিবাবু গীতার শয্যায় বসে বালিসটা বুকের কাছে টেনে নিলেন।

দৃঢ়চেতা রাশভারী সিংহ মশাইয়ের চোখ সজল হয়ে উঠলো। গীতা ব্যবহার করতো মৃদু গন্ধযুক্ত একটা দামী তেল। ছেলে বয়সে মাথার চুল তার খুব পাতলা ছিল, তাই ডজন দরে এই তেল তিনি কিনতেন। বালিসের গন্ধে বিভূতিবাবু যেন তাঁর গৃহত্যাগিনী কন্যাকে কাছে পেলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—আপন মনে বলে উঠলেন— 'যেখানেই থাক—বেঁচে থাক তুই। কিছুক্ষণ আগে বিভূতিবাবু

বলেছিলেন—'অমন মেয়ের মৃত্যু হলেও আমি খুসী হতাম'। হঠাৎ তাঁর কানে এলো একটা করুণ আর্ত্তনাদ—

শান্তি দেবী কাঁদছেন,—কিন্তু জোরে কাঁদবার সাহস নেই ক্ষমতাও নেই।—চারিদিকে রয়েছে অসংখ্য রেল বাবুদের বাসা,- সকালে তারা এসে—কতকথা জিজ্ঞেস করছিল। কান্নার শব্দে আবার হয়তো ভীড় জমবে।—স্বামীকেও শান্তি দেবী খুব ভয় করে চলছেন। তিনি বলেছেন—'মায়ের আদরেই মেয়েটা অমন হোল।' মনে মনে ভাবেন, কত সন্তান শোক তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এমন তো কোনদিন হয়নি। তারা মর্ত্ত লোক থেকে চলে গেছে,—কিন্তু গীতা—গীতা! সহস্র চেষ্টা সাবধানতা সত্ত্বেও মায়ের বুক থেকে শোকের একটা তীব্র কম্পন নাক মুখ চোখ দিয়ে—অকস্মাৎ বেরিয়ে যায়। চেষ্টার বিরাম নেই তবুও রোধ করা যায় না—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে চাপা ফোঁপানীর শব্দ।

'সব ভেঙ্গে চুরে দাও, কেবল এটি নিওনা'। বিভূতি বাবু চেয়ে দেখেন গীতার খুব ছোট বেলার একখানা ফটো।—ক্ষুদ্র বালিকার মুখখানা হাসিতে ভরা। ফটোখানি স্ত্রীকে ফেরৎ দিয়ে বিভূতি বাবু বসে পড়লেন, কথা বলার শক্তি ও যেন নেই। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। বিভূতি বাবু বললেন - 'চল আজই আমরা এখান থেকে চলে যাই'। 'হ্যাঁ—সেই ভালো'। দরজায় করাঘাতের সঙ্গে ছোট্ট একটি ডাকে শান্তি দেবী চমকে উঠলেন। বিভূতি সিংহ দরজা খুলে দেখেন, বুলুর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সুনির্ম্মল রায়। বুলুর মাসীমা শব্দটা শান্তি দেবীর কানে মায়ের মত বেজেছিল. হায়রে মায়ের মন। একদিনেই গীতা-বুলু-শ্যামলীর বিয়ে হয়েছিল, বুলুকে দেখে শান্তি দেবীর সমস্ত সংযমের বাঁধ-ভেঙ্গে পড়লো।

অনেকক্ষণ কান্নার পর-শান্তি দেবীর বুকের ব্যথা যেন অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। যদিও এ তুষের আগুন জীবনে নিভবার নয়, তবুও বিরাম ক্ষণিকের। ভগবান সব চেয়ে কৌশলী কি না, তাই চমৎকার ব্যবস্থা তাঁর,—কলা-কৌশলে ভরা।—বুলুর সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হয়ে যায়—সন্ত রোগ থেকে উঠেছেন, বেলা শেষ হয়ে এলো, অথচ সকাল থেকে এক বিন্দু জল গলায় যায়নি।

পাশের ঘরে বিভূতি বাবু করজোড়ে—বলছেন—'পরে যা হবার হবে এখন আমাকে ছেড়ে দিন, এখানকার বাতাস আমার বিষিয়ে উঠেছে।—দিনতো শেষ হয়েই এসেছে যে কটা দিন থাকা, মুখ লুকিয়েই কাটিয়ে দেবো"।

৫২

অনেকরাত্রে—বনমাংকি থেকে অলোক ফিরছে বারহারা কোঠিতে। অন্য সময় অন্ধকারের মধ্যে 'সাইকেল' চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতোনা। আজোও মনে করেছিল শিলদাসের মেসেই রাত্রি টুকু কাটিয়ে দেবে,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রওনা দিতেই হোল। মনকে প্রবোধ দেয়—'এই টুকু তো পথ'।—পথ কিন্তু বেশ, অন্ততঃ পাঁচ মাইলের কমতো নয়ই। নির্জ্জন পথে একাকী অলোক সাইকেল চালিয়ে যায়, মাঝে মাঝে কুলী ছাউনীর আশে পাশে আলো জ্বলছে, কথাবার্ত্তাও শোনা যায়, তারপর দ্বিগুণ অন্ধকার। ক্লান্ত শরীরকে অগ্রাহ্য করে-অলোক সাইকেল চালায়,—আজকেই ফিরবে বলে সে কথা দিয়ে এসেছে যে। বারহারা কোঠীর বড় গদির কাছ বরাবর এসে দ্বি চক্রযানের পিছনকার 'টিউবটা'—স-শব্দে বিদীর্ণ হয়ে

গেল, অলোক ঘড়িতে দেখে—প্রায় বারোটা। নাঃ এত রাত্রে কেউ আর জেগে নেই, সমস্ত উৎসাহ যেন উবে গেল। কষ্ট করে এতটা পথ না এলেই হোত। বাসার সামনে এসে অলোক অবাক হয়ে যায়—তার ঘরে আলো জ্বাললে কে? চাবিই বা পেল কি করে? দরজায় তালা ঝুলছে,—পকেটে হাত দিয়ে দেখে চাবির রিংটা নেই। অলোক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, দরজায় তালা দিয়ে চাবি লাগিয়ে যাওয়া তার নূতন ভুল নয়—একবার বেশ মোটা রকম খেসারৎ দিতে হয়েছে—তবুও। না অত তাড়াতাড়ি করলে কি কিছু মনে থাকে।—ডাক্তার কোয়ার্টারেতো আলো জ্বলছে, কথাবার্ত্তাও চলছে—যাবে নাকি সে।—দূর এতরাত্রে যাওয়া ঠিক নয়।—কি দরকার? বেণীকে দিয়ে কোন রকমে খুললেই চলবে। বেণী বাসায় নেই,—অলোক বেশ চটে ওঠে—চৌকিদারের সব সময়—হাজির থাকা উচিৎ। কি করা যায় এখন? ডাক্তার কোয়ার্টার থেকে, কে আবার লণ্ঠন নিয়ে আসছে।—অলোক সাইকেল নিয়ে আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।—নাঃ কালীর সঙ্গে দেখা করলেই সব মিটে যেতো।—দূর, 'পি. ডাবলু. আই' এর মিস্ত্রীকে ডেকে দরোজার কড়াটা কেটে ফেলাই—ভালো।

ঘরে—প্রবেশ করে—অলোক বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকে, তাজ্জব ব্যাপার! সেও কি আবুহোসেন হোল নাকি? টেবিল চেয়ার, বেশ বড় রকম একটা আলনা, আবার বই ভর্ত্তি আলমারী। টেবিল ল্যাম্পটাও তো তার নয়, বেশ জটিল ব্যাপারতো। বিছানায় চোখ পড়তে বিস্ময় ওঠে চরমে। তার 'ক্যাম্পকট' যাদু মন্ত্রে একেবারে খাটে পরিণত! বাঃ চাদর বালিস সবাই ভোল পাল্টে ফেলেছে যে।—বালি-সের ঢাকাটা সে চিনতে পারে, অলোকা কদিন ধরে এতে ফুল তুলছিল।

অলোক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কোয়ার্টারের দিকে চেয়ে থাকে। নাঃ এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়, দেখতে পেলেই কেউ না। কেউ ছুটে আসবে, কি দরকার এত রাত্রে।

শয্যাগ্রহণের পর সে বুঝতে পারে উদর-দেবতা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। দোষই বা কি, সন্ধ্যায় জলযোগের নামে রীতিমত ভোজন পর্ব্ব সমাধা করলেও—এতটা পথের পরিশ্রম ত কম নয়! খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়লো অলোক। কাল নিশ্চয়ই তাকে বেশ খানিকটা পরিহাস সহ্য করতে হবে, বসুদেব বাবু ছেড়েদেবার পাত্র নন। নিশ্চয়ই বলবেন 'জেনে শুনেই চাবি রেখে গিয়েছি, না হয় আমি একটা পাগল'। আচ্ছা চাবিটা এদের হাতে না পড়ে অন্য লোকের চোখে পড়লেই বেশ রগড় হোত আর কি। আলোটা নিভিয়ে ফেলাই উচিত. অলোক অন্ধকারে শুয়ে থাকে। যে যাই বলুক সুরুচি দেবী কিন্তু তার পক্ষই নেবেন, কিন্তু অলোকা কি বলবে? হঠাৎ অলোক উঠে বসলো। নিশ্চয়ই কেউ ট্রাঙ্ক খুলেছে, না হলে চাদর পেল কোথায়? সর্ব্বনাশ! ইস্ একেবারে যাকে বলে হাতে নাতে ধরা পড়া। কবিতার খাতাখানা ঠিক উপরেই ছিল। অলোক একটা সিগারেট ধরালো, বসুদেববাবু দেখতে পেলে বুকনিতে বুকনিতে তাকে অস্থির করে তুলবেন। কার উদ্দেশ্যে লেখা সেটা কি বুঝতে বাকী থাকবে! রামঃ বসুদেব রায় ভীষণ চালাক লোক যে? কাল প্রথমেই অলোকার কাছে জিজ্ঞেস করা চাই।

দরজার সামনে সামান্য একটুখানি শব্দে অলোক সচকিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেন জুতার শব্দ, দরজায় নিশ্চয়ই কেউ হাত দিয়েছে। অলোক নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে আহ্বানের—নাঃ কেউ নেই। মুস্কিল

বাধালো একটা হতভাগা হাঁচি। হাঁচির পরক্ষণে বাইরে থেকে একজন বলে,—

শূন্য ঘরে হাঁচি এলো কি করে ?—

পরক্ষণে আর একটা হাঁচি—। বসুদেব রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'হে হাঁচি—দুয়ার খোল,—খোল দ্বার হে হাঁচি প্রভু'। অন্য একজন খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে—। অলোক ঘেমে উঠলো, দু'বার 'হে' শব্দ প্রয়োগ, তার মানে—? নিশ্চয়ই বসুদেববাবু তার খাতা খানা পড়ে ফেলেছেন-কেলেঙ্কারী !

দরজায় ঘন ঘন আঘাতের পর ডাক্তার রায় বলে উঠলেন—'মন্দিরে কে আছ দ্বার খোল,—ভয় নেই আমি চিকিৎসা—ব্যবসায়ী—, প্রেম-বিরহ মান-অভিমান সর্ব্বরোগ পারদর্শী,—নাড়ী বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বে এনেছি"। অলোক তবুও সাড়া দেয়না। সে ভাবে ঘুম থেকে ওঠার ভাণ করা চলতো কিন্তু হাঁচিই তাকে পথে বসিয়ে দিলে যে—। বাইরে ডাক্তার চীৎকার করে ওঠেন—, "সেই গান খানি গাওতো 'এখনো নিভেনি হোমের আগুন', অবশ্য একটু বদলে নাও অর্থাৎ কালোপযোগী করে নাও। আজকাল পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সংযোজন সবই চলে, অর্থাৎ অতীতের পটভূমিকায় বর্ত্তমান'। আচ্ছা আমিই গাইছি—এখনো নিভেনি কাঠির আগুণ আসিছে তাহারি গন্ধ—। অলোক তবুও নিরুত্তর—। এবার 'সত্যিই দরজা ভেঙ্গে ফেলবো—কিন্তু, পেটে ভীষণ জ্বালা, রসনালোলুপকর খাদ্য গন্ধে জিহ্বা জলময়, কিন্তু ওদিকে বিপদ, 'আহা ভদ্রলোক না ফিরলে খাবে কি করে,—হায়রে প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধি, মধ্যে থেকে আমি বেচারী অনাহারে মৃতপ্রায়, হে' মহাত্মন, এ ইতরের প্রতি কৃপা করুন'। 'বসুদেব বাবু নাকি' ? 'যাক বাবা

এতক্ষণে ধ্যান ভঙ্গ হোল—তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন স্বয়ং দেবী—।'

ডাক্তারের কথা শেষ হয়না, অলোকা চাপা গলায় কি বলে হেসে ওঠে—। কক্ষে প্রবেশ করে বসুদেববাবু বলেন, 'বেশতো চুপ চাপ এসেই শুয়ে পড়েছেন, আর আমি পেট হাতে করে পথ চেয়ে আছি'। অলোক জবাব দেয় 'আবু হাসান হোয়ে কি মাথার ঠিক ছিল, একটু অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম'। 'আর ভেবে কাজ নেই চলুন চলুন'। অলোকা লণ্ঠন নিয়ে পথে নেমে পড়েছে—বসুদেব রায় চীৎকার করে উঠলেন—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকাল,—অয়ি—লণ্ঠন ধারিণী—শ্যালিকা সুন্দরী মম।"

৫৩
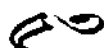
বনমাংকির ঠিকাদারের দল বেশ দোটানায় পড়েছে। এতদিন কনস্ট্রাকসনের বাবুদের কিছু দিলেই চলতো, এখন আবার ট্রাফিকের সদাশয় ব্যক্তিদের পকেটে কিছু দেওয়া চাই। বনমাংকি পর্য্যন্ত কনস্ট্রাকসনের বাইরে, কাজেই জিনিষপত্র আনা নেওয়ায় তাদেরই হাত। সেদিন গুডস্‌ক্লার্ক জগন্নাথের সঙ্গে বেশ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল—ওভারসিয়ার কুমুদ ঘোষের। গুডস্‌ক্লার্ক কথায় কথায় বলে ওঠেন—'টি, এম'কে রিপোর্ট না করলে আর চলবেনা দেখছি। কুমুদ ঘোষ জবাব দিলেন 'হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই দেবেন মশাই,—'ট্রাফিক ম্যানেজার আপনার হবু জামাই কিনা ?' 'কি এত বড় সাহস,—আমার 'ফ্যামিলী' সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলার কে বট হে তুমি.........।

কুমুদ ঘোষের চটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। একটার বদলে দুটো চৌ-বাচ্চা, তুলসী-মঞ্চ হাঁস মুরগীর ঘর এত সব করার পরও শাসানো,

কে সহ্য করতে পারে? জগন্নাথের আঁতে ঘা-লাগাও বিচিত্র নয়, রেণু-বেণু-চিণু তিনটি বিবাহ যোগ্যা সুন্দরী কন্যার জনক তিনি—যারা বনমাংকির অন্ধকার প্রায় রেলকলোনীকে আলোকিত করে তুলেছে রূপের প্রভায়। তিন বোনই বেশ স-প্রতিভ, লজ্জার বালাই বলে কিছু নেই। চিণুতো মেমের মত সাইকেল চড়ে বেড়ায়। জগন্নাথ বলেন—মেয়েরা আমার ছেলেরও অধিক। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, তিন বোনে নিঃসঙ্কোচে যার কাছে যখন যা চায়, না নিয়ে শূন্য হাতে ফেরেনা ষ্টেসন মাষ্টার রামরঞ্জন মধ্যস্থতা না করলে ঝগড়াটা বেশ জমে উঠতো বোধ হয়।

মেয়ে মহলেও ট্রাফিক বনাম কনষ্ট্রাকসনের—কলহ কম নয়। 'এ. পি, ডাবলু, আই, কর্ম্মকার গৃহিণী মুখ না বেঁকিয়ে কথাই বলেন না—"ম্যাগো এমন কাজের মাথায় ঝাঁটা, ছুটি নেই ছাটা নেই বনবাদাড় পাহাড়-নালা সাফ করতে করতে দিন যায়! মরি কাজের কি ছিরি? আমার উনি বলেন, হাজার টাকা মাইনে পেলেও কাঁচা কাজে যাবো না। সকালে ট্রলীতে করে একটু হাওয়া খেয়ে এসে, দিব্যি অফিসে বসা, তা রেষ্টোই বল—আর অফিসের কাজই বল?' দেবেন ফিটারের বউ জবাব দিলেন—"কাঁচা থেকেই তো পাকা হয়, পাকাতো আর অমনি হয় না?" কর্ম্মকার গিন্নি নাক মুখ বেঁকিয়ে বললেন—'মিস্ত্রী মজুরের আবার পাকা পাকি কি"? দেবেনের স্ত্রী দ্বিগুণ ঝাঁজে বললো—'কাঁচা কাজই আমার ভালো, পাকা হোলেতো কামার সাহেবের মত দেড়শো টাকায় পচতে হবে'? কর্ম্মকার গিন্নীর মুখখানা রাগের আধিক্যে বেশ থম্‌ থমে হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—"তা তোমার বিধবা মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে দিলে, তার জাতটাত

আছে তো' ? সুহাষিণী-বৈষ্ণবী কথাটার মর্ম্ম বুঝে উত্তর দিলেন—'জাত হারিয়েই তো লোকে বৈষ্ণব হয় দিদি, তা জামাই কুলিন কায়েত, কামার কুমোর নব-শাখ নয়।' অগত্যা কর্ম্মকার গৃহিণীকে নিরস্ত হতে হয়, বৈষ্ণবী দারুণ মুখরা বেশী কিছু বলতে গেলেই অপমানের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলবে।

'এ, এস, এম' জটাধর নিয়োগীর স্ত্রী বগলা সুন্দরীর নাম করণ হয়েছে—জটায়ু সুন্দরী, জটায়ুকে পারতপক্ষে সকলে এড়িয়ে চলে, যেমন নোংরা তেমনি তার তুখোড় ভাষা। দেখা হলেই মাতা-পিতৃহীন বোনপো বোনঝির আদ্য শ্রাদ্ধ—সেই সঙ্গে নিজের শারীরিক অসুস্থতার লম্বা ফিরিস্তি কিছুতেই শেষ হতে চায় না। দশ বৎসরের 'বাদল' আর বারো বৎসরের 'আভাকে' নিয়ে আলোচনা, মহিলা মজলিসের নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে—।

জটায়ু সেদিন আভাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে মেরেছে, যাতে অহঙ্কারী কর্ম্মকার গৃহিনীকে পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করতে হয়েছে।—বেচারী আভা, কতদিক দিয়ে দুরন্ত ভাইকে সামলাবে? হাজার বকুনি প্রহার-সত্ত্বেও তার স্বভাব একটুও বদলায় না। মস্তবড় রুই মাছটা, বাদলাই দু'হাতে বুকে জাপ্‌টে বয়ে এনেছিল। আহারের সময় থালায় মস্ত বড় কানকো খানা দেখে সে লাফিয়ে উঠলো।—দিদি যত বোঝায়, ধমকায়-মিনতি করে, তবুও অবোধ বোঝে না। বাধ্য হয়ে আভাকে দিতে হোল একখানা মাছের টুক্‌রো বাদলের পাতে। বাদলের চীৎকারে—জটায়ু আগেই সচেতন হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ সাড়া শব্দ না পেয়ে একেবারে রান্না ঘরে এসে হাজির। "ওমা! ও-বেলার জন্যে তুলে রাখা অতবড় মাছ খানা চুরনী ছুঁড়ি সোহাগ করে ভাইকে দিয়েছে।" চুলের মুঠি

ধরে সে কি নির্দ্দয় প্রহার ;—লাথি, গলাধাক্কা—চড় কিল কিছুই আর বাদ গেল না। ধাক্কার চোট সামলাতে না পেরে, পড়ে গিয়ে,—জিভ থুত্‌নি কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল—তবুও জটায়ুর রোষ যায় না। জটায়ু নন্দন-নন্দিনী ফটর মটর নোটন ফোটন চারজনে চতুরঙ্গ দলে আক্রমণ চালিয়েছে এক সঙ্গে—আভার কান্নায় অনেকে এসে জুটলো, শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মকার গিন্নী প্রতিবাদ না করে পারলেন না।

গণ্ডগোল থামলে দেখা গেল, থালা ভর্ত্তি ভাত মাছের টুকরো পড়ে আছে, বাদল নেই।—জটায়ু ঝঙ্কার দেয়—"যাবে আবার কোন চুলোয়, এখুনি আসবে হারাম জাদা। সোহাগ দেখাতে যারা ছুটে ছুটে আসে, তারা জোগাতে পারেনা কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত ? এবার কেউ এলে দেবো মুখে নুড়ো জ্বেলে।"—আভার সেদিন খাওয়া হোল না, কোথায় গেল বাদল মুখের ভাত ফেলে। জটায়ু আহারাদির পর শয্যায় দেহ এলিয়ে নাক ডাকালেন, নোটন ফোটন মটর ফটর আড্ডা দিতে গেল। আভা দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে—কোথায় গেল বাদল ?

রাত্রেও বাদল ফিরলোনা, জটাধর 'নাইট ডিউটি'তে চলে গেলেন। জটায়ুর আদেশে আভাকে হেঁসেল তুলতে হোল। "হাঁড়ি আগলে বসতে হবেনা, সকাল সকাল শুয়ে ভোরে উঠবি, বেলা করে ওঠার জন্যেই তো লক্ষ্মী ছাড়তে বসেছেন।" আভা যখন শয্যাত্যাগ করে তখন অন্য সকলে—এ পাশ ও পাশ ফিরে, ঘুমের শেষ আমোদ ভোগ করে।—জটায়ু আর নন্দন নন্দিনীরা যারা তের থেকে—উনিশের মধ্যে থাকলেও দুধের বাছা, তাদের আবার 'বেড্-টি' না হলে ক্লান্তি যায় না। বারো বৎসরের মেয়ে—উদয় থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত খেটে সংসার চালায়,—ঝি-রাঁধুনী একাধারে সে সবই—তবু নির্য্যাতন অনাহার তার ভাগ্যলিপি—।

বেচারী আভা মুখের যন্ত্রনায় দিনের বেলায় খেতে পারেনি, রাত্রে অবস্থা আরও শোচনীয়,—তবু খেতে বসার অভিনয় করতে হয়।—বাটীতে করে ভাত নিয়ে শোবার জায়গায় লুকিয়ে রাখলো। রাত্রে নিশ্চয়ই বাদল ফিরবে? তখন যদি খেতে চায় কি দেবে সে?—অবস্থা বিপর্য্যয়ে আর পারিপার্শ্বিকতায় আভা-অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে—বহুগুণে বুদ্ধিমতী হয়ে উঠেছে,—না হয়ে উপায় নেই, বাঁচতে হবে তো।

বাড়ীশুদ্ধ লোক ঘুমে অচেতন, আভার ঘুম আসেনা, অন্ধকারের মধ্যে—নীরবে মশক দংশন সহ্য করে—আর-উৎকর্ণ ভাবে অপেক্ষা করে একটি ডাকের। মশারীটা ছিঁড়ে গিয়েছে. মেসোমশাই একটা নূতন কিনে এনেছিলেন—জটায়ু সেটা তুলে রেখেছে।—"নোতুন দিলে তুদিনেই ফর্দ্দা ফাঁই।" চাল ডাল রাখা জল চৌকিটার পাশে একটা শব্দ হতেই আভার বুকটা কেঁপে ওঠে। - হরিশ্চন্দ্রপুরে—সেবার তার ঘরে চোর ঢুকেছিল। "দিদি!" আভা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলে—"কখন এলি?"—"সেই যখন খাচ্ছিলি।" "খাবি তো?" "কোথায় পাবোরে এখন হেঁসেলে গেলে কি তোকে আস্ত রাখবে?"

"এখানে এনে রেখেছি, খেয়ে নে আগে"। বাদল হাসতে হাসতে বলে "আজ পেট ভর্ত্তি বুঝলি? তোর জন্যেও এনেছি ভাই। এই দেখ লুচি তরকারী আলু ভাজা কত আছে"। আভা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—"চুরি করেছিস্"? "দূর বোকা চুরি করবো কোথায়; এ৷ ৯ গাছে ফলে নাকি"? "তবে"? "পেয়েছি"। "কোথায়"? "রায় সাহেবের বাসায়"। "ছিঃ শেষে ভিক্ষে চাইলি"? বাদল প্রতিবাদ করে—"দূর তা কেন? চাইবো কেন, রায় সাহেবের বৌ দিলেন। জানিস দিদি খুব ভাল লোক বুঝলি, আর দেখতেও খুব

ভালো"। আভা বুঝতে পারেনা হঠাৎ রায় সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে বাদলের আলাপ জমলো কি করে। বাদল লুচি-তরকারীর রুমাল খানা খুলে বলে—"খানা, তোর জন্তেই তো দিলেন"। আভা মুখে খাবার দিয়েই যন্ত্রণা কাতর শব্দ করে ফেলে। "কি হল রে"? "খুব জ্বলছে, জিভ কেটে গেছে কিনা"? "ঐ রাক্ষুসী মেরেছে বুঝি"? "ছিঃ মাসীকে ও-কথা বলতে নেই"। "না—বলবো না, একশোবার বলবো"।

বাদল একে একে তার আলাপের কাহিনীটুকু বলে যায়। "জানিস্ ভাই, ছোট্ট গাছে পেয়ারা একেবারে ভর্ত্তি। চুপ করে ঢুকে দুটো ছিঁড়েছি,—অমনি বেটা চৌকিদার না মালী চেঁচিয়ে উঠলো, দিলাম ছুট—কিন্তু ধরে ফেললে। কাণ ধরতেই এইসা এক কামড় দিলাম—বাছাধন ছেড়ে দিতে পথ পায় না। বুঝলি আবার তাড়া করলো, ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে,—না হলেই ঠিক বেটা ঠ্যাঙ্গাতো"। "কি হোল তারপর"? "কি আবার হবে! আমাকে রায় সাহেবের বৌ বললে—ছিঃ চুরি করতে গেলে কেন? বললাম সব"। "কি বললি"? "কি আবার, খিদে লেগেছে তাই"।— "তার পর?" "তারপর আবার কি"? বাদল একটু থেমে বলে "জানিস দিদি,—যেমন শুনেছে—তোকে মারছে দেখে উঠে পালিয়েছি, খাওয়া হয়নি অমনি কি রকম করে উঠলো—। আমাকে বসতে বলে খাবার এনে খেতে দিলে। আমি খেতে চাইনা, কিন্তু রায় সাহেবের বৌ ছাড়েনা। সকাল হলেই আবার যাবো"। "না আর যাস্নি"! "না যাবেনা, সব কথা বলে দিয়েছি, দেখিস না মাসী কেমন জব্দ হয়"। "ছিঃ পরের কাছে নিজেদের কথা বলতে নেই"। 'তুই কিছু জানিস না, রায় সাহেবের বৌতো পর নয়? আমাকে বললে ওযে আমাদের কাকীমা"।

*　　*　　*　　*

অনেক রাত্রে বুলু বলে—একটা জিনিষ দেবে? সুনির্ম্মল রায় অবাক হয়ে যান। প্রত্যেক বার কলকাতা যাবার সময় কত করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—"কি চাই কি দরকার?" সব সময় বুলুর এক উত্তর—"কিছুনা"। সেই বুলু আজ নিজের মুখে প্রার্থনা জানাচ্ছে, বিস্ময় বৈ কি? "কি বল"?—"হয়তো শক্ত জিনিষ, কিন্তু চেষ্টা করলে পেতে পারো"—। বুলু বলে যায় আভা বাদলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—। "দেখছ তো, কত বড় প্রফেসারের ছেলে মেয়ের কি অবস্থা—। ওদের আমরা মানুষ করে তুলবো— বল, দু'জনকে নিয়ে আসবে"? "জটাধর বাবুকে রাজী করতে চেষ্টা করবো, কিন্তু জোর তো কিছু নেই"।

৫৪

বিরাজ গার্ডের কথার রেশ তখনও যেন অলোকের কানে বাজে—সমস্ত দিনটাই তার মাটি করে দিয়েছে সামান্য একটা কথায়। "নাঃ—বিরাজের সঙ্গে সে আর বেশী মিশবে না। যেমন চেহারা—ছুঁচলো—মুখো ছুঁচোর মত, স্বভাবটাও ঠিক তাই, কুৎসা রটানো আর পরচর্চ্চা যেন তার ধর্ম্ম। হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আত্মীয়তা থাকলে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করে না কেন? সব মিথ্যা—সব বাজে।" বহুবার অলোক মন দৃঢ় করে সব কিছুকে অস্বীকার করতে চায় কিন্তু এক জায়গায় কি যেন একটা কাঁটার মত বিঁধে থাকে। সকাল সকাল আজ তাকে বারহারা কোঠিতে ফিরতে হবে।

"কি হে ফিরছ নাকি ?" শিলদাসের প্রশ্নে অলোক চমকে ওঠে—সে মনের সঙ্গে বোঝা পড়ায় মেতে উঠেছিল। শিলদাস বলে "খুব ভাবুক হয়ে পড়েছ যে—তা প্রথম প্রথম এমনি হয়।" অলোক জবাব দেয় না— মুখের থম্‌থমে ভাব দেখে শিলদাস সরে পড়ে। বসুদেব বাবুর উপর অলোক চটে ওঠে—"ভদ্রলোকের সাংসারিক জ্ঞান কিছুমাত্র নেই, সবাইকে নিজের মত সরল মনে করে— নিশ্চয়ই কোনদিন ঠকে যাবেন, হ্যাঁ—ঠকাই ভালো ওসব লোকের—অত ভালো হওয়ার কোন মানে হয় না।" বসুদেব বাবু কথাটা ছড়িয়ে না দিলে এত লোক জানাজানি হোত না কখনও। তার নিজেরও খানিকটা বোকামী আছে—লজ্জা না করে বসুদেববাবুকে সাবধান করা উচিত ছিল। আবার মনে হয়—"নাঃ মন্দ কি ?" সেদিন কুমুদ ঘোষের স্ত্রী যখন তাকে অলোকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন—তখন তো বেশ ভালই লাগছিল। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী চালাক—নাহলে সামান্য একখানা রুমাল নিয়ে কি—পুরুষ মানুষে অমন উকিলের জেরা করতে পারে। "অলোকাই সব চেয়ে বেশী দোষী। প্রত্যেক রুমালে রকম রকম ফুল তোলা তার চাই-ই। কিছু বললে বুঝতে চায় না—মুখে নামে আষাঢ়ের ঘন মেঘ।" অলোক বুঝে উঠতে পারে না, কি করে সে বসুদেব রায় আর অলোকাকে সাবধান করে দেবে।

ইঞ্জিনখানা হুইসেল দিতেই অলোক উঠে পড়লো, ব্যালাষ্ট ট্রেণের অনেক আগেই পৌঁছান যাবে। সর্ব্বনাশ! টমসন্‌ কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার কিরণ ব্যানার্জ্জি ব্রেকভ্যানে যে—! "কি ভায়া—সব ভালো তো ? তা কবে খাওয়াচ্ছ ?" অলোক মনে মনে বেশ বিরক্ত হোল, এদের কি ঐ এক কথা ভিন্ন অন্য কিছু বলবার নেই ? প্রকাশ্যে

বলে—"সময় হলেই পাবেন।" কিরণবাবু বললেন—"হাজার হাজার লোকের মাঝে তুমিই হচ্ছ ভাগ্যবান জানো তো ?" অলোক চুপ করে থাকে, কিছু বললেই কিরণবাবু বক্তৃতা স্বরু করবেন। "চুপ করে কেন হে ? অভিমানের পালা চলেছে বুঝি ?" অলোক নীরব। কিরণ বাবু প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল বের করে বললেন—"দেখছ ? আমার প্রেম এর সঙ্গে"। কিছুক্ষণ কেটে যায়—কিরণ বাবু পাত্র নিঃশেষ করে সিগারেট ধরালেন। অলোক ভাবে যাক বাঁচা গেল,—বার-হারাকোঠী আর বেশী দূর নয়। হঠাৎ কিরণ বাবু অলোকের একখানা হাত খপ করে চেপে ধরলেন। অলোক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে—। "একটা কথা—একটা কথা তোমায় রাখতে হবে, অলোক ভয়ে ভয়ে বলে-"বলুন" !—"দেখ ভাই কখনও মদ ছোবেনা কেমন—"? অলোক স্বীকার করলো। "ভাবছ মাতালের মাতলামী না ? কিন্তু আমি মোটেই মাতাল নই ; নিজে মদ খাই—কিন্তু দুনিয়া শুদ্ধ লোককে এটা ছুঁতে নিষেধ করি, বড় পাজী জিনিষ—একবার ধরলে আর রেহাই নেই,—একেবারে মনুমেণ্টের ওপর থেকে নামিয়ে দেবে—অন্ধকার গর্ত্তে—মানে যাকে বলে রসাতলে"। ইঞ্জিনের গতি কমে আসে,—বারহারাকোঠির সিগন্যাল পার হয়ে গেল। 'আমি প্রাণ খুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি অলোক, তুমি সুখী হবে।" অলোক প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে পড়লো—।

আশ্চর্য্য। বিরাজ ঢেলে দিয়েছে তীব্র বিষ, কিরণবাবু দিয়ে গেলেন আশীর্ব্বাদ। দুনিয়াতে কত রকমের মানুষ আছে—। জানলা থেকে অলোক দেখে—অলোকা তার শয্যা অধিকার করে পরম নিশ্চিন্তে বই পড়ছে।— বিস্মিত হয়ে অলোকা বলে—"আজ এখন

যে" ? — কাজ হয়ে গেল তাই চলে এলাম"। "দেখ কেমন সব গুছিয়েছি" ? অলোক চারিদিকে চেয়ে দেখলো কিন্তু মুখে কিছু বললো না। অলোকা ব্যথিত কণ্ঠে বলে— "পছন্দ হল না বুঝি" ? "কেন" ? —"কই কিছুইতো বললে না"। অলোক হেসে ফেলে— "না বললেই বুঝি নিন্দে হয়"। —'তা নয়তো কি ? আচ্ছা যেমন ছিল তেমনি করে দিচ্ছি—, পাপোষ খানা খাটের তলায়, চাদরের অর্দ্ধেক মেঝেতে ঝোলানো—টেবিলে এক রাশ ধুলো— জামা-কাপড়-গেলাস-বাটী-কাপ-গামছা, স্যুটকেশটার ওপর জলের কুঁজো,—দেব তেমনি করে" ? —"বেশ মিথ্যেবাদী হয়েছ তো—?"—"মিথ্যেবাদী—?" "তা নয়তো—কি, অমন করে আমি রাখি নাকি" ? "দিদিকে সব দেখিয়েছি জিজ্ঞেস করো, এই তো সেদিন গুছিয়ে দিলাম এর মধ্যে সব ওলোট পালোট হোল কি করে বল তো" ? অলোক বলে "একদিন সাজিয়ে দিলেই কি চিরকাল থাকে"। অলোকা উৎসাহ ভরে বলে ওঠে—"আচ্ছা এবার থেকে রোজ ঘর সাজিয়ে দেব কেমন ?"

"বেশতো,—কিন্তু এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে এলো—এখন যাবেতো তুমি ?" অলোকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অলোকা রাগত ভাবে বলে—"যাচ্ছি—যাচ্ছি।" "রাগ হোল নাকি ?" "রাগ করতে বয়ে গেছে—!" "শোন—শোন ?" অলোকের দিকে পিছন করে—অলোকা দাঁড়িয়ে থাকে। "এদিকে এসোনা" ?—"না,—সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে !" অলোক হেসে ফেলে—"দিন দিন রাগের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে যে" ? অলোকা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়—"রাগ হবে কেন, রাগ আমার নেই।" "তাই বুঝি মুখখানা হঠাৎ মা লক্ষ্মীর বাহনের মুখের মত হয়ে গেল" ?

অলোকা হেসে ফেলে, খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে— "না রাগ হবে না? বেশ করবো-একশো বার করবো। এত করে খাটলাম তার কোন দাম নেই?" অলোক রাগ ভাঙ্গাবার আশায় একটা মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়—"দু চার দিনের মধ্যে কাঠিহার যাবো—কিছু চাই নাকি?" অলোকা চুপ করে থাকে। "কই বললে না," "বলবো"?—"বল!"—"কাঠিহার বাজারটাকে পকেটে করে নিয়ে এসো বেশ"। অলোক হাসতে হাসতে বলে— "এবার ঠিক তোমার সমস্ত জিনিষ এনে দেবো।" "খুব হয়েছে এই নিয়ে তিনবার হোল।" অলোকা গমনোদ্যত হতেই অলোক বলে— "আচ্ছা চা খেতে গিয়ে দিদিকে সব বলে দিচ্ছি"। অলোকা ফিরে দাঁড়ালো— "এখানে চা খাবে"? —"এখানে কি করে হবে"! অলোকা তাড়াতাড়ি একটা কাঠের বাক্স খুলে বলে— "এদিকে এসে দেখনা সব আছে—"। "চুরি করে আনলে কেন"? 'চুরি না ছাই, দিদি নিজে নিয়ে এসেছে, চা করি"? "আজ থাক"। "বেশ সেই ভালো"— ধপাস করে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে অলোকা উঠে দাঁড়ালো। "কি হোল আবার"? "কি আবার হবে?" "আচ্ছা এখানেই কর"। "দায় পড়ে গেছে আমি চল্লাম, সন্ধ্যে হয়ে গেলনা"। অলোকা বাইরে যেতেই অলোক চীৎকার করে বলে "আজ আর চা খাবনা বুঝলে!"

খানিকটা পথ গিয়ে অলোকা ফিরে এলো—"চা খাবেনা কেন?" "এমনি"!—"এখানে করে দেব?" "না!" —"দেবো?" —"জানিনা।" অলোকা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে ওঠে—"হাসির কি হোল?" অলোকা উত্তর না দিয়ে স্টোভ জ্বাললো।

দু কাপ চা তৈরী করে অলোকা বলে, "এখনো অনেকটা চা আছে, জল বেশী হয়ে গেছে"। অলোক নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দেয়। অলোকা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বলতো এখানে কেন চা করলাম ?"

"কেন ?" অলোকা আস্তে আস্তে বলে "ওখানে তো দিদি তৈরী করবে তাই ? আচ্ছা কি খেতে তোমার ইচ্ছে করে ?" "যা দেবে।" "নিজের বুঝি কোন জিনিষ খেতে ইচ্ছে হয়না ?" "হাঃ হাঃ হাঃ"। ডাক্তার রায়ের বিকট হাসিতে অলোকা চায়ের পাত্র রেখে উঠে পড়লো

"হ্যালো ভূতপূর্ব্ব ছোট গিন্নী, বেশ নূতন সংসারটি পেতেছ তো ? ওকি, পালাচ্ছ কেন ?" ডাক্তার হাত ধরে বললেন—"পালালে চলবে না—আমার চা-চাই, বুঝেছ, বুঝেছ ছোটরাণী, অনেকক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম ঐ দরজার ওপাশে"—অলোকা কোন রকম চা ঢেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "খাঃ খাসা হয়েছে ত, ভায়ার আমার বরাত ভালো, বলি রসভঙ্গ ক'রলাম না তো ?" অলোক মুচকে মুচকে হাসে—

৫৫

দেখতে দেখতে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষার শেষে শরৎ এলো ঘুরে—সঙ্গে নিয়ে কুলফুলের মধুসঞ্চয়ী গুঞ্জণ-মুখর মধুপের দল। অম্বুবর ক্ষেত্রে শুরু হোল কাশের দোলন—আকাশে দেখা দিল রজত শুভ্র মেঘদলের লুকোচুরি। ছুটী ছুটী—বৎসর শেষে রেল-কলোনীর সকলের মুখে কেবল এক কথা দেশ—দেশ, হোকনা সে যেমন তেমন পাড়া গাঁ অথবা নগর। বাঙালী পাঞ্জাবী মাদ্রাজীর ভেদাভেদ নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিতের পার্থক্য নেই—সবাই উৎসুক সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা

করছে স্বল্প কয় দিন ব্যাপী আনন্দ অবকাশের। সকলের মনে উঁকি দিচ্ছে—প্রিয় পরিজন, প্রিয়তম জন্মস্থান, পরিচিত পথ ঘাট প্রান্তর—সকলে উন্মুখ চিত্তে অপেক্ষা করছে যাত্রার।

সব আনন্দ, সমস্ত আয়োজন, বিপুল পরিশ্রম, খেয়ালী নিয়ন্তার একটিমাত্র খেয়ালের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিধাতা পরিহাস করলেন কিংবা সৃষ্ট জীবকে তাঁর ক্ষমতা দেখালেন বোঝা শক্ত, কিন্তু মন্দভাগ্য রেল-কলোনীর অধিবাসীদের মোটঘাট নিয়ে আর ট্রেনে চড়তে হোলনা। পঞ্চমীর মধ্যরাত্রি থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুরু হোল এলো মেলো বাতাসের মাতামাতি, সুযোগ বুঝে পাগলা কুশীর শাখা প্রশাখা উঠলো দুকূল ছাপিয়ে—জনপদ প্রান্তর হয়ে গেল একাকার। রেল কোম্পানীর বড় সাধের জিয়ানগঞ্জ কুশীর কাষ্ঠসেতু স্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে কোথায় ভেসে গেল, তার চিহ্নও রইল না।

আকস্মিক বিপর্য্যয়ে বসুদেব রায়কে অতিমাত্রায় বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। বৃষ্টি থেমেছে চারদিন পর,—কিন্তু জলস্ফীতি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্থলভূমির যে টুকুতে তাঁরা বাস করছেন, সে স্থানও ডুবে যাবে। চারিদিকে কেবল জল আর জল,—যেন অপার অগাধ বারিধি আপন মনে নৃত্য করে চলেছে।

নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং জন কয়েক মিস্ত্রী কুলী চৌকিদার ট্রলিম্যান নিয়ে ডাঃ রায় পড়েছেন মহা দুশ্চিন্তায়। বাসার উঁচু পোস্তায় ঢেউগুলি প্রতিহত হয়ে শব্দ উঠছে—থক্ থক্ থক্। ডাক্তার-রায়ের মনে জাগছে সন্দেহ, তরঙ্গ—আঘাতে আশ্রয় স্থান ধ্বসে পড়তে

কতক্ষণ ? লোকালয় বহুদূরে—তাতে এই বন্যার জল, সেখানকার কোন প্রত্যাশা বৃথা. রেলের বাঁধ ছাপিয়ে স্রোত চলেছে, কত সেতু ভেঙ্গে গেছে তার ঠিক কি. বনমাংকি ও বিহারীগঞ্জ আজ যেন পৃথিবীর দুই প্রান্তে। রাত্রের মধ্যে যদি জলস্ফীতি রুদ্ধ না হয় ? এক সঙ্গে এতগুলি প্রাণী কি জীবন হারাবে বন্যার অতল পাথারে।

সুরুচি দেবীর আশা, উপায় কিছু একটা হবেই—চিন্তায় শরীর ক্ষয় ভিন্ন যখন করার কিছু নেই, তখন কি দরকার এত ভাবনার ? এ কয়দিন যে কি ভাবে কাটছে তা একমাত্র অলোকার অন্তর্যামীই জানেন। সুরুচি দেবী, বসুদেব বাবুর অনুনয় বিনয়ে যা সম্ভব হয়নি—সেই অতি অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছিল—মাত্র একদিনের গোমড়া মুখের গুণে। অলোক তাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে রাজী হোল অথচ সব কিছু আমোদ-আনন্দ বানের জলে ভেসে গেল ! পঞ্চমীর রাত্রে রামলীলা শুনতে গিয়ে অলোক গ্রাম থেকে ফিরতে পারেনি।

সুরুচিদেবী অবশ্য বলেছেন—"গ্রামের অবস্থা এখান থেকে নিশ্চয়ই অনেক ভালো। অলোক ভালই আছে,—হয়তো সেই করবে তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা, তবু অলোকা শান্তি পায়না. সে ভাবে যতই বিপদ হোক না, এক সঙ্গে সকলে মিলে থাকাই শ্রেয়ঃ।

ঝপ্ ঝপাৎ। বসুদেববাবু চমকে উঠলেন। "বাবু-বাবু ! চৌকিদারের মুখ যেন কেউ চেপে ধরেছে. "কি হয়েছে ?" "ধ্বস গিয়া—তিন নম্বর কোয়ার্টার ধ্বস গিয়া।" ডাক্তার সকলকে আশ্বাস দেন—ভয় নেই. এখানে কিছু হবে না অনেক উচু ইত্যাদি। যতগুলি আলো ছিল সব কয়টাই জ্বলছে। আলোকে ভীষণতা অনেকখানি হ্রাস পায়। কুলী খালাসী চৌকিদার সবাই এক জায়গায় বসে

ফিস্ ফিস্ করে কথা বল্‌ছে, এ কয়দিন প্রায় তারা অভুক্ত তবু ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন উদ্রেকই নেই। টিউব ওয়েলটা ছিল এই উঁচুতে তাই রক্ষা, না হলে জলরাশীর মাঝে অবরুদ্ধ অবস্থায় হয়তো শুষ্ক তালু হয়ে মরতে হোত! সুরুচিদেবী—যৎসামান্য আহারের ব্যবস্থা করলেও কেউ খেতে চায় না। মতিলাল কেঁদে ফেললে—"ক্যা হোগা মায়ী!" কারুর কথায় মতিলালের আর ভরসা হয় না—সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সামান্য শব্দে চমকে উঠে চীৎকার করে "পানী আগেলো—পানী আগেলো"—।

অলোকার চীৎকারে বসুদেববাবু ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলেন। সর্ব্বনাশ! নিদ্রিত খোকার বিছানায় একটা মস্ত সাপ!

সুরুচি দেবী ক্ষিপ্রগতিতে পুত্রকে টেনে নিলেন। ট্রলীম্যান লাঠি হাতে ছুটে এলো।—সাপটা নড়েনা, মরা না কি? সুরুচি দেবী নিষেধ করলেন—"মেরোনা প্রাণের মায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।—কামড়াবার হলে এতক্ষণ কত কি ঘটে যেতো।"—লাঠির ডগায় করে তাকে জলেই ভাসিয়ে দেওয়া হোল। কম্পাউণ্ডার 'কার্ব্বলিক এ্যাসিডে'র বোতল খালি করে ছড়িয়ে দিল চারদিকে—কয়েকটা মশাল জ্বালানো হোল- অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য।

অনেকরাত্রে বসুদেব বাবু বলেন—'বসে কেন শোওনা অলোকা'।—'কি হবে শুয়ে—ঘুমই আসেনা'। মৃদুস্বরে ডাক্তার বললেন—'ভালুই আছে বুঝলে ছোট গিন্নী'। অলোকা চুপ করে থাকে। বসুদেব বাবু পুনরায় বলেন—'এক সঙ্গে থাকলে বেশ হতো কি বল গো'! এমন সময়ে ও আপনার ঠাট্টা'—অলোকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললেন—'এসো এক কাজ করি'।—'সবাই মিলে প্রার্থনা শুরু

করে দিই—পরম পিতার খাস দরবারে'—অলোকা প্রতিবাদের সুরে বলে—'চুপ করুন সব সময়—ঠাট্টা ভাল লাগেনা'—'বেশ—আমিই না হয় একটু গড়িয়ে নিই'।

'দিদি-দিদি'! সুরুচি দেবী ধড়মড় করে উঠে বসলেন, 'কি রে'? —'ঐ দেখ'? বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন সুরুচি দেবী,—অনেক দূরে একবার একটা তীব্র আলো জ্বলে উঠে পরক্ষণে নিভে গেল। 'নৌকো আসছে বোধ হয়'—ডাক্তার রায়ের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়,—'কোথায় নৌকো দেখলে'? অলোকা নির্দ্দেশ করে বলে—'ঐ দিকে'। 'স্বপ্ন দেখেছ নিশ্চয়ই—এই স্রোতের মধ্যে কে নৌকো—চালাবে'?—আবার আলো জ্বলে উঠলো। 'তাইতো, টর্চ্চের আলো'? মতিলাল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো,—'বাবু বাবু'!—'ক্যা হুয়া'—'দানা—আগেলো'! কেঁদে ফেললো মতিলাল। কিছুই সে বুঝতে চায় না,—'পানি আগেলো'র পরিবর্ত্তে এখন কেবল 'দানা আগেলো'। ঘরের মধ্যে থাকবার অধিকার পেয়েও কিন্তু তার ভয় ভাঙ্গে না,—সকলে চেয়ে থাকে জলরাশির দিকে।

ঘণ্টাখানেক পর পুনরায় খুব কাছে টর্চ্চ জ্বলে উঠলো—মানুষের স্বরও শোনা গেল। কম্পাউণ্ডার বলে—'ডাকাত নয়তো'? এতক্ষণ একথা কেউ চিন্তা করেনি, অসম্ভব নয়। কম্পাউণ্ডার চীৎকার করে উঠলো, উত্তর এলো বাংলায়—অলোকের কণ্ঠস্বর, সকলে বাইরে এসে দাঁড়ালো।—পরপর চারটি বিরাট স্থলচর চতুষ্পদ তীরের কাছ বরাবর এসে পড়লো, হস্তিপৃষ্ঠ থেকে নামলো অলোক পুলিন ডাক্তার ইত্যাদি।

কম্পাউণ্ডার বলে, 'আমি মনে করেছিলাম ডাকাত'। মতিলাল এক বিরাট লাঠি উচিয়ে বলে—"ডাকাত দেখলে এতক্ষণ সে ডাণ্ডা বাজি সুরু

করে দিত, একটা লাঠি যতক্ষণ তার হাতে, এতক্ষণ সে 'পানশো লোককে থোড়াই কেয়ার করে'। যাক মতিলাল তবে পাগল হয়নি।

অলোকের কথার জবাব দিলেন সুরুচি দেবী—'হ্যাঁ ভাই এবার কার পুজো মনে থাকবে চিরকাল'? অলোকার মনে খুব আনন্দ—অলোক যেন এক মস্ত দিগ্বিজয়ী বীর। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে বারহারা-কোঠির অবরুদ্ধ প্রাণী কয়টি হস্তিপৃষ্ঠে ভেসে চললো গ্রামের দিকে।—জিনিষ পত্র সবই পড়ে রইলো,—প্রাণ বাঁচলে জিনিষ হতে কতক্ষণ? মতিলাল কিন্তু তেঁতরিয়ার মায়ের দেওয়া বর্তন-লোটা কাঁথা-কম্বল ছাড়বার পাত্র নয়। তেঁতরিয়ার মায়ির মেজাজ জানতে তার কিছু বাকী নেই,—মুলুক থেকে আসবার সময় যতই চোখের জলে দুনিয়া ভাসাক, 'চিজ্ সমন' খোয়ালে ঝাড়ুর সাথে মুখ ঝট্‌কান দিতে তো ছাড়বেনা।
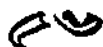
সমস্ত রাত্রি বনমাংকিতে চলেছে খণ্ড যুদ্ধ, গ্রামবাসী আর রেলওয়ে পুলিশে।—পঁচিশজন পুলিশের বন্দুকের ভয়ে বার বার তাদের বাঁধ কাটার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রেলের উঁচু বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য গৃহহারা গ্রামবাসী, তাদের গরু ছাগল মহিষ গবাদি পশু নিয়ে। বাঁধের কানায় কানায় জল—কোন কোন জায়গায় বাঁধ ছাপিয়ে দুদিক এক হয়েও গিয়েছে। শিবনলাল চৌবে—পার্ব্বতীওঝা—ছেদিলাল—অবস্থা-পন্ন গ্রাম্য মুরুব্বীগণ বহুবার রায় বাহাদুর তেজ নারায়ণ সিং এর কাছে দরবার করে, গ্রামের দুর্দ্দশার অবস্থা জানিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন। রায় বাহাদুর কিন্তু বাঁধ কেটে ফেলতে রাজীনন।

অশিক্ষিত গেঁয়ো চাষার কথায় তিনি তো আর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত-রেলওয়ে বাঁধের ক্ষতি সাধন করতে পারেন না। রায় বাহাদুর খেতাব তিনি রক্ষা করবেনই,—হয়তো ভবিষ্যতে—"রাওরাজা"—সম্মানও ভাগ্যে জুটতে পারে।

বন্যায় উৎসন্নে যাক দেশ—মড়কে উজাড় হয়ে যাক পল্লীর পর পল্লী—তাতে তাঁর কি যায় আসে।—কল্পনা নেত্রে, তেজ নারায়ণ দেখেন সুবে বাঙলার রাজধানীতে কোম্পানীর কর্ণধারগণ তাঁর কাযের তারিফ করছেন—'হ্যাঁ তেজ নারায়ণ সিং জবরদস্ত অফিসার"—ওঃ কত বড় সম্মান। জেলাবোর্ডের সুরকি ঢালা উচু রাস্তাকে চেনা যায় না—যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল একটানা লম্বা লোকালয়। অসংখ্য কুটীরে-চীৎকার অভিশাপ ও কান্নার সঙ্গে চলছে গৃহহারা পল্লী বাসীর চমৎকার জীবন যাত্রা।

শিবনলালের ক্ষতির মাত্রা সব চেয়ে বেশী। অতবড় পাটগুদাম তার একেবারে ভেঙ্গে গেছে। পাটের গাঁট স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। বহু পরিশ্রমে যা রক্ষা পেয়েছে তাও হয়তো শেষ পর্য্যন্ত পচেই যাবে।

শিবনলালের জ্যেষ্ঠপুত্র মঙ্গল গতরাত্রি থেকে একদল গ্রাম্য যুবক-দের সঙ্গে পরামর্শ করছে। পিতাপুত্রে রীতিমত ঝগড়া হয়ে গিয়েছে, মঙ্গল, আবেদন-নিবেদনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে—। পাটনা কলেজের ছাত্র সে, তার মতে, দীনতা প্রকাশ শুধু বিড়ম্বনা নয়-আত্ম-অমর্য্যাদা। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুম্ গুম্ শব্দে বার কয়েক বন্দুক গর্জ্জন করে উঠলো। অসংখ্য লোকের চীৎকারে কিরণবাবু বাইরে এসে দেখেন জনতা সেই দিকেই আসছে। 'কি ব্যাপার'? প্রত্যেকের হাতে

লাঠি সড়কি ও বল্লম। কয়েকজন কুলী ছুটে পালালো, 'গাঁওবালা ডাকাত হো গিয়া – বিলকুল লুটতা হ্যায়'—। ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীর প্রথম আঘাতে কুলী ছাউনী ভূমিস্মাৎ হয়ে গেল। কুলী রমণীদের চীৎকার আর কান্নায় চারিদিক ভরে উঠলো। গ্রামের লোকেরা কি পাগল হোল নাকি? বেশীর ভাগ লোক চলে গেল কলোনীর দিকে— মাত্র জনকয়েক কিরণবাবুর অফিস টেণ্ট ঘিরে ফেললো। দড়ি কেটে দিতে তাম্বুটা পড়ে গেল মাটীতে চীৎকার উঠলো—'আভি ঠিক হুয়া হ্যায়',—যেন তাম্বুটা খুলে ফেলা একটা মস্ত বীরত্বের কাজ। 'ওহি এক বাবু, মারো শালেকো'—কিরণবাবু হাত-ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেলেন।

কিরণবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে তারা নারাজ,—আর কি কথাই বা বলবে তারা? মঙ্গল থাকলে সুবিধা হোত। কিরণবাবু চটে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর যুক্তি, তিনি রেল.কোম্পানীর লোক নন। যদি গ্রামবাসীর বোঝাপড়ার দরকার থাকে তারা যাক ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। অশিক্ষিতের দল রেল কোম্পানী আর কনট্রাকটারের প্রভেদ বুঝতেও অক্ষম। অফিসের কাগজপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কেরোসিন তেলের সংযোগে তাম্বুটা জ্বলে উঠলো—। কিরণবাবু চীৎকার করে বললেন—"কাগজগুলো ফেরৎ দাও।" হয়তো কাগজপত্র এরা ফেলেই চলে যেতো, কিন্তু কিরণবাবুর কথায় সেগুলিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো আগুণের মধ্যে—। কাগজের ট্রে কাড়তে গিয়ে ধ্বস্তা ধ্বস্তি বেধে গেল। ট্রেখানা কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুম্ করে একটা শব্দের পর কিরণবাবু পড়ে গেলেন। অন্য গ্রামবাসীরা থতমত খেয়ে গেল। বন্দুক-ধারী অস্ত্র ফেলে গ্রামের দিকে ছুটলো—অন্য সকলে তার পিছু নিল।

বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে মঙ্গল আর সুনির্ম্মল রায়। রায় সাহেব, তেজনারায়ণ সিংয়ের বিনা অনুমতিতেই বারো যায়গায় বাঁধ কেটে দিয়েছেন। মঙ্গল সুনির্ম্মল রায়ের ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হয়ে গেছে, সমস্ত দোষ ঐ রায়বাহাদুর তেজনারায়ণের। তার বাড়ীতো মোকামা ঘাটের কাছে, বেকুফ কি বন্যার প্রকোপ বোঝে না। বন্দুকের শব্দে মঙ্গল চমকে উঠলো—সুনির্ম্মল রায় তার দিকে ফিরে চাইলেন।

মঙ্গল উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে বন্দুকটা থেকে গেছে মেঘুয়ার হাতে। একজন মজুর হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'ঠিকাদার সাহেবকো গাঁওবালা গোলি মার দিয়া'। সুনির্ম্মল রায়ও মঙ্গল লালের পিছনে ভেঙ্গে পড়লো রেলকলোনীর ইতর ভদ্র।

কিরণবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সুনির্ম্মল রায়কে দেখে বললেন—'তোমাদের পাপ আমার ওপর দিয়ে গেল ভাই'—। সুনির্ম্মল রায় ডাক্তারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'ডাক্তার—ডাক্তার কি করবে হে, কিছু করতে গেলেই প্রাণটা তখুনি বেরিয়ে যাবে'। তবুও ডাক্তার পরীক্ষা করলেন কিন্তু চিকিৎসা তাঁর সাধ্যের বাইরে। তলপেটে গুলি বিদ্ধ হয়েছে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিরও অভাব, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হোল। একে একে গ্রাম্য মুরুব্বিরা উপস্থিত হলেন,—সমস্ত দোষ পড়লো মঙ্গললালের উপর। মঙ্গলের মুখে কথা নেই সে যেন মাটীর মানুষ হয়ে কিরণবাবুর পাশে বসে আছে।

বারকয়েক ব্যাণ্ডেজ পরিবর্ত্তন করা হোল, রক্ত কিছুতেই বন্ধ হয়না সকলে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিরণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'দেখছ সুনির্ম্মল ? কত বড় সৌভাগ্য আমার—চারিদিকে কত লোক, যেন

বিশ্বশুদ্ধ আমার আত্মীয়, আমি তো রাজা লোক হে' ?—'চুপ করুন কথা বলবেন না'। কিরণবাবু ম্লান হাস্যে উত্তর দিলেন—'চুপ করলে আর কিছু বলবো না হে'। কিরণবাবুর বাসার শোকাচ্ছন্ন থম্‌থমে আবহাওয়া—আভার সামান্য কথায় নূতনরূপে একটা আলোড়ন তুললো। সুনির্ম্মল রায় বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায়' ? অশ্রুমুখী আভার কম্পিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হোল 'খেজুরাহায়'। সর্ব্বনাশ! খেজুরাহার ভগ্ন সেতু পথে তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভয়াল নিষ্ঠুর—বন্যার তরঙ্গ—। ছুটে চললেন সুনির্ম্মল রায়।

বহু লোক জমায়েত হয়েছে খেজুরাহায়—। নানা রকমের কথা-বার্ত্তা চলছে—। 'ছেলেটা খুব দুরন্ত আচ্ছা কি করে পড়লো জলে. কেউ বলে 'ভাগ্য, ভাগ্য হে, 'রায় সাহেব পুষ্যি নিলেন কিন্তু ভাগ্য দেখতে হবেত?' সুনির্ম্মল রায়ের উপস্থিতিতে বাক্যস্রোত প্রবাহিত হোল ভিন্ন পথে।—'আমি শুনেই ছুটে এলাম, ফটর নাকি অনেক করে নিষেধ করেছিল কিন্তু এ'কি কারুর কথা শোনে'? সুনির্ম্মল রায় কোনদিকে না চেয়ে এ'গয়ে গেলেন—দিগন্ত প্রসারিত ভয়ঙ্কর] খেজুরাহা—চারদিকের বন্যাধারা খেজুরাহার সঙ্গে মিশে, বয়ে চলেছে উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গীতে, ঘূর্ণায়মান জলস্রোতে ভেসে চলেছে গো-ম'হষাদি পশুর মৃতদেহ,—মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসে পচা উৎকট দুর্গন্ধ।

তীরে আবদ্ধ হয়েছে কয়েকটি শব, গ্রামবাসীরা বলাবলি করছে—'ইত্তো বৈজু ন'? অন্যজনে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—না না এ সেই ঘাটোয়াল। গলিত বিকৃত শব দেখে চেনা মুস্কিল বৈজু অথবা ঘাটোয়াল। নাঃ কিছু করবার নেই, সুনির্ম্মল রায় আভার হাত ধরে

ফিরবার উপক্রম করতে সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো—'না না আমি যাবোনা—যাবোনা কাকাবাবু।' অকস্মাৎ ভীড় ঠেলে আভার সামনে এসে দাঁড়ালেন শান্ত বাবু। শান্ত বাবুর আজ পুরা সাহেবী বেশ,—মাথায় হ্যাট, দেহে বিরাট ওভার কোট, পায়ে বুট, হাতে টেনিস র‍্যাকেট্।—'চুপ কর, চুপ কর মা। তুষ্ট্ ছেলেটাকে ঠিক আমি তুলে আনবো—'। সুনির্ম্মল রায় কিছু বলবার আগেই শান্ত বাবু ছুটতে আরম্ভ করলেন—। জনতা বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখে উন্মাদের কার্য্য কলাপ। উঁচু কিনারার ধারে দাঁড়িয়ে শান্তবাবু চীৎকার করে উঠলেন—'রে বাদল ফিরায়ে আনিব তোরে ? —পরমুহূর্ত্তে লাফ দিয়ে পড়লেন জলে।

সত্যই খেজুরাহার দেবতা গ্রাস করলেন শান্তবাবুকে—অবশ্য সূর্য্যাস্তের তখন বহু বিলম্ব।

৫৭

জগতে সব জিনিষেরই—তুটি দিক আছে,—বিধাতা যেমন একদিকে ভাঙ্গেন অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিও করেন। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে রেল কোম্পানীর ক্ষতি হোল কয়েক লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যদিকে আবার অনেক গরীবের চাকরীর মেয়াদ বেড়ে গেল, চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল কাযের।— বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানের উপর দিয়ে পুরাদমে কাজ চলেছে—যেমন চলতো বৎসর খানেক পূর্ব্বে।—অবশ্যম্ভাবী বরখাস্তের ভয়ে চাকরীর হাল ছেড়ে দিয়ে—যারা—নূতন কিছু করার—পরামর্শ করতো, তারাও আজ উৎসাহী কর্ম্ম-পরায়ণ। ভবিষ্যৎ বন্যার প্রকোপে যাতে কোন বিভ্রাট না ঘটে তার জন্যে তৈরী হচ্ছে অনেক সেতু।—ঠিকাদারদের ভাগ্য চিরদিনই

সুপ্রসন্ন,—বিধ্বস্ত কোয়ার্টার মেরামতে, পুনর্নির্ম্মাণে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করবে তারা।—সব চেয়ে মজা করেছেন ওভারসিয়ার কুমুদ ঘোষ।

এতদিন নলকূপের তত্ত্বাবধায়ক রূপে তিনি বনমাংকিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াতেন বিহারীগঞ্জ—মুরলীগঞ্জের সব কয়টি ষ্টেশনে। হঠাৎ তাঁর হুঁস হোল, সুখের দিন বুঝি শেষ হয়ে যায়—নলকূপের বদলে ঘরবাড়ীও ব্রিজের কাযের মধ্যে তাঁকে নামতে হবে। কুমুদ ঘোষ ভেবেচিন্তে সমস্যার সমাধান করে ফেললেন—। রায় সাহেব 'থ' হয়ে গেলেন রাসায়ণিক রিপোর্টে—সমস্ত নলকূপের জলই—পানের অনুপযুক্ত। রায় সাহেব বুঝলেন সব—কিন্তু প্রতিকার সুদূরপরাহত। আবার নূতন ভাবে গভীরতা বৃদ্ধি করে নলকূপের কাজ সুরু হোল। কুমুদ ঘোষ গভীর মনোযোগে নলকূপের কাজে নেমে পড়লেন। বনমাংকি থেকে বিহারী গঞ্জের ট্রেন চলাচল অনেক পিছিয়ে গেল। মুরলীগঞ্জের উদ্বোধন মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে—মাত্র কয়েকটা 'বিল্ডিং'য়ের সামান্য কাজ বাকী—যে গুলির ঠিকাদার—রায় বাহাদুর তেজ নারায়ণ সিংহের পরমাত্মীয় বদ্রিনাথ বর্ম্মা মহাশয়।

'বাড্রিন ভারমা লিমিটেডে'র পরিচালক—মিঃ ভারমা পুরাদস্তুর সাহেব—রং যেমনই হোকনা কেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিহারের কোন অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করলেও, আমেরিকাকেই তিনি স্বদেশ মনে করেন। প্রতি কথায়, প্রতিকার্য্যে, চলে আমেরিকার তুলনা, সেই সঙ্গে এই 'ডার্টী' ইণ্ডিয়া—পুয়োর ইণ্ডিয়া'র মুণ্ডপাত। শীঘ্রই তিনি আবার নাকি আমেরিকায় চলে যাবেন—রায় বাহাদুরই কেবল অনেক করে আটকে রেখেছেন।—মিঃ বর্ম্মা মার্কিনী মহিলার গুণমুগ্ধ হলেও, মিসেস ভারমা গোয়ানীজ মহিলা।—পাকচক্রেই তাঁকে এ বিবাহ করতে

হয়েছে—উপায় ছিলনা বলেই। মিসেস ভারমার কাছেই তিনি একমাত্র জব্দ,—ভারমা নিজেও স্বীকার করেন "দুনিয়াতে একমাত্র স্ত্রীর কাছেই তিনি হার মেনেছেন।" —মিসেসের মুখ এবং হাত পা দুই সমান ভাবে চলে—অতএব মিষ্টারকে একটু সমীহ করেই চলতে হয়—।

ভারমা সাহেব য়্যাডিসনাল ইঞ্জিনিয়ার এস, কে রায়কে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করেন না, সুনির্ম্মল রায় কড়া নোটিশ দিয়েছেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি আইন সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। ফলে মিঃ ভারমা নিজে উপস্থিত থেকে সব কাজ শেষ করে ফেলেছেন। বিল পাশ করার পুর্ব্বে রায় সাহেব এসেছেন সরেজমিন তদন্তে। রায় বাহাদুর আজ যথেষ্ট মনঃক্ষুন্ন এমন কি অপমানিতও বোধ করছেন,কিন্তু নিরুপায়। সহকারী যদি অনুরোধ রক্ষা না করেন তবে কি আর করা যেতে পারে?

'গার্ড্স রানিং-রুমের'—মাপজোপ শেষ হল। মিঃ ভারমা গম্ভীর মুখে-পাইপ ধরিয়ে—ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লেন—'এই সামান্য কাযের জন্যে আমি কোম্পানী খুলিনি মিঃ রায়? ভবিষ্যতে দেখবেন বিহারকে নূতন করে গড়ে তুলেছে—আমার ভাড্রিন লিমিটেড"

রায় সাহেব উত্তরে বললেন—'সেতো খুব সুখের কথা মিঃ বর্ম্মা'।—রায় বাহাদুর একটু শ্লেষাত্মক মন্তব্য ছাড়লেন—'তাহলে আপনাদের পথে বসতে হবে যে'—।

রায় সাহেব হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—দরকার যদি পড়ে, আপনারা সাহায্য প্রার্থনা করলেই আমরা আসবো—সারা ভারতে আমরা যাতায়াত করি,—আপনাদের অসুবিধা হবে না বোধ হয়'—।

মিঃ বর্ম্মা বল্লেন—"চলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে কি লাভ? ইন্স-পেকসসান তো চুকে গেল।" সুনির্ম্মল রায়, রাজমিস্ত্রীকে কক্ষের একটী

স্থান খনন করতে বললেন। রায়সাহেবের আদেশে তেজনারায়ণ সিংয়ের মুখে চোখে—ভ্রূকুটীর একটা ঢেউ খেলে গেল। মিঃ বর্ম্মা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন "সমস্ত মেঝেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি।" বর্ম্মার আদেশে তাঁর রাজমিস্ত্রী সজোরে শাবল চালাতে লাগলো। শাবল যেন কিছুতেই বসতে চায় না। সমস্ত স্থান পাথরের মত শক্ত। প্রত্যেক আঘাতে আওয়াজ ওঠে ঠং ঠং।

রায় বাহাদুর অতিরিক্ত মাত্রায়—গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বললেন,—"মিঃ বর্ম্মা আমার আত্মিয়, তাই কি আপনি তাঁকে অপমান করতে চান মিঃ রায়?" সুনির্ম্মল রায় ততোধিক গাম্ভীর্য্য সহকারে খননকারী মিস্ত্রীকে অন্য স্থান নির্দ্দেশ করতেই—রায় বাহাদুর ধৈর্য্য হারিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"সমস্ত মেঝেটাই ভেঙ্গে ফেলা হোক?" "আমার কাজ আমি জানি মিঃ সিং।" রাজমিস্ত্রী তখনও ইতস্ততঃ করছে,—মিঃ বর্ম্মার মুখে নেমেছে ভীতি ব্যঞ্জক বিবর্ণতা

রায় সাহেবের ইঙ্গিতে শাবল পড়লো মেঝের উপর। কি আশ্চর্য্য! প্রত্যেক আঘাতকে প্রতিহত করে আর সেই খনখনে আওয়াজ উঠছে না। প্রত্যেক আঘাতে অনেক খানি অংশ নির্ব্বিবাদে প্রবেশ করছে অভ্যন্তরে। "দেখুন রায় বাহাদুর, আপনিও আসুন মিঃ বর্ম্মা।" মিঃ বর্ম্মা অবনত মুখে নিঃশব্দে রইলেন কিন্তু রায় বাহাদুর তেজনারায়ণ বলে উঠলেন "বর্ম্মা যে এমন অপদার্থ তা জানতাম না? আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা মিঃ রায়।" রায়সাহেব বললেন—"আরো অনেক কিছু দেখতে পাবেন।" "দরকার নেই" আমি বুঝতে পেরেছি সব। চলুন বনমাংকিতে ফিরে যাই।" "তা হয় না মিঃ সিং, বিশেষ করে কুলী-ব্যারাকের মধ্যে অনেক কিছু দেখবার আছে"। রায় বাহাদুর শাসকের

স্বরে মিঃ বর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ভাবে কাজ করেই কি আপনি কারবার চালাতে চান—?" মিঃ বাডারিন ভারমা নিরুত্তর।

"দেখুন যা হয়েছে তার জন্যে আমি কিছু বলতে চাই না, তবে মিঃ বর্ম্মার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আশা করি আপনি বিবেচনা করবেন। এখনকার কনট্রাক্টই বর্ম্মার প্রথম কাজ। সুনির্ম্মল রায় উত্তর দিলেন—"কারুর উন্নতির পথে বাধা দেবার ইচ্ছা আমার নেই।" রায় বাহাদুর —বর্ম্মাকে লক্ষ্য করে বললেন "মিঃ রায় আপনাকে ক্ষমা করেছেন, এখনও সময় আছে, এর মধ্যে সব কাজ মিঃ রায়ের য়্যাডভাইস নিয়ে শেষ করে ফেলুন।"

সুনির্ম্মল রায় বললেন—"আমার ওয়ার্কমিস্ত্রী সব সময় আপনাকে সাহায্য করবে।" বর্ম্মা মাথা নীচু করে বললেন "আচ্ছা।" মিঃ বর্ম্মা ওভারসিয়ার সুপারভাইজারদের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করতেন না, আজ ওয়ার্ক-মিস্ত্রীর কথায় রাজী হয়ে গেলেন। রায় বাহাদুর আর সুনির্ম্মল রায়কে নিয়ে, মোটর ট্রলী বনমাংকির দিকে ফিরে চললো। মিঃ বর্ম্মা একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন অপমানিত জীবনে হন নি তিনি। সব দম্ভ সমস্ত গর্ব্ব যেন তাঁর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ফেরৎ মিঃ বর্ম্মা চলমান ট্রলীর দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৫৮

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর—কালীচরণের আগমনে, অলোকের সাড়া মন তিক্ততায় ভরে উঠলো। দশদিনের জায়গায় না হয় আরোও পাঁচ দিন বেশী লেগেছে,—তাই বলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও দেখা নেই! অলোক খাদ্য পানীয় সমস্ত ফেরৎ পাঠিয়ে শুয়ে পড়লো।—মিনিট কয়েক পর দরজা ঠেলে অলোকা প্রবেশ করলো।

'শুয়ে কেন ?' 'এমনি !' 'শরীর খারাপ নাকি ?' 'না।' 'কি হোল ?' 'কি হবে আবার !' 'হুঁ।' অলোক পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলো। "ট্রেনে খুব কষ্ট হয়েছে ত ?' 'না।' অলোকা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে বলে—'চা খেলে না কেন ?' 'এমনি।' 'দিব্যি গা-তো ঠাণ্ডা।' 'শরীর বেজায় খারাপ করেছে কিন্তু'। 'মাথা ধরেছে বুঝি ?' 'না।' 'তবে ?' অলোক উঠে, বসে বলে,—'তুমি যাও স্নান করেই যাচ্ছি।' অলোকা সবিস্ময়ে বলে—'সে কি ? শরীর খারাপ, স্নান করবে কেন ?' 'শরীর ঠিক আছে।' 'তবে ?' 'তবে আবার কি ?' 'খারাপ' বলছিলে যে ?' "না ঠিক আছে।"

অলোকা বুঝতে পারে সব, অলোক তার দিকে না চেয়েই কথা-বার্তা বলে চলেছে। অতি কষ্টে হাস্য রোধ করে, অলোকা বলে—'দেখি হাত খানা ?' অলোক বাঁ হাত এগিয়ে দিল। 'এটা নয়—ডান হাত খানা, "হুঁ !" 'কি—হুঁ ?' 'যা—ভেবেছি ঠিক তাই—। 'কি ?' 'নাড়ী বেশ চঞ্চল।' অলোক হেসে ফেলে। 'হাসলে চলবে না—ঠিক রোগ ধরেছি।' অলোকার দিকে চাইলো অলোক, 'বলবো কি হয়েছে ?' 'বল।' 'জানি জানি'—নিজে দোষ করে আবার রাগ দেখানো হচ্ছে।' 'বেশ করেছি'।

অলোকা চটে ওঠে—'দশদিনের জায়গায় কদিন হোল মশাই ?' অলোক হেসে উঠলো,—রাগ কিংবা অভিমানে অলোকার নাক চোখ মুখ কেমন ধারা হয়ে ওঠে। নাক বেঁকিও না বলছি ?' 'না—বেঁকাবে না, সেদিন কত সব রান্না করে বসে থাকলাম আসার নাম নেই,—বলে গেলেই তো হোত ?' 'কি করবো বল, কাজ না মিটলে আসি কি করে ?'

অলোকার অভিমান একনিমেষে জল হয়ে গেল, বিজ্ঞের মত মাথা

ছুলিয়ে বললো—'তা ঠিক, পরের কাজ সে তো তোমার হাত ধরা নয়, আচ্ছা এবার চা খাবে তো ? রান্নার এখন বেশ দেরী আছে।"
'চা আনাও।' 'এখানেই করছি, আচ্ছা চায়ের সঙ্গে আরো কিছু খাবেতো ?' 'না' শুধু চা'। ষ্টোভের গর্জ্জন ছাপিয়ে ভেসে আসে ইঞ্জিনের আওয়াজ। অলোক জানলা দিয়ে উঁকি মারে, ইঞ্জিন খানা থেমে গেল। 'আমি চা করে নেবো—তুমি যাও।' 'কেন ?' 'কেউ হয়ত এসে পড়বে।' 'আসুক গে।' ইঞ্জিন খানা হুইসেল দিয়ে চলে গেল, 'নাঃ কেউ নামেনি।' অলোকা চা ঢালতে ঢালতে বলে—'আচ্ছা—তোমার এত ভয় কিসের বল তো ?'

'ভয়!' 'ভয় নয় তো কি, সব সময় কেবল চলে যাও—চলে যাও—কেন ?' 'রেলের লোকদের তো চেনো না, এরা যাতা রটাতে খুব ওস্তাদ।' 'বয়ে গেল, তোমার নামে—আমার নামেই রটাবে তো ?' কাপ নিয়ে অলোক বলে—'কই তোমার নেই ?' "তুমি খেয়ে খুব একটু রেখো তাতেই হবে।" অলোক গম্ভীর কণ্ঠে বলে—'একটুও দেব না, কতবার বলেছি এঁটো খাওয়া ঠিক নয় তবুও তোমার রোগ যায় না।' 'বেশ তো, দিও না, চা খাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছি।' কয়েক চুমুক খেয়ে অলোক পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে বলে—'নাও।' কাপটা হাতে নিয়ে অলোকা হেসে ওঠে—'আরোও দু'চুমুক খেয়ে নাও।' 'তাহলে কাপ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু!' অলোকা কাপ টেনে নেয় 'হ্যাঁ-দিচ্ছি কি না ? দু' ঢোকতো মাত্র আছে, তুমি একটি চা-রাক্ষস!' 'তুমিও চা রাক্ষুসী।'—'চা-তো ছেড়েই দিয়েছি।' 'বেশ করেছ আমি কিন্তু ছাড়ছি না।' 'কেন, চা-না খেলে কি চলে না ?' 'চলুক-না-চলুক, অতশত জানি না, মোট কথা আমি খাবোই।' 'বেশ তবে আমিই বা গলা শুকিয়ে মরি কেন ?' উভয়েই হেসে উঠলো—

'আচ্ছা—পাঁচদিন দেরী হোল কেন বল তো?' নূতন ট্রাঙ্কটা দেখিয়ে অলোক বলে 'কথা থাক, দেখবে নাকি?' 'কি আছে।' বাক্স খুলেই অলোকা হেসে ফেলে—'ওমা একেবারে বাজার পত্র করে ফেলা হয়েছে যে!' অলোক জবাব দেয়, 'না হলে আবার ছুটতে হোত তো?' ভাজ করা সোলার মুকুটটা হাতে নিয়ে অলোকা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। 'হাসলে যে?' 'লুকিয়ে রাখো অন্য কোথাও, একজন দেখলে আমাকে আর বাঁচতে দেবে না।' 'এদিকে এসো তো?' অলোকা হাত চেপে ধরে বলে 'ছিঃ এখন পরে নাকি?' 'দাঁড়াও না দেখি কেমন মানায়, ষাঃ বেশ লাগেতো।' 'খুব হয়েছে।' অলোকা মুকুট খুলে ফেলে।

'কাপড় দেখবে না?' আকাশ রংয়ের বেনারসী খুলে অলোক জিজ্ঞাসা করে—'পছন্দ তো?' 'খাসা হয়েছে' পরক্ষণে অলোকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো—'ক খানা বেনারসী কিনেছ?' 'এটা দিদির তোমার নয়।' 'বাঁচালে দিদির না আনলে কিন্তু খুব খারাপ হোত, আমার কেবলি ভয় করছিল'! 'ভয়, কেন?' 'যদি দিদির না আনতে —আমায় লজ্জায় পড়তে হোত, আচ্ছা, নিজের কিছু কেননি তো?' 'কেন, ঐতো বাণ্ডিল রয়েছে।'

অলোকার মুখ গোমরা হয়ে ওঠে। 'কি হোল আবার?' 'রাজ্যের জর্জ্জেট বেনারসী আমাদের জন্যে—আর নিজের বেলায় মোটা চটের মত খদ্দর।' 'নিজের জন্যে কেউ কেনে নাকি, লোকে যে ঠাট্টা করবে।' 'তোমার কেবল ভয়, এত ভয় যে কিসের বুঝি না বাপু। আচ্ছা আমিই আনিয়ে দেব তোমার জামা কাপড়, পরা চাই কিন্তু!' অলোক হেসে ফেলে—'আচ্ছা পাগল তো তুমি—আমি যে পাবো এখান থেকে' অলোকার মুখে হাসি ফুটে ওঠে—'তখন কিন্তু খদ্দর খদ্দর করলে

চলবে না ?' 'গয়না দেখবে না ?' গয়নার বাক্স খুলে অলোকা প্রশ্ন করে —'সব টাকা খরচ হয়ে গেল তো ? 'টাকা খরচ না করলেও চলতো তবে তোমাকে হারাতে হোত ?' অলোকা অবাক হয়ে বলে "কেন ?"

"স্যাকরার মেয়েকে বিয়ে না করলে বিনা দামে গয়না পাবো কি করে !" 'খুব পাকা হয়ে উঠেছ তো' ? 'তুমিই তো পাকালে' ! 'আমি' ! 'তা নয়তো কি, তুমি সামনে না এলে বিয়ের নামই করতাম না, একেবারে কাঠখোট্টা হয়ে থাকতাম।" অলোকা একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে বলে—'এটায় কি আছে দেখালে না ?" খুলে দেখ'। অলোকা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে ওঠে—। 'হাসছ যে' ? 'কি অসভ্য তুমি' ! 'অসভ্য, তার মানে' ? 'এসব জানলে কি করে ?' 'পুত্তলিকা নই বলে' । 'ওমা ! এ সবেও চোখ যায় বুঝি।" 'চোখ বন্ধ করলে আর যায় না' । 'ছিঃ দিদি দেখলে কি মনে করবে বলতো ?"

"কি আর বলবেন, তিনি বেশ জানেন—বোনটি নেহাৎ খুকুমণি নন'। অলোকা একটা ব্লাউজ নিয়ে বলে—'তবু ভালো ব্লাউজের রং মিলিয়ে কিনেছ'। 'হ্যাঁ, ঐ খানেই একটু ভুল করেছি, আজকাল-কার রেওয়াজ কি জানোতো ? ব্লাউজ হবে ফিকে কিন্তু ওটা হবে বেশ গাঢ়, সেই রকম নেবে' ? অলোকা শিউরে উঠে বলে ' না বাবা দরকার নেই,—এই খুব ভালো,—আর যা কর, এগুলো যেন দিদিকে দেখিও না'। হঠাৎ বাক্স বন্ধ করে অলোকা উঠে দাঁড়ালো, 'গোছ-গাছ পরে করবো '। 'কেন' ? দাদাবাবু আসছেন যে'—। 'দিদির আর খোকার গুলো নিয়ে যাও না' ? অলোকা হেসে ফেলে—'আহা কি বুদ্ধি, ওসব আমি পারবো না নিজে নিয়ে যেয়ো বেশ' । অলোক মনে মনে হাসে—মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে সত্যিই বেশী চালাক।

চুমায় চুমায় মানসী শিশু পুত্রকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে—"আমার সোনা, আমার মাণিক, আমার যাদু। মাঝে মাঝে শিশু অব্যক্ত ভাষায় হেসে ওঠে কখনও বা কেঁদেও ফেলে। হাসি-কান্না মায়ের সমান আনন্দের বিষয়। মানসীর স্বাস্থ্য ফিরেছে, আগেকার সেই রুগ্ন শীর্ণ চেহারার সঙ্গে এতটুকু সামঞ্জস্য নেই, সর্ব্বাঙ্গ মাতৃত্বের লালিত্যে পরিপূর্ণ। অনেকক্ষণ সোহাগ বর্ষণ, করে শিশুকে মেঝেতে শুইয়ে, উঠে গেল মানসী। শিশু কিছুক্ষণ হাত পা ছুড়ে খেলা করে, এদিক ওদিক চেয়ে, শেষে কান্না সুরু করে দিল। একলা থাকা সে মোটেই পছন্দ করে না, সব সময় তার কাছে একজনকে চাই। মানসী ছুটে এলো "ওরে ছেলে একটু নড়তে দেবেনা, সর সময় চাই সোহাগ!" কান্না বন্ধ করে শিশু হেসে ওঠে,—মানসী তার কোমল গণ্ড দুটিকে লাল করে দিল। "এবার যাই বাবা, না হলে যে খেতে পাবোনা কিছু!" শিশু মায়ের দিকে চেয়ে হাসে, সে যেন বুঝতে পেরেছে মানসীর কথা। মানসী একখানা লাল মলাটের ছোট্ট বই তার হাতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল।

অপূর্ব্ব প্রবেশ করে দেখে, শিশু উপুড় হয়ে শুয়ে—একমনে খেলা করছে। বইখানার পাতাগুলো লালায় লালায় ভরে উঠেছে, অপূর্ব্ব কাছে গিয়ে বসলো,—শিশু বই ফেলে ফোক্‌লা মুখে—একটু-খানি হেসে—জন্মদাতাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালো।"

অপূর্ব্ব পুত্রকে এমনভাবে এত কাছে বসে কখনও দেখেনি। সব সময় সে ভাবতো এ পুত্র যেন তার নয়,—এর জন্ম যেন একটা সৃষ্টির ব্যতিক্রম।—অনেকক্ষণ ধরে, দেখতে দেখতে অপূর্ব্ব পুত্রকে বুকে তুলে নিল। শিশু তার চুলের মুঠি ধরে হেসে উঠলো, অপূর্ব্ব

বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে, মুখের নিম্নাংশ টুকু ঠিক কল্পনার মত, হাসলে পরে ঠিক সেই রকম টোলটাও ফুটে ওঠে, চুলও সেই রকম কোঁকড়ানো। এতদিন পুত্রের দিকে ভাল করে না চেয়ে সে খুব ভুল করেছে।

মানসী পিছন থেকে দেখে, পিতাপুত্রের অপূর্ব্ব মিলন-ছবি। হঠাৎ তার চোখ পড়লো মেঝের উপরকার বইখানায়, মানসী অপরাধীর মত বইখানা তুলে নিয়ে, বস্ত্রাংশে শিশুর লালাটুকু মুছে নিল। বইখানা অপূর্ব্বর বড় আদরের বস্তু। অপূর্ব্বর জন্মদিনে কল্পনার উপহার। অপূর্ব্ব চাইলো মানসীর দিকে—"দেখছ কেমন দুষ্টু হয়েছে!"

মানসী চুপ করে থাকে. কতদিন সে পুত্রের অনাদরে চটে উঠেছে, ভেবেছে, আজই সে তার কৈফিয়ৎ চাইবে, পরক্ষণে মনে করেছে—কি দরকার! খোকা কেবল তারই একার, অপূর্ব্বর সঙ্গে তার, কোন সম্বন্ধ নেই। না দেখুক অপূর্ব্ব, না করুক, একটুখানি সোগাগ, তুই কেবল আমার আমার। শিশুকে বুকের মাঝে চেপে ধরে, মানসী পাগলের মত বলেছে—তুইতো কারুর নোস মানিক, কেবল আমার একার, তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস, সব সময় কেবল তোর কাজেই ব্যস্ত থাকবো আমি। আমাদের সংসারে কেউ নেই, কেবল তুই আর আমি—মা আর ছেলে—ছেলে আর মা। শিশুর লালার সঙ্গে মিশে গিয়েছে মানসীর অভিমান—অশ্রু।

অপূর্ব্ব একটা ছোট্ট স্বর্ণহার বের করে, পুত্রের গলায় পরিয়ে দিল। মানসী হত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে—এতটা প্রত্যাশা, সে কোন দিন করেনি। মানসী একটু কাছে যেতেই, শিশু তার দিকে ঝুকে পড়লো। 'অপূর্ব্ব বলে "খুব চিনতে শিখেছেতো? নাও একটুখানি।"

পুত্রকে মানসীর হাতে তুলে দিল অপূর্ব্ব। মানসী হারখানা দেখে বলে—"খুব সুন্দর হয়েছে, কবে গড়তে দিয়েছিলে?" অপূর্ব্ব আর একখানা অপেক্ষাকৃত বড় হার বের করলো—'এটা দেখতো'? 'আবার আর একটা!' 'এটা তোমার'। "টাকা কোথায় পেলে?" ম্লান হাসি দিয়ে—অপূর্ব বলে "যেখান থেকেই পাই, ধার করিনি কোথাও!" অপূর্ব্বর হাসি মিশানো কথার মধ্যে বেজে ওঠে—একটা বেসুরো-সুর, প্রচ্ছন্ন বেদনায় ভরা।

অপ্রতিভ মানসী বলে—"না না তা বলছি না, কিন্তু কত খরচ হয়ে গেলতো?" "টাকাতো থাকেনা তাই, গড়িয়ে ফেললাম, পেলাম যখন'। মানসী চেয়ে থাকে স্বামীর দিকে। অপূর্ব্ব বলে—"ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে একটা নাটক লিখেছিলাম মনে আছে, প্রকাশক পাঠিয়েছেন আমার মস্তিষ্কের মূল্য, বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে।" মানসী অলঙ্কারটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—'খোকার জন্যে এনেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমার জন্যে না কিনে, তোমার জামা জুতো কাপড় কিনলে না কেন? সবই তো ছিঁড়ে গেছে'। অপূর্ব্ব হাসে। বহুদিন ধরে অপূর্ব্বর জামার হাতায় বোতাম নেই, ময়লা গেঞ্জি সপ্তাহ কালের পরও অপূর্ব্ব পরে চলেছে, ফর্সা কাপড়, আধময়লা জামা, মানসী দেখেও দেখেনি—আজ মনে মনে বেশ লজ্জিত হোল মানসী। এতটা অবহেলা দস্তুরমত অন্যায়—সে যে কথা দিয়েছিল এক জনকে!

অপূর্ব্বর কাছে এসে দাঁড়ালো মানসী। 'তুমি পরিয়ে দাও'! ঈষৎ অবনত হতেই অপূর্ব্ব মানসীর হাত চেপে ধরে বলে—"কি পাগলামো ক'রছো আবার"? মানসী হাত ছাড়িয়ে বলে—'বাধা

দিতে নেই, জানোতো এটা আমাদের ধর্ম্ম।' প্রনতা মানসীর হাত হুখানা ধরে কাছে বসালো অপূর্ব্ব, খোকা হাত পা ছুড়ে হেসে উঠলো। "কি রকম তুষ্ট হয়েছে দেখছ ?" অপূর্ব্ব চেয়ে থাকে মানসীর দিকে,—'কি দেখছ' ? 'তোমাকে'-—! 'আমাকে, কেন ?' "এমনি।"

মানসী আরো কাছে সরে গিয়ে বলে—'একটা কথা বলবো' ? 'বল।' "আমাকে ক্ষমা কর।" "ক্ষমা ? ক্ষমা কেন' ? 'সত্যি বলছি আমি অপরাধী,' "কই কিছু জানিনা তো ?" "সব জানো তুমি, এতদিনের পাগলামী আমার ভুলে যাও। অপূর্ব্ব সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে 'দোষতো আমারও কম নয় মানু'। মানসী অকস্মাৎ বলে ওঠে, "আর একটা জিনিষ দেখবে' ? অপূর্ব্ব বলে "কি ?"

মানসী বাক্স থেকে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করে বলে 'এই দেখ'। অপূর্ব্বর মনে পড়ে অনেক কথা, গল্পটা লেখা হয়েছিল কল্পনার কথা মত, অথচ এটা তার অজস্র রচনার মধ্যে অতি নগণ্য তবু পড়ে চলে অপূর্ব্ব, ছাপা অক্ষরে নিজের লেখাটাই বড় আনন্দ দেয়। "আর একটা কথা বলবো 'বল"। 'তুমি আবার লেখ' 'কেন ? "লেখনা কত সুন্দর তোমার রচনা।" অপূর্ব্ব পাতার পর পাতা উল্টে যায়। "কই বললে না ?" "কি ?" "লিখবেনা ?" অপূর্ব্ব বলে "না।" "লিখবে না কেন ? আমার ওপর রাগ করে ?"

অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে জবাব দেয়—'লেখক অপূর্ব্ব মরে গেছে মানসী। যে অপূর্ব্ব ছেলেবেলায় ছিল দুর্দ্দান্ত, প্রথম যৌবনে ভাব-প্রবণ বিলাসী, সে অপূর্ব্ব আর বেঁচে নাই, ছা-পোষা কেরাণীর পক্ষে কলম চালনা শুধু ধৃষ্টতা নয়, রীতিমত ব্যাভিচার'। "এখনওতো তোমার চল্লিশ পার হয়নি।" অপূর্ব্ব হেসে ওঠে —এমন

প্রাণ খোলা হাসি সে অনেকদিন হাসেনি,—"ওসব কেতাবী বুলি আমি বিশ্বাস করি না, তবে আমার মধ্যে যার অপমৃত্যু ঘটলো তা একদিন আবার ফুটে উঠবে। সেটা যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থাই এখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন।" মানসা কথা বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে—। 'খোকাকে মানুষ করতে হবে, আমার সমস্ত অপূর্ণ সাধ ওই পূর্ণ করবে মানসী', ঘুমন্ত পুত্রকে চুম্বন করলো অপূর্ব্ব। সত্যিই অপূর্ব্ব আজ নূতন মানুষ হয়ে গেছে।

শিশু অঘোরে ঘুমায়। সে যেন আজ জনক জননীর মনোমালিন্য দূরীভূত করে, পরম শান্তিতে বিশ্রাম মগ্ন। ঘুমন্ত কচি মুখ থেকে, স্তন্যপানের মত, মৃদু মৃদু শব্দ নির্গত হতে থাকে। অপূর্ব্ব আবার তার গণ্ডে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দেয়। "ঘুমন্ত ছেলেকে চুমু খেতে নেই, বড় দুষ্টু হয়।" পরক্ষণে মানসা বলে "আচ্ছা অন্নপ্রাশন দেবেতো ?' অপূর্ব্ব পুত্রের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে জবাব দেয় ।

'আগে হলে বলতাম, এ বিলাসিতায় কি দরকার? কিন্তু আজ, আজ বলছি, নিশ্চয়ই দেবো। আসছে মাসের পূর্ণিমায় খোকার অন্ন-প্রাশন'। "একটা নাম দিতে হবে তো, না কেবল খোকা বলেই ডাকবে ? একটা বেশ মিষ্টি নাম বেছে দাওনা ?" অপূর্ব্ব পুত্রের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে—'মানসী আর অপূর্ব্বর সন্তান, কি নাম তার, তার নাম অপরূপ-অপরূপ এর নাম, কি বল মানসী ?' মানসী উল্লাসে বলে ওঠে "বাঃ খুব সুন্দর তো, আমি বলছি তুমি লেখো, দেখবে লোকে কত সুখ্যাতি করবে" অপূর্ব্ব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, ধীরে ধীরে বলে— তা আর হয়না, লেখা প্রাণের জিনিষ, সাধনার বস্তু মানসী। ভারতীর সেবা ছিল আমার আজন্মের কামনা, কিন্তু সে মন

আর নেই, সে শক্তিও আমি হারিয়ে ফেলেছি। এখন পরের রচনা পড়ে তর্ক তারিফ করতে মন চায়, সৃজনী শক্তি কোথায় পাবো বল?' অপূর্ব্বর বেদনা সঞ্জাত ভাষায়, সহানুভূতি মমতায়, মানসীর অন্তর ভরে ওঠে হঠাৎ বলে, "স্নান করবে তো তুমি? বেলা অনেক হোল যে?"

অপূর্ব্ব চলে যাওয়ার পর মানসী দাঁড়ালো কল্পনার ছবিখানার সামনে, কল্পনা যেন হাসছে, তার পানে চেয়ে। ঝুলে ভরা ধুলা মাখা আলেখ্য-খানা সস্নেহে আঁচলে মুছে ফেললো মানসী, কল্পনা আজ আর সপত্নী নয়, সত্যিকার স্নেহময়ী সহোদরা। ছুটীর দিনে অপূর্ব্বর সান্নিধ্যে উপস্থিতিতে মানসী হাঁপিয়ে উঠতো, আজকের রবিবার যেন বয়ে এনেছে মিলনের বাণী, শান্তি-সুখ-তৃপ্তি বিধাতার মঙ্গল আশীষ, মানসীর জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা, আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

৬০

অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পর অলোক ডাক্তার কোয়ার্টার অভিমুখে রওনা হোল। অলোকা এখন আসবে কি করে? হাজার হোক এখনও তারা আনুষ্ঠানিক বিবাহিত নয়, তা ভিন্ন বাপের সামনে এখানে আসা বেশ একটু দৃষ্টি কটু। এতক্ষণ বসে থাকাটাই হয়েছে তার বোকামী। পথের মধ্যে কালীচরণের সঙ্গে দেখা হোল, "আমি আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম বাবু"। অলোক জিজ্ঞাসা করে "বুড়োবাবু এসেছেন তো'? "হ্যাঁ সেই সকালে।" অলোকের ইচ্ছা হোল জিজ্ঞাসা করে কে তাকে পাঠালো। শেষ পর্য্যন্ত কালীচরণই বলে ফেলে "দেরী দেখে ছোটমা আমাকে ডাকতে বললেন।" অলোকের মনে পুলক জেগে ওঠে, অলোকা তার কথা সব সময় মনে রেখেছে তো, সামান্য দূরত্ব শেষ হয়ে গেল, গৃহে প্রবেশের সঙ্গে দেখা হোল অলোকার সঙ্গে।

মৃদুকণ্ঠে অলোকা বলে "বাবাকে প্রণাম করতে ভুলোনা যেন!" অলোক তার গিন্নীপনায় হেসে ফেলে। "হাসলে যে? সব সময় তুমি অনেক জিনিষ ভুলে যাও যে, আগে খেয়ে নাও তারপর।"

অলোকা চলে গেল। অলোক ছোট টেবিলটার সামনে বসে ভাবে অনেক কথা। . মনের-মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি সে অনুভব করে, যেমন অনুভূতি জাগে, পরীক্ষার পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে, ছাত্রদের মনে। পরীক্ষাইতো! জীবনের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা যে!—মিনিট কয়েক পর সুরুচি দেবী প্রবেশ করলেন,—'কি এত ভাবছ বল দেখি, একটু লজ্জা করছে না'? অলোক হেসে জবাব দেয়—"না লজ্জা কিসের।" "সকলেরই এমনি হয়, একটু বস, আমি ভাত নিয়ে আসি।"—খড়মের খট্‌খট্ শব্দে অলোক সতর্ক হয়ে ওঠে—হরপ্রসাদ বাবু আসছেন নিশ্চয়ই।

'উঠছ কেন, বস-বস'। অলোক বাধ্য হয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। হরপ্রসাদ বাবু—অন্য একখানি চেয়ারে উপবেসন করলেন, বৃদ্ধের মুখ বেশ গম্ভীর। সুরুচি দেবী টেবিলের উপর থালা রেখে, বাটী কয়টাকে সাজিয়ে চলে গেলেন। 'নাও খেতে আরম্ভ কর,—খেতে খেতেই কথা চলবে'। অলোক নিজের বিব্রত ভাবটুকু অনেকখানি সহজ করে থালায় হাত দিল। মালা ঘুরাতে ঘুরাতে হরপ্রসাদ বাবু প্রশ্ন করলেন "তোমার এখানকার কাজ আর কতদিন!" "বেশী দিন নয়, আর মাস কয়েক"। 'তারপর'? "ঠিক কিছু নেই"। "হুঁ"। "কটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই"। "বলুন"। এর আগে কোথাও তোমার সম্বন্ধ হয়েছিল?' 'না'। 'কেন'? 'এমনি'।

'তোমরা ভাগলপুরেই থাকতে'? 'হ্যাঁ' 'আত্মীয়দের পরিচয় তুমি দিতে চাওনা-কেমন'? 'হ্যাঁ'। 'কিন্তু কেন বলতে পার'? কোন প্রয়োজন নেই

বলেই'। 'তোমার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু মেয়ের বাপ হয়ে আমারতো সেটা দেখা উচিৎ'। হরপ্রসাদ বাবুর স্বরে কর্কশতা ফুটে উঠলো। অলোক চেয়ার খানা একটু খানি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো 'বলুন কি জানতে চান'? জানতে কিছুই চাইনা-শুধু জানি তুমি জোচ্চর'। 'জোচ্চর'! 'একবার নয় একশোবার, ভাগলপুরে নেমে আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেখানে তোমার বাবা কিংবা দাদার নামে কোন লোক কখনও ছিল না।"

হরপ্রসাদ বাবুর দিকে চেয়ে ধীরে সংযত কণ্ঠে অলোক বলে 'আপনার দেশ, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে, আমাকেও কিছুতো জানান নি? ভাগলপুরে কাকে কি জিজ্ঞেস করেছেন জানি না, কিন্তু আমি জোচ্চর নই। জোচ্চুরি করেছেন আপনি'। 'আমি'? হ্যাঁ', শুধু আমার সঙ্গে নয়, অনেকের সঙ্গে'। হরপ্রসাদ বাবু চীৎকার করে উঠলেন"আমি জোচ্চর, এতবড় তোমার'...সহজস্বরে অলোক জবাব দিল 'একশোবার-নয়' হাজার বার'। হরপ্রসাদ অগ্নিময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, অলোক পূর্ব্বের মত সংযত-স্বরে বলতে লাগলো—"দৈব দুর্ব্বিপাকে মানুষের অবস্থা যখন পড়ে যায়—তখন আত্মীয়স্বজনের পরিচয়ে নিজেকে জাহির করা, শুধু নিজেরই অপমান। শুধু এই জন্যেই আমি কারুর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই না,—কোন আত্মীয়ের পরিচয়ও আমি দিই নি, সে কেবল এইজন্যেই। কিন্তু আপনি? আপনি কি জোচ্চর নন? বলুন মৃন্ময়ী দেবীর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, বলুন, তিনি কি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী?'

অকস্মাৎ হরপ্রসাদবাবুর হাত থেকে মালা ছড়াটা খসে পড়লো, উগ্ররূপ নেমে এলো, ভয় পাণ্ডুর বিবর্ণতার মাঝে। ঠিক সেই সময়

প্রবেশ করলেন ডাঃ বসুদেব রায়। 'শুধু আমাকে নয়? ডাঃ রায়কেও আপনি ঠকিয়েছেন. সমস্ত জেনে শুনেই—দুশ্চরিত্র মাতাল বিলাসকে ডেকে এনেছিলেন বন্ধু পুত্রের অজুহাতে। আপনার গেরুয়া, আপনার মালা, শুধু ভণ্ডামি, স্রেফ জোচ্চোরী।" বসুদেববাবু একবার অলোক আর একবার হরপ্রসাদ বাবুর প্রতি চেয়ে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই, অলোক কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

৩১

অলোক ছিল চিরদিনের আদর্শবাদী। আদর্শবাদই তাকে যেমন দিয়েছিল দৃঢ়তা স্পষ্টবাদিতা আর আন্তরিকতা, অন্যদিকে তেমনই সে হয়ে উঠেছিল অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী। স্পষ্টবাদিতা অনেক সময় হঠকারিতায়ও নেমে আসে। দুর্দ্দিনে ভাঙ্গনের সংসারে, স্পষ্টকথা বলার জন্যেই তার সঙ্গে সকলের বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদের পর থেকে, অলোক সমস্ত সম্বন্ধ সকলের সঙ্গে চুকিয়ে দিয়ে, পৃথিবীতে নিজেকে একা রেখেছে, আর বজায় রেখেছে—এই একক নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, বজ্রসম দৃঢ়তা মাখানো আত্মসম্মান।

অপমানিত উত্তেজিত অলোক, কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছে না। কেবলই তার মনে পড়ে হরপ্রসাদ বাবুর উচ্চারিত জোচ্চোর শব্দটা। ক্ষুধা তৃষ্ণা কোন অনুভূতিই তার আজ নেই। সমস্ত রক্ত যেন মস্তিস্কে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে, মুখমণ্ডলের শিরা উপশিরা অসম্ভব মাত্রায় স্ফীত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো টকটকে লাল।

না, ঠিক করেছি। জোচ্চোর তাকে জোচ্চোর যে বলতে আসে, সে তো নিজেই জোচ্চোর। নিশ্চয়ই? বয়সের মর্য্যাদা দেওয়া উচিৎ

ছিল ? না, মোটেই না। মনে পড়ে তাদের সংসারের একটা ঘটনা, তার জন্মের অনেক আগেকার ব্যাপার, তবুও শোনা কথা, তার বেশ মনে আছে। যুদ্ধের সময় পোষ্ট্যাল "সুপারইনটেনডেণ্ট" হয়ে চলে গিয়েছিলেন বাবা। মা আর দাদা দিদি থাকতেন তখন দাদামশাইয়ের আশ্রয়ে। মাস দশেক পর টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাব্যস্ত হোল বাবা মৃত। মনে পড়ে মায়ের মুখে শোনা সমস্ত কথা, সহর শুদ্ধ লোকে ধিক্কার দেয়,সধবার বেশ কেন ? শেষে দাদা মশাই পর্য্যন্ত লাঞ্ছনা স্থুরু করেছিলেন। দাদামশাইয়ের বিরাট অট্টালিকায় মায়ের স্থান হয়নি,বাগানের একপ্রান্তে পর্ণকুটীরে থাকতে হয়েছিল মাকে

দ্বিপ্রহর, বিহারের প্রান্তবর্ত্তী বাংলার জেলা সহর। রৌদ্রের রুদ্রতেজে, যেন ঝলসে যাচ্ছে বিশ্ব চরাচর। জন বিরল পথ দিয়ে চলেছে এক বালক, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, পরনে শত ছিন্ন বস্ত্র। বালককে লক্ষ্য করে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন, বিদেশী পোষাকে সজ্জিত,দীর্ঘ দেহধারী একজন। বালক থমকে দাঁড়ালো। 'চিন্তে পারছিস না' ? টুপিটা খুলতেই বালক উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে "বাবা বাবা।" পথের মাঝে দাদার কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ বাবা জেনে নিলেন।

সন্ধ্যার পর উঁচু রোয়াকে আলবোলায় ধুমপান করছেন, সহরের শ্রেষ্ঠ আইন জীবি। বাবা সেখানে প্রবেশ করলেন মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত অবস্থায়। আলবোলার নল রেখে বিস্মিত কণ্ঠে দাদামশাই বললেন—'তুমি'! "হ্যাঁ বেঁচে আছি, আমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে কোথায়' ? "আছে-আছে, এই তো এইমাত্র এলে, ওগো শোন শোন।' 'থাক কাউকে ডাকতে হবে না, যা জানতে চাই তার উত্তর দিন।" প্রৌঢ় নিরুত্তর। "মাত্র চার মাস টাকা আসেনি কিন্তু

তার জন্যে এই ব্যবহার আপনার?" চারিদিকে তখন অনেকে এসে জুটেছে, প্রৌঢ় ধমকের সুরে বলে উঠলেন 'কৈফিয়ৎ চাও নাকি?' 'নিশ্চয়ই?' 'আমার খুসি' যা ইচ্ছে করতে পার।'

অকস্মাৎ চেয়ার সমেত দাদামশাই নিক্ষিপ্ত হলেন উঠানের মাঝে, চীৎকার উঠলো "খুন খুন করলে।" "খুন করাই উচিৎ এসো তোমরা।" বাবার পিছনে চলে গেল, মা দিদি আর দাদা। দাদামশাইকে আঘাতের ফল ভোগ করতে হয়েছিল সারাজীবন। বাঁ-পাখানিতে তিনি আর শক্তি ফিরে পান নি, সহরের লোকে নূতন নাম দিয়েছিল - ল্যাংড়া উকিল। অলোক যেন কিছুটা শান্তি পায়, নাঃ সে ঠিক করেছে। পিতৃরক্তধারার মর্য্যাদা সে রক্ষা করেছে। বলে কিনা জোচ্চোর!

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ডাক্তার কোয়ার্টারে আলো জ্বলে ওঠে। অলোক চেয়ে থাকে একটি জানলার দিকে। না সে আজ আর থাকতে পারে না। সমস্ত মন কেমন ধারা হয়ে ওঠে, কত কথা মনে পড়ে, আজকের মত অশুভ দিন জীবনে তার আসেনি কখনও। সত্যিই দুর্দ্দিন, কত আশা কত উৎসাহ উদ্দিপনার কি এই পরিণতি। ক্লান্তিতে অবসাদে সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে নূতন রকমের একটা অনুভূতি জাগে।

সে পুরুষ, সহ্যের ক্ষমতা তার অপরিসীম, কিন্তু সে একি করলো! অলোকা, অলোকার কি অবস্থা হয়েছে? কি হবে বেচারীর। শীতের মধ্যেও অলোক ঘেমে ওঠে। তুমি ভাবছো, হয়তো এতদিন অভিনয় করেছি, আমি নিষ্ঠুর কিম্বা জোচ্চোর। যা তোমার বাবা ভেবেছেন? সে যে কত বড় মিথ্যা, কত তার ভীষনতা, কত খানি মর্ম্মান্তিক-তা কেবল আমি জানি, জানেন আমার

অন্তর্য্যামী। তুমি তো আমাকে চেন? তুমি কি বলতে পার? "কি করবো আমি" কি আমার উচিৎ। বুদ্ধি বিত্যা সত্তা সব কিছু কি নষ্ট হয়ে গেল না কি? ক্ষুধিত উত্তেজিত অলোক অবসাদে নুয়ে পড়লো।

* * *

স্বপ্ন! স্বপ্ন নিশ্চয়ই? অলোক বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তুমি! 'হ্যাঁ' অলোক চুপ করে বসে থাকে, দিনের বেলাকার অপ্রীতিকর ঘটনায়, যেন তাদের অনেক খানি পর করে দিয়েছে। 'আলো জ্বালো নি, দরজা খোলা, চোরে সব নিয়ে যেতো যে?' অলোকাই টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। সিগারেটের টিনটা হাতে নিয়ে অলোকা বলে "সমস্ত দিন ধরে টিনটা শেষ করলে তো?" অলোক বিস্মিত হয় অলোকার কথাবার্ত্তায় যেন কিছুই ঘটে নি। "ষ্টোভটা ধরাচ্ছি।" "কেন?" "খাবে না?" "এতরাত্রে ওসব থাক।" "বেশী রাত তো হয় নি, মোটে একটা বাজে।'—তবু অলোক আপত্তি জানায়। অলোকা অনুনয় করে বলে "কতক্ষণ আর লাগবে, একটু খানি মোহনভোগ তো? এখুনি হয়ে যাবে।" অলোক দেখে অলোকার মুখ খানা খুবই শুখনো, নিশ্চয়ই সে ও আজ অভুক্ত। অনুশোচনায় অলোকের অন্তর ভরে ওঠে।

খানিকটা মোহনভোগ খেয়ে অলোক বলে "আর পারি না।" "না না আর একটু খাও, সমস্ত দিনটা তো এমনিই গেল।' 'তুমিও কিচ্ছু খাওনি তো'? অলোকা উত্তর দিল না। 'আমি তো অনেকখানি খেলাম; এটুকু তুমি খাও।' অলোকা ডিসখানা গ্রহণ করলো। "তুমি যে আজ আসবে তা ভাবতে পারি নি"? "সকালে যে অমন কাণ্ড ঘটবে তাকি আমিও ভেবেছিলাম।' অলোক বলে 'আমার ওপর খুব রাগ হয়েছে ত?' "রাগ কেন হবে? থাক, ওসব কথা

থাক, যে জন্যে এলাম তাই শেষ হোক আগে। আমার সম্বন্ধে অনেক আগেই তো তুমি জেনে ছিলে. তবে আমাকে বলনি কেন?' "তোমাকে বলে কি হোত বল?' "আর কিছু না হোক.তোমার অপমান হতে দিতাম না।' অলোক ভেবে পায় না কি বলবে. অলোকা প্রশ্ন করে—'এখন আমি কি করবো বলে দাও'? "সকাল হোক আমি যাবো তোমার বাবার কাছে।' অলোকা দৃঢ় স্বরে বলে "না"। "কেন?" 'সকালেই বাবা আমাকে নিয়ে চলে যাবেন।' 'তবে চল এখুনি যাই?' 'না' তা হয় না. বাবাকে আমি বেশ চিনি, তাতে কিছু ফল হবে না"। "তবে, তুমিই বল আমি কি করবো?" জটিল দূরূহ সমস্যা, অলোক স্থির করতে পারে না কি করা উচিৎ তবু বলে "আমি তো দোষ স্বীকার করতে রাজী আছি।" 'দোষ? কিসের দোষ বল তো?'

"সকাল বেলার ব্যবহার?" সে জন্যে কেউ তোমাকে দোষ দিতে পারে না, আমার কাছে বাবার সম্মানের চেয়ে তোমার সম্মান কম নয়।' "তবে কি করবো বল?"

অলোকা কয়েক "মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বলে, "কথা দাও কেউ তোমাকে কেড়ে নেবে না।' অলোক কথাটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে। 'বল, বল চুপ করে থেক না, আমার মুখের দিকে চাও? বুকখানায়. হাত দিয়ে দেখ। কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখানে' অলোকার একখানা হাত গ্রহণ করলো অলোক, "জন্ম-জন্ম. শুধু কি জন্মের জন্য দায়ী করবে তুমি আমাকে, মাকে আমার মনে পড়ে না দাদও কিছু জানে না. তুমি বল আমি কোন দোষে......

"অলোকের বুকের মাঝে মাথা রেখে অলোকা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অলোক সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে

বলে "তুমি তো আমাকে চেন, আমার সমস্ত কথা তো তোমাকে জানিয়েছি—তবে কেন এ অবিশ্বাস, এত ভয়" ? অলোকা তবু মাথা তোলে না। অলোক ধীরে ধীরে বলে "জানোতো, ব্যথা বেদনা বিচ্ছেদ এ হচ্ছে চিরকালের বিধান। এমন নিবিড় ভাবে কখনও মিশতে পারি নি, তাই হয়তো ভগবান এ ব্যবস্থা করলেন।'

অলোকা ধীরে ধীরে মাথা তুললো, অনেক খানি নিজেকে সে সামলে নিয়েছে। চোখ মুছে বলে, "সব সইতে পারবো, শুধু তুমি আমাকে ভুলো না'। অলোক তার দুই গণ্ড চেপে ধরে চোখের পানে চেয়ে বলে "এই চোখ দুটি তো ভুলবার নয়।" "বাবা যেখানেই নিয়ে যান আমি যাবো, কিন্তু জেনো আমি শুধু তোমার, মৃত্যু ভিন্ন কেউ পৃথক করতে পারবে না।"

ডাক্তার কোয়ার্টারের একটা জানলা খুলে যেতেই এক ফালি আলোক রশ্মি মাঠে এসে পড়লো। অলোকা বলে 'ওঃ দু'ঘণ্টা এর মধ্যে কেটে গেল ! অথচ দিনটা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছিল না, রাত্রির যেন ডানা গজিয়েছে—"ম্লান হাসি ফুটে ওঠে অলোকার মুখে।" এবার যাবে নাকি ?' "হ্যাঁ দিদি জেগে আছেন, তিনটের সময় জানলা খুলতে বলে এসেছি।" অলোক ঘড়ি দেখে ঠিক তিনটে বেজে পাঁচ। "আর একটু থাকোনা এখনও অনেক দেরী আছে ভোরের।" অলোকা বলে"আলোটা ধরতো কতকগুলো জামা কাপড় নিই।"অলোক সমস্ত আকাশ রংয়ের শাড়ী গুলো বেছে দেয়। "আচ্ছা কিছু টাকা আছে ?" "কত বল ?" "যা হয় হাত খরচের জন্যে কিছু দাও।"

অলোক তার ব্যাগটা হাতে তুলে দেয়, "এটা থাক আমার কাছে ?" "নোতুনটা নাও না।" "না এটাই বেশ ভালো।" তৃপ্তিতে অলোকের প্রাণ

ভরে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে "আর কিছু বলবে না ?" অলোকা হেসে জবাব দেয়, "কি বলবো বল, মনে করেছিলাম এই দুঘণ্টা কত কথা বলবো, কিন্তু সব যে ভুলে গেলাম !" পরক্ষণে অলোকা গম্ভীর হয়ে ওঠে। "কি হল আবার ?" ধীরে ধীরে অলোকা বলে "আবার কবে দেখা হবে তাই ভাবছি।" একদিন দেরী করে কাজ থেকে এলে অলোকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতো, কলকাতায় দশদিনের কড়ারে পনর-দিন থাকায় অলোককে কম বিব্রত হতে হয়নি।

হঠাৎ অলোকা বলে "দিদিকে ভুল বুঝোনা, তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন, দাদাবাবুও।" জানি সব।" "আর একটা কথা "রোজ ঠিক সময় মত খাবে তো ? লক্ষীটি কথা দাও" ? অলোক হেসে ওঠে—"না খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে ?" "তা জানি, কিন্তু তোমাকে-তো চিনি, হয় তো শুধু কাপের পর কাপ চা শেষ করবে, অমন করো না বেশ ?" "চাই আর খাবো না" "কেন ?" "কে করে দেবে ?" অলোকার চোখ ছল ছল করে ওঠে—এই চা করা নিয়ে দুজনের প্রায়ই ঝগড়া হয়েছে ; অলোক কতবার তার চায়ের নিন্দে করে তাকে রাগিয়ে কাপ নিঃশেষ করে ফেলেছে।

অলোক বাক্স থেকে একটা সাবেকী আমলের হার ছড়া বের করে বলে "এটা পরবে তো ?" হার ছড়া অলোকের মায়ের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন, গৃহত্যাগের সময় এটাকে সে নিয়ে এসেছিল। অলোকের হাত ধরে অলোকা গিয়ে দাঁড়ালো শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবি খানার সামনে। 'এসো দুজনে একসঙ্গে ঠাকুরকে প্রনাম করি' আবার কবে একসঙ্গে প্রনাম করবো তা তো জানি না" । সদা হাস্যময় রামকৃষ্ণ দেবের আলেখ্য সম্মুখে উভয়ে মাথা নত করলো। "দাও এবার পরিয়ে"। হার গলায়

দিয়ে দিতেই অলোকা প্রনাম করলো অলোককে। বাইরের বিরাট অশথ চুড়ায় বিহগ কাকলী সুরু হয়ে গেল।

"এবার যাই ?" অলোক বলে "যাই বলে না আসি বলতে হয় যে !" অলোকা হেসে ফেলে "খুব যে সংসারী হয়ে গেছ"?"তুমিই-তো শিখিয়েছ, চল তোমাকে দরজার কাছ পর্য্যন্ত রেখে আসি।""না.তুমি এখানেই থাক।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অলোকের দুই হাত চেপে ধরে ক্ষুদ্র বালিকার মত অঝোরে কাঁদতে থাকে অলোকা। অলোক সস্নেহে আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে বলে "আমাকে সাবধান করে কত কথা-তো বললে, কিন্তু নিজে তো খাওয়া দাওয়া বন্ধ করবে না ?" অলোকার রো-রুত্তমানা কণ্ঠ হতে "না" শব্দটা বেরিয়ে এলো কেঁপে কেঁপে। "দাঁড়াও, আর একবার প্রনাম করি।" অলোক বাধা দেয় না প্রতিবাদ করে না, তপ্ত অশ্রুধারা অলোকের পায়ের উপর একটার পর একটা পড়তে থাকে। "শোন যখন ট্রলীতে উঠবো তখন, তখন তুমি এই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো কেমন ?" "আচ্ছা।" অলোকা কিছু দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখে অলোক দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টাখানেক ধরে অলোক কক্ষে পাইচারী করে কাটালো। ঐ যে যাচ্ছে অলোকা হরপ্রসাদ বাবুর পিছনে, অলোক নিশ্চল ভাবে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্রলী খানা খন্ খন্ আওয়াজ তুলে বনমাংকির দিকে চলে গেল। অনেকক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অলোক শয্যায় এসে বসলো। চারিদিক রোদে ভরে উঠেছে, আলোটা তখনও জ্বলছে, ল্যাম্পে হাত দিয়ে অলোক নিরস্ত হোল, চোখে পড়লো দিনপঞ্জিকার একখানা পাতা, যেটা কালকের খুব সকালে অলোকা ছিঁড়ে দিয়ে ছিল,এটা ছিল তার নৈমিত্তিক কাজ। আলোক আর ক্যালেণ্ডারের ছিন্ন পত্রখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলোক

৬২

কাজ—কাজ আর কাজ। চারিদিকে সাড়া পড়েছে কাযের। দ্বিগুণ চতুর্গুণ মজুরমিস্ত্রী উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে চলেছে, সময় সময় "পেট্রোম্যাক্স" কিংবা পাঞ্চলাইটের সাহায্যে রাত্রিতেও অবসর নেই। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে,বেহারীগঞ্জশাখা লাইনে 'ট্রেণ' চলাচল আরম্ভ হবেই

দ্রুত কাজ চলার সঙ্গে সমানে তাল বজায় রেখে, কলোনীর বহু কোয়ার্টারে, অফিসে কেবল চলছে একটী আলোচনা. নানান রকম ভাষায়—বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গীতে। "সুনির্ম্মল রায় পাকা চোর"। "মুরলীগঞ্জ সেকসনের বহু জিনিষ গেছে রায় সাহেবের দেশে। এত অল্পদিনের চাকরীতে কলকাতায় হু'খানা বাড়ী কেনা কি সোজা কথা? এবার ঠিক চাকরী ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের কল খুলবে কলকাতায়, এটা একেবারে খাঁটি কথা, নিজের কাণে শুনেছি খুব বিশ্বাসী লোকের, কাছে" ইত্যাদি। ভবেনবাবুর সঙ্গে একদিন যারা, দল পাকিয়েছিল—যাদের অপরাধী জেনেও সুনির্ম্মল রায় ক্ষমা করেছিলেন তারাই আজ অবাধে মন্তব্য প্রকাশ করে যাচ্ছে।

যার সম্বন্ধে, এত আলোচনা, এত চাপাচাপি হাসাহাসি তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। পুরাতন চাকুরীয়ারা অবাক হয়ে যায়, নেপিয়ার পরিশ্রমী ছিলেন দুর্দ্দান্ত, দুরন্ত শীতের মধ্যেও দুপুর রাত্রে স্টোর-ইয়ার্ডে পাহারা দিয়ে কতবার চোর ধরেছিলেন। সমস্তদিন মোটরে, ট্রলীতে, অশ্বারোহণে, পদব্রজে বহু মাইলের কাজ তদারক করে, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত একাকী অফিস চালাতেন। সুনির্ম্মল রায় যে তাঁকেও হার মানালেন। কোম্পানীর একান্ত ভক্তদল—ঝানু চাকুরীয়ারা—যারা ঘুঁষের টাকায় সুনির্ম্মল রায়কে লাল করে তুলে নিজেদের অনিদ্রা রোগাক্রান্ত করে ফেলেছেন, তাঁরা বাঁকা চোখে চেয়ে, বাঁকা হাসি হেসে বলেন—"পেটে পড়লে খাটতে আমরাও পারি হে বাপু"।

রায় বাহাদুরের কবল থেকে স্টোরকিপারকে বাঁচাতে গিয়ে সুনির্ম্মল নিজে পড়েছেন বিপদে। স্টোরের চার্জ্জ নিয়েই এই ফ্যাসাদ বেধেছে।

অনেক গুলি তাম্বু, কয়েকটী থিয়োডোলাইট এবং লেভেলিং ইন্সট্রুমেণ্ট, তিনটে পাম্পইঞ্জিন সেই সঙ্গে কয়েক লাখ ইট চোখের সামনে থেকে উধাও হোল কি করে? তেজনারায়ণ সিংহের অভিযোগ অনুসারে কলকাতা থেকে এসেছেন জনকয়েক হোমরা চোমরা কর্ম্মচারী সব কিছুর তদন্তে। তিনখানি অফিসারস্-সেল্যুন প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছে, সকাল থেকে চলছে—চরম গবেষণা—"বারে বারে যাদু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার বাছাধন"?

বিরাট "এক্স, ই, এন অফিস নিঃস্তব্ধ। তদন্তকারী প্রভুদের সঙ্গে অফিসে প্রবেশ করলেন, রায় বাহাদুর তেজনারায়ণ সিং। রায় বাহাদুরের মুখ বেশ থম্‌থমে. সুনির্ম্মল রায়কে পরামর্শ দেবার জন্যে অনেকবার তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু একরোখা রায় সাহেব একবারও দেখা করেননি। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন সুনির্ম্মল রায়। অনেকে অবাক হয়ে যায় রায়সাহেবের ব্যবহারে—এত বড় একটা কাণ্ডতেও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নেই—এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু গোঁয়ার্ত্তুমি, রায় বাহাদুরের পরামর্শ নেওয়াই উচিৎ ছিল? হাজার হোক পাকা লোক তো বিশবছর ধরে চাকরী করে আসছেন, বহু ঝড় ঝাপ্‌টা খেয়েছেন, রায় বাহাদুর খেতাব তো আর গাছের ফল নয়।

প্রধান পরিদর্শকের প্রশ্নে রায় সাহেব নির্ভিক নিশ্চিন্ত ভাবে উত্তর দিলেন—"সমস্ত জিনিষ না হোক, কিন্তু বেশীর ভাগ কোথায় আছে তা আমি জানি"? রায় বাহাদুর চরম বিস্ময়ে বলে উঠলেন—"আমাকে এ কথা বলেননি কেন"? সুনির্ম্মল রায় নীরব রইলেন।

রায় বাহাদুর পুনরায় বললেন—নিজের ভবিষ্যত কি আপনি নষ্ট করতে চান মিঃ রায় ? এখনও বলুন কাকে আপনার সন্দেহ হয় ? রায় সাহেব. তেজনারায়ণ সিংয়ের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে বললেন—"আপনাকে !" কক্ষমধ্যস্ত সব কয়টী প্রাণী চমকে উঠলেন, আকস্মিক বজ্রপতনের চেয়েও বিস্ময় জনক এই উক্তি। প্রধান পরিদর্শক মন্তব্য করলেন—"আপনি বিশ্রাম নিন মিঃ রায়, মনে হয় অতিরিক্ত চিন্তায় আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন"। রায়বাহাদুর আরক্ত নয়নে চেয়ে রইলেন সুনির্ম্মল রায়ের দিকে। ধীরে ধীরে সুনির্ম্মল রায় উত্তর দিলেন—"সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়েই আমি অভিযোগ আনছি রায় বাহাদুরের বিরুদ্ধে. এই তার প্রমাণ মিঃ বর্ম্মাকে পূর্ণিয়ার "এস, পি" য়্যারেষ্ট করেছেন, তাঁর বাসা থেকে—এই সমস্ত জিনিষ পাওয়া গেছে। আরোও অনেক কিছু পাওয়া যাবে—রায় বাহাদুরের মাল বোঝাই "ওয়াগনে" যেটা কাঠিহারে আটক করা হয়েছে—"।

রায়বাহাদুর গর্জ্জন করে উঠলেন—"সমস্ত—সব কিছু একটা ষড়যন্ত্র, আমিও রায় বাহাদুর তেজনারাণ সিং আমি দেখে নেবো কত বড় বুদ্ধিমান এই"…।

৬৩

ব্যালাষ্ট ট্রেন গার্ড হয়ে অলোক ঘুরে বেড়াচ্ছে বেহারীগঞ্জ সেকশনে। মানুষের সঙ্গ তার কাছে আজ বিশ্রী বিষাক্ত—অথচ সে ছিল ভয়ানক গল্পপ্রিয় আমুদে। কিছুদিন পূর্ব্বে মুরলীগঞ্জের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে অভিনয় মঞ্চে এই পরিবর্ত্তন তার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। যে ভূমিকায় সে নাম কিনেছিল প্রচুর অথচ সেইটিই হোল সব চেয়ে প্রাণ-হীন ! অনেকে আশ্চর্য্য হলেও অলোক সম্পূর্ণ নির্বিকার, সুনাম সুখ্যাতিতে লোভ আর তার নেই।

শীতের অপরাহ্ন—পশ্চিম দিগন্ত থেকে তেজোহীন ময়ুখমালা 'গার্ড-ভ্যাণের ভিতরটাকে স্বর্ণাভ করে তুলেছে। অলোক গাড়ীর হাতল ধরে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মনে পড়ে কিছুদিন আগে, ঠিক এমনি সময়ে কি ভীষণ সে চঞ্চল হয়ে উঠতো বারহারা কোঠিতে ফিরবার জন্যে। দূরে বারহারা কোঠির সিগন্যাল দেখা যায়, অলোক সেইদিকে একবার চাইলো। বারহারা কোঠি নামটাও আজ কেমন ধারা কর্কশ কঠোর শুনায়, কিন্তু তার জীবন কাব্য রচিত হয়েছে তো ঐখানেই, শেষে কি আছে কে জানে, হয়তো বা বিয়োগান্তক...

বিচ্ছেদের সুর যেন সব দিকে বেজে উঠেছে, রেল-কলোনীর মাঝে এখন কেবল বিচ্ছেদ আর বিদায়। আজ বনমাংর্কি থেকে সে অনেক কথাই শুনে এসেছে, অনেককেই বিদায় অভিনন্দনও জানাতে হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে কোন দিন আর এই সব কর্ম্মসহচরদের সঙ্গে দেখা হবেনা। দুঃখ হয় ছকু সেন আর গোবিন্দ দত্তের জন্যে। রায় বাহাদুর অত বড় অপরাধ করে বেঁচে গেলেন, আর সামান্য কয়টা ভাঙ্গাচোড়া জিনিষের জন্যে বেচারীরা চাকরী হারালো। কিইবা এমন দাম ঐ ভাঙ্গা বালতি আর পুরানো 'হ্যাজাকের'। রায়বাহাদুর বড় চাকুরে তাঁরই প্রাপ্য ছিল বড় শাস্তি আদর্শ দণ্ড। বিচার শাস্তি সব কি শুধু দরিদ্রের বেলায়? সুনির্ম্মল রায় ভাগ্যবান পুরুষ! এত অল্পদিনে এতখানি উন্নতি ক'জনের বরাতে জোটে, পুর্ণিয়া মুরলীগঞ্জ কন্সট্রাকসনের আজ তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। পরিশ্রম আর সততার মূল্য অবশ্যই আছে কিন্তু সেই সঙ্গে ভাগ্যবলও থাকা চাই।

আজ কতদিন হোল, প্রায় দু মাস—দু'মাস অলোকা চলে গেছে। বসুদেববাবুও ঠিক সাত দিন আগে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায়

ফিরেছেন। সুরুচি দেবী যাবার পূর্ব্বে বার বার কালীকে পাঠিয়েছিলেন অথচ সে একবার দেখাটা পর্য্যন্ত করলো না। খুব অন্যায় করেছে সে, অলোকার অনুরোধ রক্ষা না করা অন্যায় বৈকি ? কেমন আছে অলোকা, ঘটনাচক্রে যদি দেখা না হোত তাদের তবে বেশ হোত, সে কোন দিন কল্পনার মাঝেও এমন আশা করতো না নিশ্চয়ই। জীবন কি কেটে যাবে মিথ্যা মৃগতৃষ্ণায় ?

সাঁওতাল কুলীদের মাটী ফেলার কাজ শেষ হয়ে গেল। এরাই সুখী—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করে যা পায় তাতেই তৃপ্ত, না আছে কোন আকাঙ্খা—না আছে কোন আশা। চমৎকার জীবন যাত্রা— ওয়াগনের মধ্যে চমৎকার সংসার চলছে এদের! দুঃখ বলে কিছু নেই—নিরবচ্ছিন্ন অভাবের মাঝে এরা দুঃখের অনুভূতিকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

"চা"য়ের জন্য অলোকের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে—সাজ সরঞ্জাম সবই আছে ইঞ্জিনে গরম জল ঠকবগ করে ফুটছে। না, দরকার নেই —। আজ দুবার সে বেশী খেয়েছে, অলোকার নিষেধ তাকে রাখতেই হবে। ইয়াসিন ড্রাইভার এসে দাঁড়ালো। অলোক বলে "কি বলবার ছিল তোমার" ? ইয়াসিন উত্তর দেয়—"কি আর বলবো বাবু—পাসিনজারের ডেরেভারী ছেড়ে এখানে এলাম অনেক ভরসা অরসা করে লেকেন"—। অলোক বুঝতে পারে ড্রাইভারের অভিযোগ, মাটী ফেলার কাজে ঠিকাদারের কাছ থেকে দুপয়সার আশা রাখে অনেকেই কিন্তু সে নিজে কিছু নেয় না তাই ইয়াসিন পড়েছে মুস্কিলে। প্রকাশ্যে বলে—"আচ্ছা যাও এখন, আমি বলে দেব"। ইয়াসিন সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

"কি দরকার ? রেলের চাকরীতে এসে চুরী করছেনা কে ? ফাঁকি দিচ্ছেনা ক'জন ? কিন্তু কেন এমন হয় ? উপায় নেই বলেই মানুষকে নীচে নামতে হয়। পেট ভরাবার মত সংস্থান যতদিন না জুটবে—ততদিন চলবে এই চৌর্য্যবৃত্তি আর ফাঁকি। স্বাধীন দেশে মানুষের দাম আছে—তাই সেখানে পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়। পরাধীন জাতির প্রতিস্তরে বাসা বেধেছে এই পাপ—তাই কেবল জোচ্চুরি আর ফাঁকি চলে আসছে নানারূপে নানান পন্থায়।

ক্যাম্প-খাটখানায় অলোক দেহ এলিয়ে দিল। এলো মেলো চিন্তার মাঝে কাণে এসে বাজে—দং দং দদং দং মাদলের আওয়াজ, সত্যিকার সুখী এই সাঁওতালেরা—পরিশ্রম, হাঁড়িয়া মাদল—চিন্তা আর দুঃখের লেশ মাত্র নেই.—এরাই দুনিয়ায় সুখী। চোখ দুটোয় নেমে এলো ঘুমের আমেজ—।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়—নেপালী চৌকিদার হরি বাহাদুরের ডাকে। 'চিঠ্‌ঠি, হ্যায় বাবু'। অলোক খামখানা খুলে ফেলে অবাক হয়ে যায়। একি লিখেছেন দ্বিজেন দা ! কাল সমস্ত দিন থেকে আজ সকাল পর্য্যন্ত সে ছিল বনমাংকিতে অথচ তার টেলিগ্রামখানা কেউ তাকে দিলনা। কিন্তু রাগ করবে সে কার উপরে মানুষের স্বভাবই হচ্ছে এই রকম পরের জন্যে কে মাথা ঘামায় ! দ্বিজেনদাকে—ধন্যবাদ অনেক চেষ্টায় তিনি হরিবাহাদুরকে পাঠিয়েছেন। সেলাম ঠুকে হরিবাহাদুর বিদায় নিল। অলোক—বসুদেব রায়ের টেলিগ্রামখানা বার বার পড়ে— "কাশীতে" যেতে হবে তাকে কিন্তু কেন ? অলোকের বুকের ভিতর দুর দুর করে ওঠে।—ভেবে কি লাভ ? ভাল—মন্দ—যাই ঘটে থাকুক, তাকে যেতেই হবে—সেখানে যে অলোকা রয়েছে।

৬৪

বসুদেব বাবুর কথাবার্তায় শঙ্কা দূর হলেও অলোকের মনে একটা খট্‌কা বাধে। চারদিন আগে কলকাতা থেকে বসুদেব বাবু সস্ত্রীক এখানে এসেছেন, কিন্তু কেন এসেছেন, কিংবা তাকে কেনই বা টেলিগ্রাম করা হোল কিছুই অলোক জিজ্ঞাসা করতে পারে না। বসুদেব বাবুর স্বভাব যেন বদলে গেছে আগেকার সেই হাসিমাখা মুখখানা গাম্ভীর্য্যে থমথমে। একটি ছোট বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীখানা থামলো, অলোকের মন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো—কি জানি কি ঘটেছে এখানে ?

প্রথমেই—দেখা হোল সুরুচি দেবীর সঙ্গে তাঁরও মুখ বেশ ভার। নেহাৎ ভদ্রতা বজায় রেখে তিনি যেন কথা বললেন। কি ব্যাপার অলোক বুঝে উঠতে পারে না, কালীচরণ নমস্কার জানালো তারও রুক্ষ চেহারা—আর মনমরা ভাব দেখে অলোক বিস্মিত হয়ে যায়। বসুদেব বাবুর প্রশ্নে অলোক অবাক হয়ে যায়, তার মানে কি, অলোকার কাছে যাবো কি না ? অলোকার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, অসুখ বিসুখ কার না করে, আর তা ভিন্ন এঁরাতো রোগের ভয় কোন দিন করেন না। হঠাৎ বসুদেব বাবু বললেন—শোন! অলোক মুখতুলে চাইলো 'অলোকার বসন্ত হয়েছিল, এখন ভাল আছে, কিন্তু'—ক্ষণকাল থেমে পুনরায় বসুদেব বাবু বললেন "কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এই ঘরেই আছে।" দরজা থেকে বসুদেব বাবু বিদায় নিলেন।

একি দেখছে অলোক! শুভ্র শয্যার উপর বিছানো রয়েছে যেন এক রাশ ঝলসানো নীল অপরাজিতা!

ক্ষীণ কণ্ঠে অলোকা বলে—'বস' অলোক শয্যায় উপবেসন করলো। 'আজ ঠিক ভেবেছি তুমি আসবে'ই'। অলোক এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে—একি সেই অলোকা না অন্য কেউ।

'চুপ করে কেন' ? অলোক ঠিক করতে পারেনা কি বলবে সে। 'কই কোথায় তুমি' ? 'এই যে' ? অপেক্ষাকৃত এগিয়ে গেল অলোকা। অলোকা গ্রহণ করলো অলোকের ডান হাতখানা—'উঃ ! কি রকম রোগা হয়েছ তুমি ! অসুখ করেছিল না কি' ? 'না তো'।

'না আবার, হাতের গিঁট বেরিয়ে গেছে যে ? সময় মত খাওয়া হোত না বুঝি ?'

সুরুচি দেবী প্রবেশ করতেই অলোকা বলে 'দিদি, এখানেই চা পাঠিয়ে দাও কেমন ? তুমি যাও দিদির সঙ্গে হাত মুখ ধুয়ে এসো এখুনি, অনেক কথা আছে।' অলোক অবাক হয়ে যায়—দৃষ্টিশক্তি নেই কিন্তু সুরুচি দেবীকে কি করে দেখতে পেল সে ! "যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো"—অলোক উঠতে চায় না—'চা আর খাবোনা এখন'। 'কেন' ? 'সমস্ত রাস্তায়তো কেবল চা'ই খেয়েছি' সুরুচি দেবী চলে গেলেন। অলোকা জিজ্ঞাসা করলো 'সেদিনের কথা মনে আছে' ? অলোক বুঝতে না পেরে বলে 'কি'? 'আসার দিন রাত্রের কথা' ? 'হ্যাঁ' 'এখন বল কি করবে তুমি, আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি' ! অলোক নিঃশব্দে বসে থাকে।

পুনরায় অলোকা প্রশ্ন করলো, 'ভাবছ ! আমিও অনেক ভেবেছি কোন কূল-কিনারা পাইনি। জানি আমাকে নিয়ে তোমাকে ভুগতে হবে তবু'—হঠাৎ অলোকা চমকে ওঠে—এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু পাতে অলোকার মর্ম্মের দহন যেন অনেক খানি কমে যায়। উভয়েই নির্ব্বাক, বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। অকস্মাৎ অলোকা হেসে উঠলো 'দেখেছ, সব কেমন ভুলে যাই ? কতবার মনে করেছি এলে পরেই বলবো অথচ একেবারে ভুলে গেছি। শোন শোন, বারহারা কোঠিতে তো তুমি গল্প শোনাতে ? আজ আমি একটা বলবো।' অলোক নিষেধ

করে 'এখন থাক পরে শুনবো' অলোকা রাজী হয় না, 'না এখুনি শোন, যার জন্যে আমার চোখ গেল সে গল্প এখুনি শুনতে হবে'।

অলোক শোনে অনেক বৎসর আগেকার একটি ঘটনা, যা বাঙলা দেশে প্রায়ই ঘটে—সংবাদ পত্রে কত রকম শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।—"প্রাণের ভয়ে টাকা পয়সা সব তুলে দেওয়া হোল ডাকাতদের হাতে বুঝলে? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি করলো জানো? তারা যাবার সময় মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ীর বিধবা ছোট বৌকে। ডাকাত দল চলে যাবার পর অনেক লোক জুটলো, অনেকক্ষণ ধরে জটলা চললো। একজনের সঙ্গে কিন্তু ঝগড়া বেধে গেল গ্রাম শুদ্ধ লোকের। শেষ পর্য্যন্ত সেই ভদ্রলোক, বন্ধুকে আর কয়েকজন ছেলে ছোকরা নিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট বউকে উদ্ধার করতে। ভোরের দিকে সবাই ফিরলো, সেই ভদ্রলোকটির কাপড় জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে। আবার জটলা আরম্ভ হোল, নানা লোকে রকম রকম কথা বলে, ছোট বউ এর চরিত্র না কি ভালো নয়, তা না হলে গাঁ'য়ে এত থাকতে ওর ওপর নজর গেল কেন'? অলোক বলে 'থাক আর বলতে হবে না'। 'না না সবটুকু শুনতে হবে, এইকাহিনীটুকুর দাম হচ্ছে আমার দুটো চোখ, জানো তো? একথা বাবা কাউকে বলেননি, দিদিও আগেকার মায়ের সন্তান'।

অলোকা চুপ করে যায় দীর্ঘ শ্বাসপ্রঃশ্বাসে তার দুর্ব্বলতা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। অলোক বলে—'আমি অন্যায় করেছি, সে দিন কার সেই কথার জন্যে আমি আজ তোমার বাবার কাছে ক্ষমা চাইবো' —'না না তুমি অন্যায় কিছু করনি, জানো? আমার মা কিন্তু সত্যিই বাবার বিবাহিতা স্ত্রী নন, মানে সমাজের ওপর রাগ করেই মন্ত্র আর পুরোহিতের অভিনয় তিনি করেন নি। বল এবার সেদিনকার সেই

কথা কি রাখতে পারবে? সারা জন্ম অন্ধকে নিয়ে চলা বড় বিড়ম্বনা, সব ভেবে উত্তর দাও?'

অলোকার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে অলোক অনেক কথা বলে যায়। অলোকার রোগজীর্ণ মলিন মুখ আনন্দে ভরে ওঠে—'আঃ বাঁচালে তুমি, তোমাকে আমি জানি তবু তবু তো অন্ধ হয়ে গেছি'। 'এখন নিশ্চিন্ত হোলেতো? বেশ তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ তারপর তোমাকে আমি নিয়ে যাবো'—'দেখতো বাইরে বোধ হয় বাবা যাচ্ছেন, ডাকো—ডাকো তুমি'।

বাপের উপর অলোকা চটে যায়। রোগে ভুগে তার মেজাজ ভীষণ রকম রুক্ষ হয়ে উঠেছে অথচ সে ছিল ধীর স্থির বিনম্রা। 'না বাবা, ভাল হয়ে দরকার নেই, আজই সব শেষ হয়ে যাক'। হরপ্রসাদ বাবু চলে গেলেন। 'কেমন ঠিক করেছি তো? ভাবছো খুব বেহায়া হয়েছি না? ম্লান হাসি হেসে অলোকা বলে, 'লজ্জা করে কি লাভ বল? চোখ নেই তার আবার চক্ষুলজ্জা। যাঃ একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, বড় ভুলো মন হয়েছে আমার। যাও বাবাকে বলে এসো, শুধু দান করতে যা দরকার তা ভিন্ন একটি আধলাও নেবেনা তুমি। বাবার অনেক টাকা আছে সমস্ত বাবারই থাক, আমরা কিছু চাই না। জ্বরের সময় কি দেখেছি জানো?' 'কি?' 'সেই বারহারা কোঠির ব্যাপার বাবার জোচ্চর শব্দ শুনে তোমার সেই পাগলের মত মূর্ত্তি।'

দুধের গেলাস নিয়ে সুরুচি দেবী বিছানায় এসে বসলেন, 'যাও ভাই এবার স্নান করে একটু সরবৎ খেয়ে এসো, ওঘরে সব ঠিক করে রেখেছি। অলোকা মুখের কাছ থেকে দুগ্ধ পাত্র নামিয়ে ফেললো, 'আজ তো আমাকেও কিছু খেতে নেই, না দিদি?' 'দুধ আর সরবতে দোষ নেই ভাই, তাতে কাশীধামে সবই চলতে পারে।

অলোকা হাসতে হাসতে বলে —'খুব বেহায়া হয়ে উঠেছ না দিদি।' 'কেন ?' 'কি সব কাণ্ড করছি দেখছনা ? যতদিন চোখ ছিল ততদিন কাউকে কিছু বলিনি, আজ – আজ আমি প্রাণ হালকা করে সব বলবো।' অলোকার দৃষ্টিহীন চক্ষু দুটি জলে ভরে উঠলো।

৩৫

গোধূলি লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল, সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বিবাহ। হরপ্রসাদ বাবু প্রজ্জলিত হুতাশন ও নারায়ণশিলা সম্মুখে রেখে মন্ত্রপাঠ করে অলোকার বাম হাতখানি তুলে দিলেন অলোকের হাতে। অলোক সীমন্তে এঁকে দিল আয়তীচিহ্ন অলোকের অর্থে রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রায় জন পঞ্চাশেক অনাথ বালকের দল বর-কন্যা উভয় পক্ষের হয়ে ভোজ পর্ব্ব সমাধা করে গেল।

সুরুচি দেবী আজ অনেকক্ষণ ধরে অন্তরালে চোখের জল ফেলেছেন-- একি বিবাহ না আছে উৎসব না আছে সমারোহ—চোরের মত চুপে চুপে তার স্নেহের অলোকার বিবাহ হয়ে গেল। সব চেয়ে বেশী আঘাত তিনি পেয়েছেন অলোকা তাঁর সহোদরা নয় জেনে। যাক অলোক—অলোকার বিবাহতো শেষ পর্য্যন্ত হোল, ভগবান এদের দেখবেন।

শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রি, বিশ্বনাথের বারানসী উৎসবে মত্ত। অলোকা কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়, অলোক সব কথার উত্তর ঠিক মত দিতে পারেনা, অলোকা চটে ওঠে। ঘুমে অলোকের দু চোখ জড়িয়ে আসছে দু রাত্রি তার চোখে ঘুম নেই, তারপর এই দীর্ঘপথ পর্য্যটন, ক্লান্তিতে অবসাদে অলোক যেন নির্জ্জীব হয়ে পরেছে। 'ওগো শুনছ' অলোক সাড়া দেয় না। গায়ে হাত দিতেই অলোক উঠে বসলো 'কি বলছ ?' 'খুব ঘুম এসেছে না ?' 'নাঃ'—'দেখ বারহারা কোঠির কোয়ার্টারটা তুমি

কিনে নাও। ওটা পেলে আমার কোন অসুবিধে হবে না। এই তো দক্ষিণ মুখো ঘর দুখানা, এই হোল গিয়ে বারান্দা তারপর এই উঠোন—রাস্তা দিয়ে একটু গেলেই বাগান অন্য দিকে মাঠ, তারপরই তোমার সেই বাসা, দেখছ তো কেমন সব মনে আছে, অন্ধ হলে কি হবে সব আমি দেখতে পাচ্ছি।' অলোক তখন বসে বসেই নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 'তুমি কিছু বলছ না কেন? আজতো লোকে কেবল গল্প করেই কাটায়। কি হোল তোমার, আগেকার মত গল্প করতে আর বুঝি ভাল লাগেনা?' তবু উত্তর আসে না অলোকার সন্দেহ জাগলো, ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দেহে হাত দিতেই ঘুমন্ত অলোক হাতখানা সরিয়ে দিল। অলোকা সরে এলো সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে উঠলো দুর্জ্জয় অভিমান।

আজকের প্রথম দিনেই এতো, সারা জীবন তো পড়ে আছে? অভিমানে অলোকা ভুলে গেল অলোককে। দয়া! দয়া করে কি তাকে অলোক শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করলো? অনেক কথা মনে পড়ে অলোকার, অলোকের মুখখানা যেন তার মনের মধ্যে গাঁথা আছে, না না তা হতে পারে না, আহা বেচারী দু'তিন দিন না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, বারহারাকোঠি কি এখানে? বাবাঃ যাকে বলে পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ! সুরুচি দেবী মাথার কাছে এসে ডাকলেন, অলোকা সাড়া দিল না, সুরুচি দেবী ভাবলেন মনের শান্তিতে অনেকদিন পর অলোকা আজ আরামে ঘুমুচ্ছে। "অলোক কি জেগে আছ?" অলোকেরও উত্তর নেই। সুরুচি দেবী মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করে মশারী বেশ ভাল করে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন। আজ যদি অলোকা অন্ধ না হোত তবে এই বিয়ের রাতে কি আমোদই না হোত, কত লোকজন—কত কলরবে সমস্ত রাত্রি কেটে যেতো যে।

*　　*　　*　　*

একটা অব্যক্ত কাতর ধ্বনিতে অলোকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। 'কি হোল? কি হোল তোমার'! অলোকা কথা কয়না, যুক্ত কর পুটে সে কেবল কার উদ্দেশ্যে মিনতি জানায়, গায়ে হাত দিতেই অলোকা ফুঁপিয়ে ওঠে, অলোক বুঝতে পারে অলোকা স্বপ্ন দেখছে। সন্তর্পনে অলোকার মাথা জানুর উপর তুলে নিল অলোক। অলোকার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে, কথা বলার চেষ্টায় ঠোঁট দুখানা ঈষৎ কেঁপে উঠলো। অলোক বলে, "কি হোল—খুব স্বপ্ন দেখেছিলে তো"? তবু অলোকা কথা বলতে পারেনা হাত দুখানা কি যেন খুঁজে বেড়ায়। "কি খুঁজছো"? অলোকের একখানা হাত দুহাতে চেপে ধরলো অলোকা কয়েক মুহূর্ত্তে পরে শিথিল বাহু দুটি আপনা হতেই শয্যার উপর পড়ে গেল।

অলোক তাড়াতাড়ি নাড়ী পরীক্ষা করে একটিবার মাত্র ডাকলো ছোট্ট একটি ডাকে, যে নামে কোনদিন সে ডাকেনি তার প্রিয়া তার প্রিয়তমাকে—'অলোকা!"

হায় কে দেবে উত্তর, অলোকার প্রাণহীন দেহ আছে কিন্তু সে যে চলে গেছে কোন অলকায়।

অলোকার হিমশীতল কপোলে অলোক এঁকে দিল এই প্রথম আর শেষ চুম্বন। অলোকের মনের মধ্যে কেবল একটি প্রশ্ন জাগে, এমন করে কেন চলে গেলে অলোকা? আমি তো কথা দিয়েছিলাম আমার সমস্ত কিছু, চক্ষু স্পর্শ স্নেহ সমস্ত কিছু দিয়ে তোমায় বহন করবো জীবন ভোর—তবে কেন চলে গেলে তুমি?

গাঢ় তমিস্রা রজনী শেষ হয়ে আসে, পূর্ব্বতোরণে জেগে ওঠে উষার অরুণিমা। অলোকের মনে পড়ে 'রাজগৃহে'র ঠিক এই দিনটির

কথা। সেই তিথি, সেই সময় সেই সব, কিন্তু কত প্রভেদ! সেদিন অলোকা এসেছিল জীবনের আনন্দ নিয়ে উৎসাহ নিয়ে, আর আজ সে চলে গেছে. পড়ে আছে তার নিঃসাড় দেহলতা।

এত বড় বিশ্বে অলোক আজ সত্যই একা, এত বড় শূন্যতা এত খানি ব্যথা, এমন মর্ম্মন্তুদ বেদনা জীবনে অনুভব করেনি অলোক।

৬৬

মানুষ মরণশীল—জীবন অচিরস্থায়ী, তথাপি মানুষ মৃত্যুকে ভুলে হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-মমতা দিয়ে অনেক আশায় ঘর বাঁধে। অলোকও বহু আশায় ঘর বাঁধবার জন্য মেতে উঠেছিল। অলোক ও জানে মরণের অনতিক্রমণীয় কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস সহ্য করা ভিন্ন উপায় নেই, মন কিন্তু বোঝেনা তার। সব সময় তার মনে পড়ে অলোকার অম্লান অনুরাগের কথা, সে নিজেও তো কম ভাল বাসতো না তাকে, কিন্তু কিছুই তো করতে পারলোনা সে, চোখের উপর নিঃশেষ হয়ে গেল অলোকা। সত্যই মানুষ বড় দুর্ব্বল বড় অসহায়।

দেহের শ্রেষ্ঠঅঙ্গ দুনিয়ার পরশমণিতো চক্ষু, যার অভাবে পৃথিবীর অম্লান সৌন্দর্য্য শুধু অন্ধকার, নিকষ কালো অমানিশার চেয়েও ভয়ঙ্কর, সেই শ্রেষ্ঠরত্ন দুটিতো মৃত্যুর পুর্ব্বেই হারিয়েছিল অলোকা। ভালই হয়েছে, জীবনব্যাপি দুঃখ-যন্ত্রনা উত্তীর্ণ হয়ে অলোকা চলে গেছে,—অলোক তাকে স্বার্থের খাতিরে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি—ভালই হয়েছে! অলোক বহু প্রকারে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, তবু অবোধ মন বোঝেনা যেন এক গভীর হতা-শায় হাহাকার করে ওঠে। শুধু আজ অলোকা নেই

আরতো সবই আছে, বনানীর শ্যামশীর্ষকে মোহনীয় করে নীরবে সূর্য্য উঠছে, নীরবচন্দ্র তার মধুর কিরণে স্নান করিয়ে দিচ্ছে বিশ্বজগৎকে, সেই সবই আছে—সবাই আসছে যাচ্ছে,—দীপ্ত দিবা, তিমির রাত্রি, সবই তো সেই প্রাচীন ধারায় আসা যাওয়া করছে, ব্যতিক্রম কেবল কি অলোকের বেলায় ? অলোকা চলে গেছে আর আসবেনা কোন দিন।

অলোক বসে বসে ভাবে কি করা যায় অতঃপর! অনেকে চলে যাচ্ছে কালুখালিতে, সুবোধ ঘোষ অনেককেই ডেকে পাঠিয়েছেন। না—চাকরী আর নয়, কি প্রয়োজন এই দাসত্বের। আজ সকালে তাকে বারহারা কোঠিতে যেতে হয়েছিল, ডাঃ রায়ের আসবাব পত্র, যা তার কাছে ছিল—সেগুলি আনবার জন্যে। বারহারাকোঠির ডাক্তার কোয়ার্টারের চারিপাশে অনেকক্ষণ ধরে সে ঘুরে বেড়িয়েছিল, যেমন লোক চেয়ে থাকে বিগ্রহ শূন্য—পরিত্যক্ত দেবালয়ের পানে গভীর সহানুভূতিতে।

সকাল বেলার ভাব-প্রবণতাটুকু পরিষ্কার মনে পড়ে তার। অলোকার রোপিত বাতাবী লেবুর শিশু বৃক্ষের কিশলয় গুলি—বাতাসের স্পর্শে যেন দামাল ছেলের মত তাকে দেখে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। অলোক তার চারদিকে বেড়া দিয়ে এসেছে,—সামান্য কঞ্চি, কতটুকু তার শক্তি—কতটুকুই বা তার পরমায়ু? অলোক একটুখানি হেসে উঠলো আপন মনে।

উৎসব মুখরিত বনমাংকি তার ভাল লাগেনা। কাল থেকে বিহারীগঞ্জ 'সেকসনে' ট্রেণ চলাচল সুরু হবে, এতদিনে পূর্ণিয়া-মুরালীগঞ্জ লৌহপথ সম্পূর্ণতা লাভ করলো। প্রত্যেক ষ্টেশনে

নূতন নূতন লোক এসেছে, অথচ যারা নূতন রেলপথ গড়ে তুললো তাদের এবার বিদায় নিতে হবে। কত সব আমোদের ব্যবস্থা হয়েছে, বিদায়ের পূর্ব্বে শেষ মিলনের বেশ চমৎকার সমারোহ। অলোক থাকছে কেবল দূরে দূরে, মৌখিক সহানুভূতি শোনার মত ধৈর্য্য তার আজ নেই।

চারিদিকে লোকজন যান-বাহন কত এসে জুটেছে, অথচ এইতো কিছুদিন আগে কিছুই ছিল না এখানে, তাম্বুতে একা থাকতে রীতি-মত গা ছমছম করতো। সেই নির্জ্জন প্রান্তর আজ 'জংসন-ষ্টেসন', কালে হয়তো নগর গড়ে উঠবে।

'এখানে বসে আছেন বুঝি'? অলোক ফিরে চাইলো তারাপদর দিকে। নির্ব্বোধ তারাপদকে উত্তর দেওয়া নিস্প্রয়োজন। তারাপদ দাঁত বের করে বলে, "যাত্রা শুনতে যাবেন তো? খুবভালো দল চন্দনগড় নাট্য সমাজ, কালকে 'ভাগ্যদেবী' খুব জমেছিল'। 'না'। 'আচ্ছা আমি যাই,—সবাইকে নিয়ে যেতে হবে, আগে থেকে না গেলে ভাল যায়গা পাওয়া যায় না'। তারাপদ চলে গেল।

রাণুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে 'তারাপদর'। অলোক মনে মনে হাসে, সেই রাণু যার সাজ পোষাক চাল-চলন ছিল সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের, তার সঙ্গে বিয়ে হোল তারাপদর। তারাপদ,—যাকে ষ্টোর-কিপার আদর করে ডাকতেন 'ইডিয়ট' নামে। কিন্তু রাণুতো বেশ আছে,—আজ সকালে তাদের বাসায় খেতে গিয়ে তারতো—বেশ হাসি-খুসি ভাব, দেখে এসেছে সে। এমনিই হয়, একেই বলে ভাগ্য। অলোক আপন মনে ভেবে চলে, তার ভবিষ্যৎ সংসারের জল্পনা—কল্পনার কথা, একটি একটি করে মনের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে, অলোকার সঙ্গে কত পরামর্শ হয়েছিল, অথচ একটি আশাও পূর্ণ

হোলনা। অলোকা থাকলে সে দেখিয়ে দিত শান্তিময়-সুখপূর্ণ সংসার কাকে বলে। তারাপদ সংসারের কি জানে, সরল গো-বেচারী, 'গাধা বোট' টাকে নিশ্চয়ই রাণু টেনে নিয়ে যাবে, খুব বুদ্ধিমতী যে রাণু।

দূর থেকে ভেসে আসে যাত্রাদলের ঐক্যতানের সুর, এই গৎ সে বহুবার শুনেছে, হ্যাঁ সেই গানখানা বাজছে—'শ্বেত শতদল বাসিনী'...। ছেলে বেলায় যাত্রা শোনার কি সখ্ই না ছিল তার, সেবার গোকুলপুর রাজ বাড়ীতে যাত্রা শোনার জন্যে কি কাণ্ডই না সে করেছিল।

'গগনামারা' 'রাধাবাগান' সুধাংশু বাবুর ভাঙ্গা বাড়ীর পাশ দিয়ে একলা অতরাত্রে যাওয়া কি সোজা কথা, হরিণ ডাঙ্গা থেকে গোকুলপুর কম দূর তো নয়। হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলোক পাতে অনেকখানি স্থান আলোকিত হয়ে উঠলো। মুরলীগঞ্জ গামী ট্রেনখানা একটু দূরে থেমে 'হুইসেল' দিতে দিতে পরক্ষণে সচল হয়ে উঠলো। সিগন্যালের নীল লাল আলো দূর থেকে বেশ দেখায়। অলোক উঠে দাঁড়ালো আর বসে থাকা ঠিক নয়।

অগ্রদ্বীপের ভাগ্যান্বেষী নুটুময়রার দোকানের সামনে অলোক দাঁড়ালো, নুটু রামায়ণ পড়ে চলেছে—দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, গোদাবরী তীর—গিরি গুহা—তপোবন্, সকল স্থানে একবার দেখেও আশা মিটেনা বহুবার ভুলক্রমে অন্বেষণ করেন। পূর্ণ ব্রহ্ম-সনাতণ রঘুমনি রাম, আজ শোক বিহ্বল। নুটু বেশ গলা কাঁপিয়ে পড়ে চলেছে—

—'চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥—

অলোক একমনে শোনে মহাকাব্যের করুণ আখ্যান, রামায়ণ এত

মধুর এমন অপরূপ তার কোন দিন লাগেনি। রঘুনাথের আজ জগৎ সংসার শূন্য, চন্দ্র সূর্য্য তাঁর মনের অন্ধকার দূর করতে অপারক।

অলোক ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে, কানে এসে বাজে, "হে অরণ্য তুমি ধন্য.....................রাখহ জীবন"। রামচন্দ্রের তবু আশা ছিল, কিন্তু অলোকা সত্যিই নেই, নিজেই তো সে মনি-কর্ণিকায় সব ভস্মীভূত করে এসেছে। সহসা অলোক থমকে দাঁড়ালো, 'কতদিন হোল ?' মনে মনে হিসেব করে দেখে, 'ঠিক আজ তেরদিন', তেরদিন পূর্বে এমন সময় অলোকা বেঁচে ছিল এ পৃথিবীতে। শ্রাদ্ধ ? শ্রাদ্ধ করতে হবেতো অলোকার ? অলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে, 'অলোকার শ্রাদ্ধ' ! নিশ্চয়ই করতে হবে, এযে কর্ত্তব্য এযে ধর্ম্ম, কাল সকালের ট্রেনেই সে চলে যাবে পুনিয়ায় পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে।—

৩৭

শ্যাওড়া নদী তীরে অলোকার শ্রাদ্ধ পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। অলোকাকে 'প্রেত' নামে আহ্বানের সময়, একবার মাত্র সে বিমনা হয়ে উঠেছিল, না না পণ্ডিত মশাই কখনও ভুল করতে পারেন না। অলোক নিজেকে সামলে নিল, পিণ্ড দানের সময় হাতখানা কিন্তু বেশ কেঁপে উঠেছিল তার, অলোকা কি সেটা গ্রহণ করেছে তার হাত থেকে সাগ্রহে !

স্নানের সময় অলোকের মনে খোঁচা দিতে থাকে কি যেন একটা একান্ত করনীয় কাজ, তার অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। নদীর শীতল জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অলোক চিন্তা করতে থাকে, অলোকের কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে 'রাঙ্গাদি'র শেষ আর প্রথম চিঠি খানার কথা—'জীবনটা জ্বলেপুড়ে গেল ভাই, তাই নিজেকে

আগুনে সঁপে দেবো। ··· ·····জানি কত অপরাধী আমি, তবু ক্ষমা চাইছি, পার তো ক্ষমা ক'রো। তোমাদের সারদাবাবুকে মরণের পরও সমানে ঘৃণা করে যাবো·········তোমার হাতের শাস্তি জলে·········।"

অঞ্জলি ভরে নদী জল তুলে অলোক মনে মনে বলে—'শান্তি পাও রাঙ্গাদি, তৃপ্ত হও রাঙ্গাদি।' লোকান্তরিতা রাঙ্গাদি যেন আজ সত্যিই তার আপনার জন। যাক মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্য, সত্যিকার ধর্ম্ম যেন পালন করলো সে। আজ আর রাঙ্গাদির উপর তার ঘৃণা জাগে না, কেরোসিনের শিখা সমস্ত জাগতিক পাপ থেকে রাঙ্গাদিকে যেন নিষ্পাপ করে দিয়েছে। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল 'ষ্টোভ' বিদীর্ণ হয়ে রেল কর্ম্মচারী সারদা গোস্বামীর স্ত্রী, ক্ষণপ্রভা দেবী শোচনীয় ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন।

তীর থেকে সীতা ডাকে—'কতক্ষণ জলে থাকবে দাদা, অসুখ করবে যে?' অলোক ধীরে ধীরে উঠে আসে। অনেক কাজ, অনেক কাজ এখনো বাকী। দরিদ্র নারায়ণের দল বসে আছে, সীতা রান্না করেছে অলোকার সমস্ত প্রিয় খাদ্যবস্তু গুলি। অনাহারক্লিষ্ট রুগ্ন-রুক্ষ কেশ শিশু নরনারী ভীড় করে বসে আছে পণ্ডিত মশাইয়ের গৃহপ্রাঙ্গনে।

অলোক পরিবেশন করতে করতে বলে— আস্তে আস্তে খাও তাড়া-তাড়ি কোর না।' ক্ষুধাতুরের দল তার কথায় কান দিতে রাজি নয়, পরস্পর পরস্পরের শাল পাতার দিকে চেয়ে ক্ষিপ্র বেগে হাত চালিয়ে যায়। ভাগ্যকে তারা বেশ চেনে তাই পরের কথায় ভরসা হয় না তাদের। প্লীহা-ভারাক্রান্ত বালকের অবস্থা দেখে অলোক শঙ্কিত হয়ে ওঠে। 'থাক আর খাস না, বেঁধে নিয়ে যা।' 'নেহি মহারাজ, আউর থোড়া দিজিয়ে না।' আহার শেষে দক্ষিণাঅন্তে সানন্দে চলে যায়

হতভাগ্যের দল—সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-শালিনী ভারত-জননীর চির অবহেলিত সন্তান-সন্ততি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, আকাশে ফুটে ওঠে ম্লান নক্ষত্র রাজি, অলোক ঊর্দ্ধ দেশে চেয়ে থাকে। জীবনের পরপারে সে কি তার দৃষ্টি ফিরে পায় নি ? মৃত্যুর পর তো হারানো সব, ফিরে পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই অলোকা তার আয়ত আঁখির কালো তারা দিয়ে নিমে চেয়ে আছে তার দিকে। পৃথিবীতে অলোকা নেই কিন্তু সে তো বেঁচে আছে, অলোকের আঁখি তারকায়—অলোকা বেঁচে থাকবে চিরকাল অলোকের হৃদয়ের মাঝে একান্ত গোপনে, মৃত্যু এখানে পরাজিত। নিস্পন্দ অলোক নিস্পলক নেত্রে চেয়ে থাকে ঊর্দ্ধে।

'দাদা !' সীতা খুঁজে খুঁজে আবিস্কার করলো অলোককে। সীতা আজ কেবল তাকে চোখে চোখে রাখছে, সব সময় কাছে কাছে থেকে, কন্যা ভগিনী মাতার, মায়া মমতা স্নেহ দিয়ে অলোককে সান্ত্বনা দিতে চায়। পণ্ডিত মশাইয়ের আহারের পর অলোক প্রণাম করে পদতলে রাখলো একটি শুষ্ক হরিতকী ব্রাহ্মন ভোজনের দক্ষিণা, নীলাম্বর কাব্যতীর্থ নির্লোভ আর্য্য—সত্যিকার ব্রাহ্মণ, হরিতকীই তাঁর উপযুক্ত দক্ষিণা। সীতা মিনতি করে—'একটু কিছু মুখে দাও।' অলোক বলে "ক্ষিধে যে নেই"।—পরক্ষণে মনে পড়ে অলোকার কথা তার অনুরোধ—"ক্ষিধে যদি না থাকে তবু কিছু মুখে দেওয়া উচিৎ পিত্তি যেন না পড়ে।' অলোক বলে "আচ্ছা সামান্য কিছু দাও।' অলোকার কোন কথা অলোক যেন আর ঠেলতে পারে না এখন।

৩৮

ষ্টেশনে এসে অলোক ভাবে দুদিন আর থাকলেই হোত ! কিন্তু সেদিনও সীতা ঠিক এ ভাবেই বাধা দিত, ভালই করেছে চলে এসে।

বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে ছোট বোন যে ভাবে স্নেহময় সহোদরকে অভিমান অনুযোগ অনুনয় দিয়ে আটক করে, সীতাও আজ দুদিন ধরে সেইরূপে বাধা দিয়েছে অলোককে, শেষ পর্য্যন্ত বিদায় বেলায় দেখাটা পর্য্যন্ত করেনি। সীতার জন্যে অলোকের মন ব্যাথায় ভরে যায়, এত রূপ এমন শিক্ষা-সব ব্যর্থ এ জন্মের মত। পণ্ডিত মশাইয়ের পর, কে দেখবে বেচারীকে ; সীতার ভাসুর মুক্তারাম বাবুকে পেলে, সে বেশ করে ঘা-কতক কষিয়ে দিত। কি শয়তান এই লোকটা! কাগজ পত্রে সই করিয়ে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ চাপালো বিধবা ভ্রাতৃজায়ার স্কন্ধে। বাইশ বছরের ছেলে হোল তার দুগ্ধ পোষ্য শিশু, আর বেচারী সীতা হোল চরিত্র-হীনা কলঙ্কবতী! বেশ করেছে সীতা—সেই লম্পটের কান কামড়ে দিয়ে, আরো ভালো হোত-যদি পারতো গুনধরের জন্ম-দাতার দুটো কানই ছিঁড়ে ফেলতে, বেশ মজা হোত, গ্রামের লোকেরা ডাকতো দু কান কাটা বলে। পণ্ডিত মশাই স্থির করেছেন কোথাও কোন আশ্রমে পাঠিয়ে দেবেন সীতাকে। বেশীর ভাগ আশ্রমইতো দ্বিতীয় নরক বিশেষ, কিন্তু সীতা হচ্ছে অগ্নিশিখা—বড় শক্ত মেয়ে, পাবক শিখায় পুড়ে মরবে পতঙ্গ সব।

মুরলীগঞ্জ—মিক্সড ট্রেনখানা এসে দাঁড়ালো। ওঃ কত প্যাসেঞ্জার ; গাঁও বালারা' আনন্দ যাত্রায় বেরিয়েছে বোধ হয়। অনেক লোকই তো তার চেনা, ঐ তো মিশিরজী আর পুলিন ডাক্তার, কাটিহার যাচ্ছে নিশ্চয়ই। ড্রইং অফিসের জীবন মুখোপাধ্যায়ও সস্ত্রীক চলেছে, ভদ্রলোকের কপাল ভালো—এখানকার চাকরী খতমের সঙ্গে সঙ্গে কাজ জুটি'য়েছে ডিগবয়ের তেলের খনিতে। এই ট্রেনেই চলে যাবে নাকি সে? নাঃ পরিচিতদের সঙ্গে আর দেখা না করাই

ভালো, তার ব্যাপার তো চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে দেখা হলেই কি আর রক্ষে থাকবে, বাল্মিকী মুনি রূপে আরম্ভ করে দেবে নূতন রকমের অনুষ্টুপ ছন্দঃ। ট্রেনের দিকে অলোক সস্নেহে চেয়ে থাকে, ট্রেন খানার সঙ্গে ভেসে ওঠে সুদীর্ঘ চার বৎসরের কত স্মৃতি। আজ এই বাষ্পীয় শকট যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথের প্রতিটী স্থান তার নখ দর্পনে।

বাক্স বিছানা মাথায় নিয়ে ছুটে চলেছে দুটো কুলি, পিছনে এক যুবকের সঙ্গে অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, বধূটী কেবল চোখ মুছছে। সঙ্গের ঐ ফ্রক পরা মেয়েটি নিশ্চয় বালিকা বধূর কনিষ্ঠা ভগিনী, মুখের আদলে বেশ বুঝা যায়। ভাই বোনেরা বেশ হেসে হেসে কথা বলছে কিন্তু চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বেশ ছলছলে ভাব। অলোক ভাবে তার দিদি যখন শ্বশুর বাড়ী যেতেন তখন দধিকর্ম্মা করার সময় কি রকম ফুলে ফুলে কেঁদে উঠতেন তিনি, সে নিজেও চোখের জল মুছে দুর্ব্বলতাকে আড়াল করেছে কতবার। আজকালকার নববধূদের মন কিন্তু বেশ শক্ত। এতখানি দৃঢ়তা অলোকের ভাল লাগেনা মায়া মমতায় ভরা পিতৃগৃহ ছেড়ে যেতে যাদের চক্ষুদুটি অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে না, তারা নিষ্ঠুর, তারা হৃদয়হীনা—তাদের উপর কেমন যেন একটা বিরূপ ধারণা জন্মে যায় অলোকের।

অলোকের মনে হোল ঠিক এই বধূটির মত সেও তো একদিন এখান থেকেই নিয়ে যেতে পারতো অলোকাকে, অলোকা কি করতো তখন? তার মাতৃসমা দিদি নিশ্চয়ই ষ্টেশনে বিদায় দিতে আসতেন। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন খানা ছেড়ে দিল। ভাই বোনেরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, বধূটী জানলা থেকে মুখ বার করে দেখছে, এখন আর কোন বালাই নেই দু'চোখে ধারা বয়ে চলেছে। অলোক বিমুগ্ধ-

নেত্রে চেয়ে থাকে, এমন হাসি অশ্রু মাখানো ছবি কতকাল কতযুগ পরে সে দেখলো। সেই শেষবার তাদের সংসার ভেঙ্গে যাবার পূর্ব্বে দিদিকে সে ষ্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিল।

যোগবাণী প্যাসেঞ্জারের তখনও অনেক দেরী দেখে অলোক বেরিয়ে পড়লো, তার মনের মধ্যে তখন উঁকি দিচ্ছে অনেক গুলি মুখ, দিদি স্বরুচি দেবী অলোকা আর সীতা। চার বৎসর পূর্ব্বে এই পথটা ছিল তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেই সকাল বেলায় ঐ দোকানেই তো সে প্রথম খেয়েছিল পূর্ণিয়ায় এসে। তখন সে এখানকার কিছুই চিনতোনা সম্পূর্ণ নূতন ছিল সব। আজ চার বৎসর পরে এখানকার কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ, পরিচয়, বন্ধুত্ব। আজ আবার সে চলে যাচ্ছে – আসা আর যাওয়া ছুনিয়ার চিরন্তন ধারা। অলোক এগিয়ে যায়, হঠাৎ বিশাল আমলকী গাছটায় তার চোখ পড়লো। রাজগীর যাবার দিন এখানে তারা অনেকক্ষন অপেক্ষা করেছিল, গাছটার ছায়ায় ঠিক ঐখানে অলোকা বসেছিল।

'বাবুজি, বাবুজি'—অলোক ফিরে চাইলো দোকানটারদিকে। 'রাম রাম বাবুজি।' পুনিয়া বলে অনেক কথা— বাপের কাছ থেকে সে সরে এসেছে দোসরা সাদীও করেছে। অলোক দেখে পুনিয়ার স্বাস্থ্য অনেক খানি উন্নত হয়েছে। পুনিয়ার অনুরোধে অলোককে বসতে হোল কিছুক্ষণ তার দোকানে। বাঃ বেশ দোকান ফেঁদেছেতো পুনিয়া, এক সঙ্গে মনিহারী মুদিখানা পুরী মেঠাই চা পান সিগারেট সব কিছু। অলোক মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করে, পুনিয়া বেশ আছে, বাপের কাছ থেকে পৃথক হয়ে একরকম ভালই করেছে.নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে

ঝন ঝনাৎ ঝন ঝনাৎ শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, ট্রেনের সময় হয়ে

এসেছে। পুনিয়ার দোকান থেকে অলোক উঠে পড়লো। প্ল্যাটফর্মে এসে অলোক অবাক হয়ে যায়, 'লাইট পোষ্টে'র নিচে সীতা আর পণ্ডিত-মশাই না। সীতা সহজ স্বরে হাসি মুখে বলে 'সত্যি খুব ভয় হয়েছিল দাদা, ভাবলাম আগের গাড়ীতেই তুমি চলে গেছ, নাও এটা'। অলোক ক্ষুদ্র মোড়কটি গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করে 'কি আছে এতে'! 'খানকয়েক রুটি, আলু সজনের তরকারী, সেই গাছটা যেটা বেড়ার ধারে লাগিয়েছিলে তুমি, সেটাতেই এতদিন পর হয়েছে'। অলোক খাদ্যবস্তু গ্রহণ করলো। আজ একাদশী একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গলায় দেবার উপায় নেই, অথচ সীতা তার জন্যে এটা তৈরী করে নিয়ে এসেছে। মনে পরে অনেক দিন আগে একদিন এই তরকারীর কথা সে বলেছিল সীতাকে, অলোকের মন কেমন ধারা হয়ে ওঠে। 'ফেলে দেবেনাতো দাদা?' সীতার মুখের পানে চেয়ে চুপ করে থাকে অলোক সীতাও আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। মনের গভীরতার মাঝে ভাষা মূক হয়ে যায়।

উঁচু পোষ্টের উপর হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। পুর্ণিয়া ষ্টেশন, জংশনের মর্য্যাদা পেয়েছে কেরোসিনের টিমটিমে আলোর সেখানে আর স্থান নাই। কাঠিহারগামী ট্রেনখানা সশব্দে এসে দাঁড়ালো। পণ্ডিত মশাইকে প্রনাম করে উঠতেই সীতা প্রনতি জানালো অলোককে। সীতা বলে 'যদি কখনও কোনদিন আসতে হয় দেখা করবে তো দাদা?' অলোক জবাব দিল 'আচ্ছা।'

সীতা জানে অলোক আর আসবে না পুর্ণিয়ায়, অলোকও জানে এই তাদের শেষ সাক্ষাৎ তবুও স্বীকার করতে হয়। চলন্ত ট্রেনে অলোক উঠে পড়লো। লৌহ শকটের গতি ক্রমেক্রমে বেড়ে উঠলো ক্ষীন হতে ক্ষীনতর হয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল পুর্ণিয়ার আলো দূরে - দূরান্তরে।